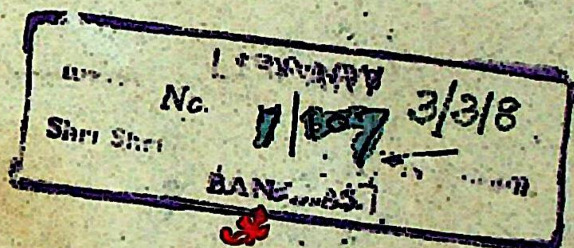
স্বামী অভেদানন্দ

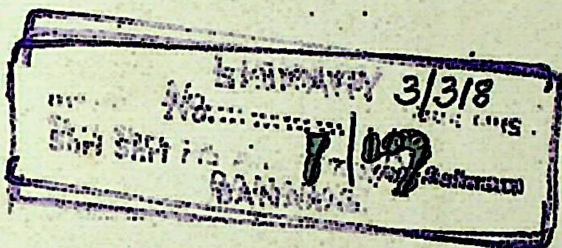
প্রথম খণ্ড



রামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রম

দার্জিলিং

শ্রীঅশোকের সরকার

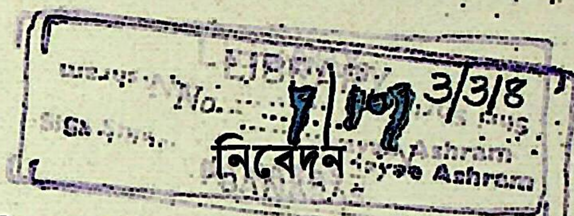


স্বামী অভেদানন্দ

প্রথম খণ্ড

বাঙ্গালার ধর্ম্মগুরু, বাঙ্গালীর বল প্রভৃতি বহু গ্রন্থ প্রণেতা
শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য প্রণীত

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রম
দার্জিলিঙ্



নিবেদন

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ ছিলেন একজন পরম সন্ন্যাসীর বরপুত্র—আজন্ম সন্ন্যাসী। ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা ইহাই ছিল তাঁহার ধ্যান জ্ঞান সাধনা। তাঁহার মধুর কণ্ঠ স্তব্ধ হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত—তাঁহার সবল কর লেখনী ধারণে অশক্ত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আলোকধারার সুমনোহর বর্ণবৈচিত্র্যের মত সুন্দর ও মনোহর করিয়া কবির বিচিত্র ভাবে ও ভাষায় কি স্বদেশে, কি বিদেশে তিনি এই কথাই প্রচার করিয়া গিয়াছেন—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। তাই যখনই তাঁহার জীবনকাহিনী রচনা করিবার অনুমতি প্রার্থনা করা হইয়াছে তখনই তিনি বলিয়াছেন—সন্ন্যাসীর জীবনও নাই, মৃত্যুও নাই ; দেশ, কাল ও নিমিত্তের পরপারে তাঁহার বাস। তাঁহার আবার জীবনবৃত্ত কি ? বেশী পীড়াপীড়ি করিলে বলিতেন—'তোমরা ঠাকুরের কথা লেখো, সেই কথার মধ্যেই আমরা বাঁচিয়া থাকিব।' যাহা হউক, এই ভাবে দীর্ঘ দিন চলিয়া গেল, মহারাজের জীবন বৃত্তান্ত রচনা করিবার কোনও সুযোগ ঘটিল না।

১৩৪৬ বঙ্গাব্দের সম্ভবতঃ জ্যৈষ্ঠ মাসে কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের কয়েকজন গুরুভ্রাতার সহিত একদিন আমি মহারাজের কক্ষে বসিয়া তাঁহার পীড়া ও চিকিৎসাদি সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলাম। সেই সময়ে নানা কথার প্রসঙ্গে তাঁহার জীবনী রচনার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধেও আলোচনা হইতে লাগিল কিন্তু মহারাজ বলিতে লাগিলেন যে, তাঁহার জীবনী রচনার কোন প্রয়োজন নাই। যখন তাঁহাকে বলা হইল যে, তাঁহার জীবনের উপর তাঁহার নিজের যদি বা কোনও দাবী না-ই থাকে, কিন্তু তাঁহার দুর্দ্দশাগ্রস্থ জাতির দাবী অসামান্য। আত্মসংস্থ হইবার জন্য জাতি একদিন তাঁহার জীবনবৃত্তান্তের সন্ধান করিবেই

করিবে। মহারাজ তখন রোগশয্যা ত্যাগ করিয়া স্বহস্তে আলমারি হইতে তাঁহার কয়েকখানি 'ডায়েরি' লইয়া আমার হাতে দিয়া বলিলেন— 'এতেই ত সব লেখা আছে।' আমি সেই স্থানে বসিয়া ডায়েরিগুলি পাঠ করিয়া যখন নিবেদন করিলাম যে তাঁহার নিকট হইতে মৌখিক বিবৃতি না পাইলে শুধু ডায়েরি হইতে কেহ তাঁহার জীবনকাহিনী সঙ্কলন করিতে পারিবে না, তখন তিনি প্রসন্নমুখে বলিলেন—'রোজ রোজ এসে আমার বিবৃতি লিখে নাও।' যাহা হউক, সেদিন এইভাবে আমার মত একজন অযোগ্য দীন সেবকের উপর মহারাজের জীবনচরিত রচনা করিবার গুরুভার একটি সুবিশাল পাষাণ স্তূপের মত আসিয়া পড়িল।

দিনের পর দিন বিবৃতি দিবার মানসিক শ্রম পাছে মহারাজের রোগবৃদ্ধির কারণ হয় এইরূপ আশঙ্কা মনে জাগিবা মাত্র তখনকার মত বিবৃতি লিখিয়া লইতে নিরস্ত হইতে হইল। মহারাজ সুস্থ হইয়া উঠিলে কর্ম্মারম্ভ করিব তখন এইরূপ সঙ্কল্প করিলাম। দুরদৃষ্টবশত সে সুযোগ আর ঘটে নাই! ১৩৪৬ বঙ্গাব্দের ২২শে ভাদ্র মহারাজ চলিয়া গেলেন। এখন মনে হয়, জীবনবৃত্ত রচনাব্যাপারে তিনি কোন অংশ লইবেন না বলিয়াই বিবৃতি লিখিয়া লইতে আমার মনে শিথিলতা আসিয়াছিল! আমি সুযোগ পাইয়াও তাহা হারাইলাম।

কিছুকাল পর আমার 'বাঙ্গালার ধর্ম্মগুরু' নামক পুস্তকে ও মঠের মুখপত্র 'বিশ্ববাণী' পত্রিকায় সেই অলৌকিক মহাপুরুষের কথা সংক্ষেপে লিখিতে গিয়া দেখিতে পাইলাম, আমার অক্ষমতা ও অজ্ঞান সুস্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। মহারাজের মৌখিক বিবৃতি সম্মুখে রাখিয়া লিখিতে পারিলে যে কত সুবিধা হইত তাহা বুঝিতে পারিয়া তখন আত্ম-শৈথিল্যের জন্য মর্ম্মে মর্ম্মে আহত হইতে লাগিলাম!

আরও কিছুদিন অতীত হইল। যদিও জানিতাম মঠের "কালী-তপস্বী" নামক ক্ষুদ্র গ্রন্থই মহারাজের জীবনকালে প্রকাশিত তাঁহার একখানি প্রাথমিক জীবনকথা। কিন্তু উহা আকারে এতই ক্ষুদ্র

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

যে সর্ব্বকালের সঙ্গী রূপে উহাকে অবলম্বন করিলেও আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি ঘটে না—এই কথাই মনে হয় যে জানিবার এবং শিখিবার অনেক কথাই বাকী রহিয়া গেল।

কিছুকাল পর দুরন্ত কার্ব্বাঙ্কল্ রোগে আক্রান্ত হইয়া আমি যখন মৃত্যুশয্যাকে আশ্রয় করিলাম, সেই সময় একদিন সোদর প্রতিম স্বামী সদ্রূপানন্দ মহারাজ যেন মহারাজের আশীর্ব্বাদ বহন করিয়া আনিয়া কহিলেন—'আপনাকে বাঁচিয়া উঠিতেই হইবে, কারণ মহারাজের জীবনকাহিনী রচনা করিবার ভার তিনি আপনার উপরই দিয়া গিয়াছেন।'

মনে বল পাইলাম; শেষে ধীরে ধীরে বাঁচিয়াও উঠিলাম। এমন সময় একদিন মহারাজের দার্জ্জিলিং মঠ হইতে আদেশ আসিল, গুরু মহারাজের জীবনকথা আমাকেই লিখিতে হইবে এবং সে কার্য্যও অবিলম্বে আরম্ভ করিতে হইবে। আদেশ-পত্রের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দার্জ্জিলিং হইতে স্বামী সত্যরূপানন্দ ও স্বামী ভবেশানন্দ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহারাজের জীবনকথা যাহাতে রচিত হয় সে বিষয়ে তাঁহাদিগের জ্বলন্ত উৎসাহ রোগখিন্ন এই বৃদ্ধকেও উদ্দীপিত করিয়া তুলিল। উপাদান সংগ্রহের আশায় কলিকাতা বেদান্ত মঠে যাইয়া নিরাশ হৃদয়ে ফিরিতে হইল। শুনিলাম নানা অনিবার্য্য কারণে মহারাজের কাগজ-পত্র, ডায়েরি প্রভৃতি সবই মঠ হইতে সরাইয়া নিরাপদ স্থানে রক্ষা করা হইয়াছে।

মহারাজ ছিলেন বিরাট, আর আমি ধূলিকণার ন্যায় ক্ষুদ্র। মহারাজ ছিলেন সর্ব্ব বিষয়ে অসাধারণ, আর আমি সর্ব্ব বিষয়ে সাধারণ অপেক্ষাও নিম্ন স্তরে। ধর্ম্মজীবনে, কর্ম্মজীবনে এবং তাঁহার সমকালিক চিন্তাজগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অধিনায়করূপে তাঁহার যে চিত্র গৌরবোজ্জ্বল মহিমায় আমার অন্তরে জাগ্রত আছে, তাহার দিকে চাহিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া যাই, আমার সাধ্য কি যে তাহার প্রতিচ্ছবি অঙ্কিত করি! সে চিত্রের সামান্য একটু পরিচয় দিবারও না আছে শক্তি, না আছে

অধিকার। তাঁহার চিন্তাপ্রবাহের যে উত্তাল তরঙ্গ মানবমণ্ডলীর জীবন-নদীকে নিত্য তরঙ্গায়িত করিয়া তুলিতেছে এবং যুগ যুগ ধরিয়াই তুলিবে, সেই তরঙ্গমালার সম্মুখে নিজেকে একান্তেই হারাইয়া ফেলিতে হয়—কেমন করিয়া আমি তাহার সুবিশাল গাম্ভীর্য্য ও সুমনোহর লীলা-বিভব প্রকাশ করিয়া বলিব! এই সকল মহাপুরুষের কাহিনী, সেই আলোকধারারই কাহিনী—তাহার প্রসার, তাহার দীপ্তি—তাহার মাধুর্য্য, তাহার পথনির্দ্দেশক ইঙ্গিত প্রভৃতিরই কাহিনী। আমি লিখিতে আরম্ভ করিয়া লেখনী ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলাম। কিন্তু বুঝিতে পারিলাম যে মধ্যে মধ্যেই একটি তীব্র অনুযোগ মনকে আঘাত করিতেছে। কাল বিলম্ব না করিয়া একদিন গঙ্গাজলে গঙ্গা পূজা করিতে লাগিয়া গেলাম। দার্জ্জিলিং আশ্রম এবং কলিকাতার মঠের গুরুভ্রাতাদিগের শুভেচ্ছা সেই পূজায় সহায় হইল। শেষে দেখিলাম আশাতীত অল্প দিনের মধ্যেই একখানি বৃহৎ কলেবর জীবনকথা রচিত হইয়াছে। সেই বৃহৎ গ্রন্থের কিয়দংশ মাত্রই এখন "প্রথম খণ্ড" রূপে প্রকাশিত হইল। মহারাজের দয়া হইলে সুযোগ পাইবামাত্রই অবশিষ্টাংশ মুদ্রিত হইবে।

নানা সময়ে মহারাজের নিজ মুখে যাহা শুনিয়াছি, তাঁহার প্রকাশিত রচনাবলী ও ভাষণাদি, তাঁহার প্রথম জীবনচরিত "কালীতপস্বী", রামকৃষ্ণসাহিত্যজগতে প্রচারিত নানা পুস্তক ও প্রবন্ধাবলী এবং অন্যান্য গ্রন্থাদি ও পুরাতন পত্র-পত্রিকা, এই সমস্ত সর্ব্বদা সম্মুখে রাখিয়া এই জীবনকাহিনী রচিত হইলেও আমার অক্ষমতার জন্য ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটিবারই সম্ভাবনা। সে সকল ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় সম্পূর্ণরূপে আমার—মঠের বা আশ্রমের বা আর কাহারও নহে। যদি কোথাও কিছু ভাল কথা থাকে, যদি কোন বিবরণ কোন পাঠককে সুনির্দ্দিষ্ট জীবন-পথ দেখাইয়া দেয় তবে সেজন্য সকল গৌরব তাঁহাদের, যাহাদের রচনাবলী ও উপদেশ সর্ব্বদা আমার সম্মুখে ছিল।

গ্রন্থখানিকে ভ্রম-প্রমাদ শূন্য দেখিবার জন্য কলিকাতার মঠ ও দার্জ্জিলিংএর আশ্রমের গুরুভ্রাতাগণ যেরূপ আগ্রহান্বিত ছিলেন, তাহা

তাঁহাদিগের স্বাভাবিক গুরুভক্তিরই নিদর্শন। তজ্জন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান, নিজেকেই নিজে ধন্যবাদ দিবার মত শুনাইবে। তবে শ্রীরামকৃষ্ণগোষ্ঠীর সহিত সম্বন্ধশূন্য হইয়াও কলিকাতা 'ষ্টুডেন্টস্ লাইব্রেরি'র ধর্ম্মপ্রাণ সত্বাধিকারী সুহৃৎ শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রমোহন দত্ত মহাশয় যে-ভাবে পুস্তকের অঙ্গসৌষ্ঠব সুসম্পন্ন করিবার জন্য চেষ্টিত হইয়াছেন, শুধু কৃতজ্ঞতা প্রকাশমাত্রই সে বিষয়ের শেষ কথা হইতে পারে না। এই প্রসঙ্গে 'ভারতী প্রিন্টিং ওয়ার্কসের' অমায়িক ও সাধুজনোচিত ব্যবহার এবং কর্ম্মতৎপরতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দেশের নবপরিস্থিতির কারণে বাধ্য হইয়াই সকলকে ত্বরান্বিত হইতে হইয়াছে বলিয়া এত চেষ্টা সত্ত্বেও পুস্তকের কোন কোন স্থানে ভ্রম-প্রমাদ লক্ষিত হইবে। ভ্রমগুলি মারাত্মক নহে বলিয়া কোন শুদ্ধি পত্র দেওয়া হইল না।

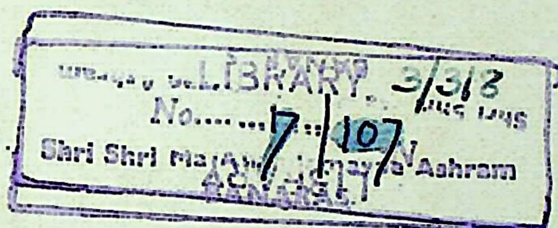
আর একটি কথা বলিবার আছে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণসাহিত্যে কোন কোন ঘটনার বিভিন্নরূপ বিবৃতি পাওয়া যায়। বর্ত্তমান গ্রন্থে সেই সকল অনৈক্যের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন বলিয়া তদ্বিষয়ে মহারাজের নিজের মন্তব্যমাত্রই অবলম্বন করা হইয়াছে।

পরিশেষে নিবেদন, মহারাজের দার্জ্জিলিংএ স্থাপিত বেদান্ত আশ্রমের অনুপ্রাণনায় ও সংগৃহীত অর্থে সেই আশ্রম হইতে তাঁহার এই জীবন-কাহিনী প্রকাশিত হইতেছে। আমি নিমিত্ত মাত্র—পূজামণ্ডপের একজন নগণ্য পূজারী। গ্রন্থের সর্ব্বস্বত্ব দার্জ্জিলিং আশ্রমে অর্ঘ্যরূপে অর্পণ করিয়া গুরুপূজা করিতে পারিলাম, সেজন্য জীবনান্ত কাল পর্য্যন্ত নিজেকে ধন্য মনে করিব। নিবেদন ইতি।

অমরকুটীর, বারাকপুর
রামকৃষ্ণ দ্বিতীয়া
ফাল্গুন, ১৩৫০

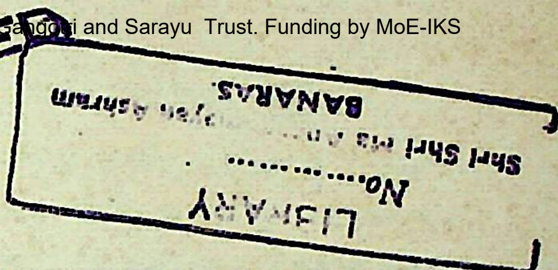
বিনীত
শ্রীরাজেন্দ্র লাল আচার্য্য

শ্রীউমাশংকর সরকার





স্বামী অভেদানন্দ



স্বামী অভেদানন্দ

প্রথম পরিচ্ছেদ

ঊনবিংশ শতক

ঊনবিংশ শতক নানা কারণে বাঙ্গালীর নবজন্ম লাভের ইতিহাসে বরণীয় এবং স্মরণীয়। উহা সম্ভোজাগ্রত তরুণ বাঙ্গালার আত্মানুসন্ধানের যুগ, বাঙ্গালীর পথ-পরিবর্ত্তনের যুগ। ধর্ম্মবীরের এবং কর্ম্মবীরের যুগ ছিল এই ঊনবিংশ শতক। ধর্ম্ম কর্ম্ম, শিক্ষা সমাজ, শিল্প সাহিত্য, গৃহের ও বাহিরের সংস্কার-প্রযত্ন এবং রাষ্ট্রচেতনা প্রভৃতি জাতীয়-জাগরণের সকল দিকেই বাঙ্গালার এই যুগ তাহার অগ্নি-মুদ্রা অঙ্কিত করিয়া বাঙ্গালীকে জয়ের পথে অগ্রসর করিয়াছিল।

এ যুগের বাঙ্গালী-ঋত্বিকগণ ঋতকে প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিয়া দেশকে ঋদ্ধির পথে অগ্রবর্ত্তী করিয়াছিলেন। এই যুগেই নটরাজের পিঙ্গল জটা হইতে হর হর হর মহানাদে বাঙ্গালায় নামিয়া আসিয়াছিল পতিতপাবনী সুরগঙ্গার অমৃত ধারা, যাহার স্পর্শে ধুইয়া গেল কুসংস্কারের কালী, ধুইয়া গেল তমোগ্রস্তের আলস্য ও জড়তার পঙ্ক, ভাসিয়া গেল

পরশ্রীকাতর কূপমণ্ডূকের নির্জীব রক্ষাকবচগুলি—যাহা পাঠান-মোগলের চরম দান-পত্রে প্রদত্ত মলিন ঐশ্বর্য্যরূপে একদিন পলাশীর আম্রকাননে পদদলিত হইয়া শেষে লাঞ্ছিত বাঙ্গালীর দীপপ্রভাহীন গৃহের অন্ধকার কোণে আশ্রয় লইয়াছিল এবং ছত্রকের মতই বিস্তার লাভ করিয়াছিল!

ঊনবিংশ শতক একদিকে যেমন রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির প্রভায় সমুজ্জ্বল—তেমনি আবার জগদীশ, প্রফুল্লচন্দ্র প্রভৃতির বিশ্ববিমোহন অবদানে সুসমৃদ্ধ; এ যুগ ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, অভেদানন্দ ও রামকৃষ্ণ সন্তানগণের অলোকসামান্য তপস্যায় পবিত্র—আবার এই যুগ রামগোপাল, কৃষ্ণদাস পাল প্রভৃতির সিংহনাদে বিকম্পিত; তেমনি, আবার উহা দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, বিজয়কৃষ্ণ প্রভৃতির কমণ্ডলুনিঃসৃত বারিস্পর্শে সঞ্জীবিত। বাঙ্গালার আকাশে তখন নানা দিকে নানা পূর্ণচন্দ্র শোভা পাইতেছেন। যে জাতির জীবনে একটি মাত্রও এমন যুগের উদয় হয়, সে জাতির আশা আছে, সে তাহার নিজের পথ করিয়াই লইবে—কারণ "অবনত অবস্থায়ও বাঙ্গালা রত্নপ্রসবিনী।"

এই কর্ম্মময় যুগের প্রাণশক্তিতে পরিপুষ্ট হইয়াছিলেন বলিয়াই যুগশেষে বিংশ-শতকের ঊষায় কলিকাতার পৌর-গৃহে (টাউন হলে) একটি বিরাট জনসভায় মার্কিণ-বিজয়ী বীর-সন্ন্যাসী অভেদানন্দকে বলিতে শুনি—

"মোক্ষ কাহাকে কহে? ইহা কি শুধুই আধ্যাত্মিক সাধনার নামান্তর মাত্র? না—তাহা নহে। আধ্যাত্মিক, নৈতিক, মানসিক, দৈহিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীক স্বাধীনতাই মোক্ষ। প্রতি কার্য্যে এই মোক্ষই হউক আপনাদের আদর্শ। ······আমরা যদি শুধু ইংরাজ বা আমেরিকান্‌দের অনুকরণই করি এবং নিজেদের আধ্যাত্মিক আদর্শগুলিকে পরিত্যাগ করিয়া ইংরাজ বা আমেরিকান্‌দেরই পদাঙ্কানুসরণ করি তাহা হইলে আমাদের মৃত্যু সুনিশ্চিত। আমাদের নেতৃবর্গ এখন (১৯০৬ খৃষ্টাব্দ) যেমন নিজেদের মধ্যে শুধু বিরোধ ও বিবাদই করিতেছেন তখনও তাহাই করিবেন।

"রাষ্ট্রীক-স্বাধীনতা লাভ করিতে হইলে আমাদের সকলের একটিমাত্রই মন থাকা চাই। যুক্তরাজ্য ৮ কোটী লোকের দেশ, কিন্তু সে দেশের একটি মন। জাপানে গেলে দেখিবেন, ৪ কোটী ৮০ লক্ষ লোকের একটি মাত্র মন। ইংলণ্ডেও ঠিক তাহাই। কিন্তু ভারতে আমরা এ কি দেখিতেছি? যখনই আমি মানস-নয়নে প্রত্যক্ষ করি এখানে ত্রিশ কোটী মন, তখনই আমি হতাশ হইয়া পড়ি। এই ত্রিশ কোটী মনের নিকট তেমন-কিছু পাইবার আশা দুরাশা বলিয়াই মনে হয়।

"কি সমাজে, কি রাষ্ট্র-জগতে, কি ধর্ম্মে—আমাদের নেতৃবর্গ এক মতাবলম্বী নহেন। কিন্তু বন্ধুগণ, যদি বেদান্ত

অধ্যয়ন করেন, দেখিবেন একের পাদপীঠ প্রতিষ্ঠিত আছে বহুর মধ্যে। এক হইতেই সকলের আরম্ভ এবং সেই একে পরিসমাপ্তিই সকলের চরম লক্ষ্য। প্রথমে এই কথাটাই অনুভূতি দ্বারা গ্রহণ করুন যে, যদিও দুই খানি মুখ এক রূপ নহে, দুইটি মনও একধর্ম্মী নহে—কিন্তু আত্মাকে অবলম্বন করিয়া সকলেই এক—এক ভিন্ন দুই নহে। এই তত্ত্বটিকেই আমাদের ধর্ম্মের প্রথম সোপান বলিয়া গ্রহণ করুন—সিদ্ধান্ত করুন, উহাই আমাদের জীবনাদর্শ, উহাই আমাদের চরম লক্ষ্য।

"শুধু মুখের কথাতেই আমরা বলি—মানব-প্রীতি, নিখিল ভ্রাতৃভাব। আমরা সকলে যে ভাই-ভাই, শুধু মুখের কথায় ত প্রাণে তাহার সাড়া পাওয়া যাইবে না! কথা আমরা এ পর্য্যন্ত অনেক বলিয়াছি এবং গত দুই শতাব্দী ধরিয়া অনবরত বকিয়াই যাইতেছি! আসুন, এখন কাজ করিতে আরম্ভ করি। মুখ বন্ধ করুন—কাজ করিতে থাকুন। অনর্থক উচ্চ চীৎকার করিয়া লাভ কি? ......যদি রাষ্ট্র বা শিল্প-জগতে কৃতকার্য্য হইতে চান্ তবে আধ্যাত্মিকতার পথে অগ্রসর হইয়া চেষ্টা করুন—কারণ ঐ আধ্যাত্মিকতাতেই আছে আমাদের জীবন, ঐখানেই আছে আমাদের প্রাণশক্তি, ঐখানেই আছে আমাদের ধর্ম্ম। যে ভাবে আমরা চলিয়াছি যদি সেই ভাবেই চলিতে থাকি, বর্ত্তমান অপেক্ষা আমরা আরও বেশী পদদলিত

হইব !” (১) বাঙ্গালার যুবকদিগকে সম্বোধন করিয়া তিনি অগ্নিলিপ্ত ভাষায় বলিয়াছিলেন—এখানে আমরা ৮ কোটী লোক। সকলে যদি একই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া কাজ করি—কাহার সাধ্য আছে যে, আমাদিগকে বাধা দেয় !

ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ সর্ব্বজ্ঞ হন। ব্রহ্মবিৎ স্বামী অভেদানন্দ ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে দেশের যে মূর্ত্তি দেখিয়া নিদারুণ মর্ম্মবেদনায় ঐ বাণী দিয়াছিলেন, আজ ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দেও দেখিতে পাই, দেশের সেই শতধাভিন্ন নগ্নমূর্ত্তিই প্রকট হইয়া আছে এবং মহারাজের বাণী এতটুকুও পুরাতন হয় নাই ! এইরূপ দূরদৃষ্টি-সম্পন্ন পরম স্বদেশবৎসল ছিলেন সন্ন্যাসী অভেদানন্দ—পাশ্চাত্ত্যে অন্যতম ভারত-প্রতিষ্ঠাতা; একাধারে যোগী, ত্যাগী, ভক্ত ও কর্ম্মী—একাধারে সংগঠন-কৌশলী এবং অপূর্ব্ব বাগ্মী—ক্ষুরধারবুদ্ধি দার্শনিক ও শক্তিশালী সাহিত্যিক—একাধারে যেমন ভাব-গম্ভীর তেমনি আবার সরল, যেন শিশু—যেমন স্নেহশীল, তেমনি বজ্রাদপি কঠোর—আবার ক্ষমায় পূর্ণ, করুণার প্রস্রবণ—সর্ব্বাবস্থায় অচঞ্চল, সর্ব্ববিষয়ে অভিঃ—আবার জ্ঞানে বৈদান্তিক, প্রাণে প্রেমিক—এই ছিলেন স্বামী অভেদানন্দ। (২)

---

(১) Swami Abhedanandas' Lectures and Addresses (1929)—pages 277-278.

(২) পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য

উনবিংশ শতকের শেষভাগে, ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর (বঙ্গাব্দ ১২৭৩, ১৭ই আশ্বিন, মঙ্গলবার, কৃষ্ণা-নবমী তিথি) কলিকাতার আহেরিটোলায় ২১নং নীমু গোস্বামীর লেনে তাঁহার ক্ষুদ্র পিতৃগৃহে স্বামী অভেদানন্দের জন্ম হয়। তাঁহার জন্মের সমকাল যেমন নানা ঘটনা-বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ, তাঁহার সমগ্র জীবনও তেমনি নানা ঘটনা-বৈচিত্র্যে সৌষ্ঠবসম্পন্ন ; কত না বাধা, কত না বিদ্রোহের ভিতর দিয়াই তাঁহাকে আপনার হাতে আপন অগ্রগতির পথ কাটিয়া প্রস্তুত করিতে হইয়াছে ! তাঁহাকে বিচলিত হইতে কেহ দেখে নাই— পশ্চাৎপদ হইতেও কেহ দেখে নাই !

ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ যাঁহাকে নিজের মনোমত করিয়া স্বহস্তে গঠন করিয়াছিলেন তাঁহারই অমোঘ শক্তিবলে বলীয়ান্ এই তেজস্বী সন্ন্যাসীর জয়রথচক্র কি স্বদেশে, কি বিদেশে সর্ব্বদা সিদ্ধির পথেই ধাবিত হইয়াছে—পরাজয় তাঁহাকে স্পর্শ করে নাই, কর্ম্মে অসিদ্ধি যে কেমন তাহা তিনি জানিতেন না। ঠাকুর তাঁহার নিকট নানা ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিলেন ; তিনিও আবার সমুদয় ভারতে ও প্রতীচীতে নানা ভাবে সেই ঠাকুরকেই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ঠাকুরের প্রকাশেই প্রকাশিত হইয়াছে প্রাচীন ভারতের যুগ-যুগ-সঞ্চিত অপূর্ব্ব সংস্কৃতি ও সভ্যতা এবং জ্ঞান ও ধর্ম্ম ; সেই সঙ্গে অভেদানন্দের লেখনীমুখে উৎসারিত হইয়াছে—সে যেন গিরি-

গর্ভের অগ্নিলিপ্ত ধাতব-স্রোত—বর্ত্তমান ভারতের চরম আত্তির বেদনাহত কাহিনী ! এইরূপ একজন বিরাট পুরুষকে জানিতে হইলে তাঁহার আবির্ভাবের কালটাকেও জানা আবশ্যক।

স্বামী অভেদানন্দের জন্মের কয়েক বৎসর পূর্ব্বেই যদিও ভারত-সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা-বাণী কোম্পানী-বাহাদুর কর্ত্তৃক অধ্যুষিত ভারতের রাজ্যাংশকে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের পদবী দান করিয়াছিল, কিন্তু উহা রক্তানুলিপ্ত সিপাহী-বিদ্রোহের স্মৃতিকে একেবারে মুছিয়া ফেলিতে পারে নাই। ইংলণ্ডের এবং এ দেশের অনেক ইংরাজ-রাজপুরুষের তখন এইরূপই ধারণা জন্মিয়াছিল যে, ভারতে ইংরাজি-শিক্ষার প্রচলন এবং মিসনরিগণ কর্ত্তৃক খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারই সিপাহীবিদ্রোহের অন্যতম প্রধান কারণ ! নানা সন্দিগ্ধ চিত্তের ছায়া তখনও ভারতের প্রগতির আকাশকে মধ্যে মধ্যে অন্ধকার করিয়া তুলিত।

পলাশীর যুদ্ধের মাত্র কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১৭৩৪ খৃষ্টাব্দে কবি দ্বিজ শৌরীন্দ্রনাথ "শিবশক্তিপঞ্চালিকা" রচনা করিয়া তাৎকালীক বঙ্গসমাজের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন, প্রায় দুই শত বৎসর পর অন্ততঃ আংশিকভাবেও সেই চিত্রকেই বর্ত্তমান বাঙ্গালার চিত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায়। (৩) কবি লিখিয়াছিলেন—

---

(৩) প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্যে লোকশিক্ষা ও সমাজ গঠন—যজ্ঞেশ্বরঞ্জন চক্রবর্ত্তী। বঙ্গশ্রী, জ্যৈষ্ঠ—১৩৪৭।

যবনের প্রভাবে ভাবিত অনুক্ষণ।
আপন স্বাতন্ত্র্য সবে করিছে বর্জ্জন॥

* * *

একতা সমষ্টিগত যথায় অভাব।
ব্যক্তিগত স্বপ্রধান যে দেশের ভাব॥

* * *

যাদের সমাজ অন্ধ ভ্রান্ত কুসংস্কারে।
অবিরত মজি রয় যত অনাচারে॥

* * *

পরপদ-সেবা শুধু ভাবিয়াছে সার।
পর-ধর্ম্ম আর পর-নীতি ব্যবহার॥
আদর্শ বলিয়া যারা ভাবে অবিরত।
সদা ভালবাসে হইতে পরপদানত॥
ঘরের রতনে যারা করি অযতন।
কুড়ায় পরের কাচ করিয়া যতন॥

* * *

সূত্রধারী আছে বহু না হেরি ব্রাহ্মণ।
ব্রাহ্মণের শক্তি লোপে লুপ্ত সব ধন॥ ইত্যাদি

বাঙ্গালার এইরূপ অবস্থা হইয়াছিল বলিয়াই পলাশীর যুদ্ধ সম্ভব হইয়াছিল! পলাশী-যুদ্ধাভিনয়ের পর পঞ্চাশ বৎসর ঠিক একইভাবে কাটিয়া গেল। মিসনরিরা আমাদের জন্য

ইংরাজি-শিক্ষার যে ব্যবস্থা করিলেন, আমরা তাহাই যে শুধু অবলম্বন করিলাম তাহা নহে, দেশের একাংশ দেশী-শিক্ষার পরিবর্ত্তে পাশ্চাত্য-শিক্ষারই বেশী আদর করিতে লাগিলেন, কারণ, সামান্য কিছু ইংরাজি জানা থাকিলেই সেকালে অর্থাগমের সুবিধা হইত—বণিক্ সাহেবদিগের অধীনে নানা রূপ কর্ম্ম মিলিত।

এদিকে আমরা তখন কালী-মন্দিরে ঘোর নিশায় গোপনে নরবলি দিয়া মাকে তুষ্ট করি! দাস-দাসীও মধ্যে মধ্যে ক্রয় করিয়া গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত করি, চড়ক পূজায় সন্ন্যাসী সাজিয়া দেহে বাণ ফুঁড়ি এবং চড়কগাছে ঘুরিতে ঘুরিতে হতচেতন হইয়া শেষে ভূমিতে পড়ি ও রক্তবমন করি! আমাদের মধ্যে যাঁহারা তখন "বাবু" হইয়াছেন, "ঘুড়ী, তুড়ী, জস্ দান—আখড়া বুল্‌বুলি মণিয়া গান এবং অষ্টাহে বন-ভোজন"—তাঁহারা তখন এই নবধা বাবু-লক্ষণে লক্ষণাক্রান্ত হইয়াছেন। তাঁহারা "বিশিষ্ট লোকের সন্তান বটেন, পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে পিতা পিতামহ পর্য্যন্ত নাম বলিতে পারেন, পরে পিতৃপক্ষ মাতৃপক্ষের বংশাবলি আর কিছুই আইসে না, তাহাতে অপ্রতিভ না হইয়া জিজ্ঞাসকের উপরই রাগাশক্ত হইয়া কহেন—আমি কি ঘটক ?"

আবার দুর্গোৎসবের জন্য তখন আমাদের প্রধান আয়োজন—সাহেবদিগের জন্য ভোজ ও নাচ! "নীকির" মত বাঈজীরা

আসিয়া দলে দলে নৃত্য করে এবং এক এক জন 'মজুরা' লয় হাজার টাকা! কোথাও বা দুর্গা-প্রতিমা গৃহে আনিয়া প্রতিমাতে স্ফুর্ত্তি হয়। "প্রত্যেক টিকেট এক টাকা করিয়া··· যাহার নামে প্রাইজ উঠে সেই ব্যক্তির নামে সঙ্কল্প হইয়া ঐ প্রতিমার পূজা হয়।" স্নানযাত্রার দিনে আমরা তখন কলিকাতা হইতে উন্মাদের মতো ছুটি মাহেশের দিকে—কেহ 'বজরায়', কেহ 'পিনিশে'—'ভাউলে', 'পান্‌সী', 'ডিঙ্গি'তে—অর্থের অভাব হইলে 'জেলে ডিঙ্গি' ভাড়া করি! সঙ্গে যায়-— "গায়ক, গুণী, বেশ্যা, ভাঁড়।" (৪) এই ভাবে তখন আমাদের ধর্ম্ম ও সমাজ টিকিয়া যাইতেছিল—কোন দিকে নিয়ম রক্ষার অভাব ছিল না! দেশে শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা তখন টোলে এবং লক্ষাধিক পাঠশালাতেই হইত।

এমন সময় খৃষ্টান্ মিসনরিদিগের চেষ্টায় কলিকাতায় এবং নিকটবর্ত্তী স্থানে ইংরাজি শিক্ষার ব্যবস্থা হইল। ভগীরথ যেমন পথের বাধা ঐরাবতকেও ভাসাইয়া দিয়া পতিতপাবনী গঙ্গাকে হিমালয় হইতে বঙ্গে আনিয়াছিলেন, মিসনরিরাও তেমনি সেকালের সনাতনী হিন্দুদিগের সুতীব্র বিরুদ্ধ-মতবাদকে উপেক্ষা করিয়া ইংরাজি শিক্ষার প্রচলন করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বাঙ্গালীকে খৃষ্টান্ করা। সে উদ্দেশ্য যে উত্তমরূপেই সফল হইতেছিল

(৪) সংবাদপত্রে সেকালের কথা—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড।

তাহা কাহারও অবিদিত নাই। অর্থাগমের সুবিধা হয় দেখিয়া কতক লোক ইংরাজি শিক্ষার পক্ষপাতী হইয়া উঠিল এবং সেই শ্রেণীর কয়েকটা ভাল স্কুলও তখন গড়িয়া উঠিল। আলেক্জাণ্ডার ডাফ্ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ফ্রি চার্চ্চ ইন্ষ্টিটিউসন্ ছিল তন্মধ্যে একটি। স্বামী অভেদানন্দের ভ্রাতা বেহারি লাল এই বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। বিদ্যালয়ে বাইবেল-গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে স্বধর্ম্ম হইতে তাঁহার মন উঠিয়া গেল। তিনি খৃষ্টান্ হইলেন। উত্তরকালে তিনি একজন সুবিখ্যাত বক্তা ও খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারকরূপে পরিচিত হইয়াছিলেন। যাহা হউক, খৃষ্টানীর এই প্রবল স্রোতকে সেকালে বাধা দিয়াছিল রামমোহন রায়ের "ব্রহ্ম সমাজ।"

পাশ্চাত্য-শিক্ষা নবপ্রতিষ্ঠিত ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের হিতের পক্ষে অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিতে পারে, অনেক রাজপুরুষের অন্তরে এ-ভাব তখন বর্ত্তমান ছিল। দেশের সনাতন পন্থাবলম্বিগণও এই শিক্ষাকে ভীতির চক্ষে দেখিতেন, কারণ ছাত্রদিগের জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক-পরিবর্ত্তন ঘটিতে লাগিল। উচ্চ বংশের ইংরাজি শিক্ষিত যুবকগণ—অনেকেই প্রকাশ্যে এবং কেহ কেহ বা গোপনে হিন্দুশাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট অনুশাসনগুলির বিরুদ্ধে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রকাশ্যে নিষিদ্ধ মাংসাদি আহার, যবনস্পৃষ্ট খাদ্যাদি ভোজন, মদ্যপান, দেবদেবীর প্রতি অপমানসূচক ব্যবহার

এই সবই তখন সভ্যতার আদর্শ হইয়া উঠিল! বাঙ্গালার শিক্ষানীতি লইয়া তখন যে বিরোধ দেখা দিল তাহার ফলে দুইটি দল দাঁড়াইল; একটির নাম 'Orientalist' বা প্রাচ্য-বিদ্যোৎসাহী এবং অপরটির নাম হইল 'Anglicists' বা পাশ্চাত্য বিদ্যোৎসাহী। সাহেব ও বাঙ্গালী এই দুই দলের মধ্যেই ছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে যে তীব্র বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল তাহা দ্বাদশবর্ষকাল বর্ত্তমান থাকিয়া কোম্পানীর কর্ত্তাদিগকে এতই উদ্বিগ্ন করিয়াছিল যে, ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সরকারী সাহায্যে পাশ্চাত্য-শিক্ষা প্রচলিত হইতে পারে নাই।

দুই দলে বিরোধ যতই প্রবল থাকুক না কেন, রাজা রামমোহন রায় এবং দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতির সাহায্যে মিসনরিগণ ও পাশ্চাত্য-বিদ্যোৎসাহীর দল প্রবল ভাবে পাশ্চাত্য-শিক্ষা বিস্তার করিতে লাগিলেন। নূতনের উন্মাদনায় যাহা কিছু ত্রুটী-বিচ্যুতি ঘটুক্ না কেন, বাঙ্গালী জাতি পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধিকারী হইয়া একদিন যে দিগ্বিজয়ে বাহির হইতে পারিবে, বহু দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজা রামমোহনের মনে সে বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ ছিল না। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে নানারূপ চাপে পড়িয়া সরকার-বাহাদুর শেষে এ দেশের পক্ষে প্রাচ্যবিদ্যা-সংরক্ষণ-নীতিই অবলম্বন করিতে যাইতেছেন। রামমোহন

সেই ব্যবস্থার নানা ত্রুটী দেখাইয়া তদানীন্তন বড়লাট লর্ড আমহার্ষ্টের নিকট একখানি প্রতিবাদ-পত্র পাঠাইলেন। উহা ছিল এতই সুস্পষ্ট ও সুতীব্র যে সরকার বাহাদুরকে তখনকার মত নিরস্ত হইতে হইল। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁহার "রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছিলেন যে, রামমোহনের এই প্রতিবাদ-পত্রকেই "এই নবযুগের প্রথম সামরিক শঙ্খধ্বনি মনে করা যাইতে পারে। তিনি যেন স্বদেশবাসীদিগের মুখ পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমদিকে ফিরাইয়া দিলেন।"

রামমোহনের শঙ্খ-নিনাদ শুনিয়াও সরকার-বাহাদুর শিক্ষা-নীতি নির্দ্ধারণ করিতে পারিলেন না। কয়েক বৎসর পর লর্ড মেকলে এই বিষয়ে গোপনে বড়লাটের নিকট যে মিনিট্ প্রেরণ করিয়াছিলেন (১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে) তাহাকে রামমোহনের পূর্ব্বোল্লিখিত প্রতিবাদ-পত্রের প্রবলীকৃত প্রতিধ্বনিরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। যাহা হউক, শেষে পাশ্চাত্য-শিক্ষা-নীতিই অবলম্বিত হইল এবং পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারা পূর্ব্বাপেক্ষা প্রবল ভাবে আসিয়া ভারতবর্ষকে ক্রমে ক্রমে প্লাবিত করিতে লাগিল।

এই প্রসঙ্গে বলিতে হইতেছে যে, ১৮৩৫ সালেই লর্ড মেকলে তাঁহার মিনিটে লিখিয়াছিলেন—'যথা-প্রযত্নে চেষ্টা করিয়া আমাদের এখন উচিত সেইরূপ এক শ্রেণীর লোক

সৃষ্টি করা, শোণিতের ও বর্ণের সম্বন্ধে যাহারা থাকিবে ভারত-বাসী—কিন্তু তাহাদের রুচি হইবে ইংরাজের, মতবাদ হইবে ইংরাজের এবং তাহাদের নীতি ও বুদ্ধিও হইবে ইংরাজের।” (৫) কদাচিৎ এই ভবিষ্যৎবাণীর ব্যতিক্রম দেখা গেলেও ইহা বলিতেই হইবে যে; মেকলে-কথিত এই সাংস্কৃতিক-বিজয় বা Cultural conquest ভারতবর্ষে সুসম্পন্নই হইয়াছে! ভূমি জয় সত্যকার বিজয় নহে—মন জয়ই জয়। বিজেতা তখন স্বেচ্ছায় দেশত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেও, বিজিত সেই বিজেতাকেই চাহে! ব্যক্তিগতভাবে এই মনের জয়কে যাঁহারা ভারতে হটাইয়া দিয়াছেন তাঁহা-দিগের সকলের নামোল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। বাঙ্গালায় যাঁহারা এই মহৎ ব্যাপার সুসম্পন্ন করিয়াছেন—তাঁহারা প্রধানতঃ ঈশ্বরচন্দ্র, রামমোহন, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, আশুতোষ প্রভৃতি মনীষিগণ—তাঁহারা বাঙ্গালার শ্রীরামকৃষ্ণ, ব্রহ্মানন্দ, বিবেকানন্দ, অভেদানন্দ, বিজয়কৃষ্ণ প্রভৃতি তপস্বীবৃন্দ—বঙ্গ-গগনের সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ ও নক্ষত্রমণ্ডলী।

---

(৫) We must at present do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern—a class of persons—Indian in blood and colour, but English in tastes, in opinions, in morals and intellect.

—*Minute by the Hon'ble T. B. Macaulay, Dated the 2nd February, 1835.*

অন্যের মত অভেদানন্দের শঙ্খও এই নিনাদই করিয়াছে—বেশভূষায়, কর্ম্মে চিন্তায়, আচারে ব্যবহারে বাঙ্গালী হও। বজ্রনাদে তিনি বলিয়া গিয়াছেন—"জাতীয় ধর্ম্ম ও দেশীয় জিনিষের উপর যতদিন আমাদের শ্রদ্ধা ও প্রীতি ফিরিয়া না আসিবে ততদিন আমাদের দেশ স্বাধীন হইতে পারিবে না।" মহাপুরুষের এই বাণীকে ধ্যান কর—উহা বিশ্বাস কর—বিশ্বাস করিয়া পালন করিতে কৃতসঙ্কল্প হও।

পাশ্চাত্য-শিক্ষার বন্যা বাঙ্গালা দেশকে উদ্দাম গতিতে ভাসাইয়া লইয়া চলিল। যে খাল-পথে উহা প্রথমে প্রবেশ করিয়াছিল তাহা কাটিয়াছিলেন খৃষ্টান্ মিসনরিরা; কিন্তু অল্প কাল পরেই সেই স্বল্প পরিসর খালটিকে কাটিয়া কাটিয়া বৃহৎ নদীর আকার দিল বাঙ্গালীরা। সেই নদীর স্রোতের টানে ভাসিয়া আসিল শস্যের প্রাণ-শক্তি পলিমাটী এবং বহু আবর্জ্জনা ও কচুরি-পানা! ইহা স্বভাবের নিয়ম। যাহারা পরের বস্তুটি গ্রহণ করিতে জানে, তাহারা শুধু ভালটুকুই লয় এবং নিজেকে আত্মবশই রাখে, পরবশ করে না, যেমন এসিয়ায় জাপান বা আধুনিক তুর্কী; আর যাহারা আমাদের মতোই গ্রহণ করে, তাহারা ভালর কিছু লয় বটে, কিন্তু পরের পঙ্কহ্রদে নিজেকে ডুবাইয়া দেয়! বঙ্কিমচন্দ্র তাই বলিয়াছেন যে, নকল-সাহেব অপেক্ষা খাঁটি বাঙ্গালী ভাল। স্বামী অভেদানন্দও নানাভাবে এই কথাই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন;

বলিয়াছেন—"আমরা যদি শুধু ইংরাজ বা আমেরিকান্‌দের নকলই করি এবং আমাদের আধ্যাত্মিক আদর্শগুলিকে পরিত্যাগ করিয়া ইংরাজ বা আমেরিকান্‌দিগেরই পদাঙ্কানুসরণ করি তাহা হইলে আমাদের মৃত্যু সুনিশ্চিত।"

১৮২৫ হইতে ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দ তরুণ বাঙ্গালার জন্ম-ব্যথার কাল। উহা প্রাচীন ও নবীনের মধ্যে শিক্ষা, সমাজ, সংস্কার প্রভৃতি লইয়া ঘোরতর সংঘর্ষের কাল। নূতনের মোহ চিরদিনই তীব্র। নূতনের নেশা পথ অপথ মানে না। সেই নেশায় মুগ্ধ হইয়া বাঙ্গালার তরুণের দল, বা শ্রীশ্রীঠাকুর যাহাদিগকে বলিতেন 'ইয়ং বেঙ্গল'—তাহারা ক্রমে ক্রমে নকল-সাহেব হইতে লাগিল। নকল-সাহেব, কারণ পরানুকরণ করিয়া কেহ কোন দিন আসলের মত হইতে পারে নাই। ক্রমে গীতা, গুরু, গায়ত্রী মর্য্যাদা হারাইলেন—নকল-সাহেবগণ হিন্দু সমাজের প্রাচীন আচার-নিয়ম-সংস্কারগুলির উপর খড়্গ-হস্ত হইয়া সংস্কারের নামে সেগুলিকে সংহার করিতে লাগিলেন! যুগের এই প্রভাবের ঊর্দ্ধে যাঁহাদিগের গর্ব্বিত শির উন্নত হইয়াছিল, স্বামী অভেদানন্দ ছিলেন তাঁহাদিগের মধ্যে প্রধান একজন। এই যুগের পতাকাবাহী ছিলেন যাঁহারা, তাঁহারাও উত্তরকালে নানাভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা যে ভাঙ্গন ধরাইয়াছিলেন তাহার ফলে, আত্মরক্ষার জন্যই হউক বা যে-কারণেই

হউক অচলায়তন সমাজদেহে একটা প্রচণ্ড গতি-বেগ দেখা দিয়াছিল।

সুদীর্ঘ ২৫ বৎসর মার্কিনে ও ইউরোপের নানা স্থানে বাস করিয়া, মার্কিনিদিগের আচার নিয়ম ও সামাজিক ব্যবস্থার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত হইয়াও স্বামী অভেদানন্দ যখন ২৫ বৎসর পর পরিণত বয়সে ১৯২১ খৃষ্টাব্দে মার্কিন হইতে প্রথমে বেলুড়-মঠে ফিরিয়া আসিলেন তখন তাঁহার কথা-বার্ত্তা, আচার-ব্যবহার, ভাব-ভঙ্গী ও পোষাক-পরিচ্ছদ দেখিয়া কেহই বুঝিতে পারে নাই যে, এই স্বামী-মহারাজই জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কালটি খৃষ্টান্ সাহেবদিগের দেশে কাটাইয়া আসিয়াছেন!

মঠে আসিয়াই প্রথমে ঠাকুর-ঘরের সন্ধান, সে ঘর তখন বন্ধ থাকায় সিঁড়িতেই ঠাকুরের উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদন, তাহার পর একটি নারিকেলের 'হুঁকা' লইয়া একখানি আরাম-কেদারায় উপবেশন এবং ঠাকুরের প্রসাদ চাহিয়া লইয়া পরম ভক্তিভরে গ্রহণ প্রভৃতি দেখিলে, কে না বলিবে যে, ইনি ছিলেন একজন সেই সঙ্কল্প-সিদ্ধ বঙ্গ-সন্তান, যিনি ইংরাজের সাংস্কৃতিক জয়-গৌরবকে অনায়াসে ব্যর্থ করিয়াছিলেন!

ইউরোপ এবং আমেরিকায় থাকা-কালে যদিও তাঁহাকে সেই দেশের বেশভূষার কিয়দংশ মাত্র গ্রহণ করিতে হইয়াছিল, কিন্তু সেখানেও তিনি নিজের জাতীয় 'বৈশিষ্ট্য' পরিত্যাগ করেন

নাই। ভারতে পদার্পণ করিয়া তিনি খদ্দরের পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতেন। খদ্দরের পাগড়ী অসুবিধাজনক বোধ হওয়ায় তাঁহার পাগড়ী ছিল রেশমের। অনেকদিন পর জামসেদপুর নগরে বক্তৃতা দিবার সময় তিনি বলিয়াছিলেন—"সুদীর্ঘ দিন আমেরিকায় থাকা সত্ত্বেও আমি যদি খদ্দরের পরিধেয় ব্যবহার করিতে পারি, তবে আপনারা এই দেশে থাকিয়া কেন তাহা পারিবেন না ?" পাশ্চাত্য শিক্ষার কেন্দ্রস্থলে জীবনের বিশিষ্ট ভাগ কাটাইয়াও স্বামী অভেদানন্দ স্বদেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে ত্যাগ করেন নাই। বরং উহার উজ্জ্বল মহিমাই প্রকাশ ও প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন সেইরূপ একজন জ্ঞানপ্রদীপ্ত মনোবলে বলীয়ান্ ভাস্করতুল্য তেজস্বী বাঙ্গালী, যিনি পরের মণি-মাণিক্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া নিজের দেশ-মাতৃকার প্রদত্ত টীকাকেই সগর্ব্বে ললাটে স্থাপনপূর্ব্বক শত সহস্র সাহেব-বিবিতে পরিপূর্ণ সভামণ্ডপে উন্নত শিরে দণ্ডায়মান হইয়া অনর্গল বেদান্তের বার্ত্তা শুনাইতেন। তাঁহার সুদীর্ঘ আলখাল্লা ও গৈরিক উষ্ণীষ তাহাদেরও প্রশংসমান্ দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। (৬) তিনি বলিতেন—"গেরুয়া পর্‌তে হবে না। এ কি ? এটাতো জ্ঞানাগ্নির প্রতীক। মনকে গেরুয়া পরাও—জ্ঞানাগ্নিময় হ'য়ে থাকো।" সেই জ্ঞানাগ্নির প্রতীকস্বরূপ দেহাচ্ছাদন গ্রহণ করিয়া তিনি যখন মার্কিনের

(৬) পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য

সভা-গৃহে বক্তৃতা দিতে উঠিতেন তখন লোকে, শিষ্টাচারে পূর্ণ সভ্য-ভব্য, অনাড়ম্বর সেই সন্ন্যাসীর সুমিষ্ট ব্যবহার দেখিয়া বিস্মিত হইয়া যাইত। মুগ্ধ-নেত্রে তাহারা দেখিত যে, বিরুদ্ধ-প্রশ্নকারীরা যতই কেন তীব্রতার সৃষ্টি না করুক, সন্ন্যাসী সর্ব্বদাই রহিতেন মিষ্টভাষী ও প্রশান্ত। মনে হইত যেন তিনি তাঁহার প্রত্যেক শিরা-উপশিরা, মনের প্রত্যেকটি ভাব এবং তাঁহার প্রত্যেকটি মনোবৃত্তিকে প্রতিক্ষণের জন্য সম্পূর্ণ-রূপে নিজের আয়ত্তাধীনে রাখিয়াছেন। কেন এইরূপ হইতে পারিয়াছিল তাহার সন্ধান করিতে হইলে দক্ষিণেশ্বরের সেই বর্ণজ্ঞানহীন যুগাচার্য্যের চরণমূলে যাইয়া উপস্থিত হইতে হয়, আর অনুসন্ধান করিতে হয় উনবিংশ শতকের সুবিস্তৃত প্রভাবের মধ্যে।

উনবিংশ শতকে যাঁহারা সমুন্নত পাশ্চাত্য-শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন তাঁহারা প্রত্যেকটি বিষয়কে দর্শন ও বিজ্ঞানের মানদণ্ডে তুলিয়া ওজন করিয়া তবে গ্রহণ করিতেন। এইরূপ বিচার-পন্থাই ছিল স্বামী অভেদানন্দেরও জীবন-বেদ। ঠাকুরের নিকট হইতে এবং যুগ-শক্তির নিকট হইতে তিনি উহা এত বেশী লাভ করিয়াছিলেন যে, তাহার পরিচয় পাইয়া মার্কিনিরা সসম্ভ্রমে তাঁহার চরণে শির লুণ্ঠন করিয়াছিল। তাহারা মুগ্ধ হইয়া দিনের পর দিন স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের মুখে শুনিত—"It (Religion of Vedanta)

is not confined to any book. It includes all scriptures and all the teachings of all great prophets who flourished at different times in different countries. It is based on Science, Philosophy and Logic. It harmonises with the ultimate conclusions of modern science. As Truth is the goal of all science and philosophy, so the same Truth is the goal of Vedanta. Modern science has discovered nothing that opposes the conclusions of the Vedanta philosophy. The Vedanta is a philosophy and a religion at the same time. It recognises each of the different stages, such as dualistic, qualified non-dualistic and monistic. In short, it is the universal religion. It embraces Christianity and points out its fundamental basis. It recognises Jesus as the Son of God. (৭)

বেদান্ত-ধর্ম্ম কোন একটি বিশেষ ধর্ম্মগ্রন্থনির্দ্দিষ্ট মতবাদ নহে। এই বিশ্বের যেখানে যে ধর্ম্মশাস্ত্র আছে—যে কোন অবতার পুরুষ, যে কোন দেশে আবির্ভূত হইয়া যাহা-কিছু

(৭) New York Journal :—Editorial Page (May 13, 1900)—বিশ্ববাণী, ১৩৪৭, কার্ত্তিক, ৩৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

প্রচার করিয়া গিয়াছেন—বেদান্ত-ধর্ম্ম সেই সকলেরই সুসমন্বিত সমষ্টি। বিজ্ঞান, দর্শন এবং যুক্তির উপর উহার পাদপীঠ বিরচিত। বর্ত্তমান যুগের বিজ্ঞান যে-সকল সিদ্ধান্তে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, বেদান্ত তাহাদেরই শেষ মীমাংসা। যেমন সকল বিজ্ঞান ও দর্শনের মুখ্য লক্ষ্যই হইতেছে পরম সত্যের আবিষ্কার, তেমনি বেদান্তের মুখ্য উদ্দেশ্যও হইতেছে তাহাই। বেদান্ত-দর্শন যে শেষ সিদ্ধান্তে আসিয়া উপনীত হইয়াছে, এ কালের বিজ্ঞান তদপেক্ষা নূতন আর কিছু আবিষ্কার করিতে পারে নাই। দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বা অদ্বৈতবাদ—আধ্যাত্মিক প্রগতির পথে তিনটি স্তরমাত্র। বেদান্ত ইহা স্বীকার করে। সংক্ষেপে বলিলে বলিতে হয় যে, বেদান্তই নিখিল মানবের ধর্ম্ম। খৃষ্টান্-ধর্ম্মমতকেও বেদান্ত পরিহার করে নাই—গ্রহণ করিয়াছে এবং সেই ধর্ম্মের মূল তত্ত্বটা কোথায় এবং কি—বেদান্ত তাহাই প্রদর্শন করিয়াছে। ঈশা (যীশু) যে ঈশ্বরের পুত্র এ কথাও বেদান্ত কর্ত্তৃক সমর্থিত হয়।

যে দিন তিনি মার্কিনিদিগকে শুনাইলেন—তোমরা দর্শন ও বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে ধর্ম্মতত্ত্ব বিচার করিয়া ঠিক্ ঠিক্ পাইলে তবে উহা গ্রহণ করিও, নতুবা কাহারও মুখের কথা বলিয়া কোন-কিছুই মানিয়া লইও না—সে দিন তাহারা স্তম্ভিত হইয়া গেল। কোন-একটা ধর্ম্মমত গ্রহণ করিতে যে এত সূক্ষ্ম বিচারণার প্রয়োজন, ইহা তাহাদিগের সম্মুখে সেদিন

একটি নবীন পন্থার সন্ধান আনিয়া দিল। তাহারা ত এতদিন তাহাদিগের মিসনরিদের মুখে শুনিয়া আসিতেছিল—বিশ্বাস কর, বিশ্বাস কর, শুধু বিশ্বাস করিয়াই মানিয়া লও—তর্ক তুলিও না, দ্বিধা করিও না! ভারতের এই ঋষির মুখে আজ তাহারা এ কোন্ বার্ত্তা শুনিল? বিচার কর—বিচার কর—বিনা বিচারে বিশ্বাস করিও না! বিজ্ঞান, দর্শন ও যুক্তিই ধর্ম্মকে স্থাপিত করে, ধর্ম্মমতকে গ্রহণযোগ্য করে। যদি তাহা না পারে, তবে সে ধর্ম্মতত্ত্ব অবিশ্বাস্য, উহা পরিত্যজ্য—উহা হইতে দূরেই থাকিতে হয়! অনেকে সেদিন তাহাদিগের প্রাণ-মন ভারতের এই সন্ন্যাসীর করে তুলিয়া দিয়া প্রচারকের শাসন-শৃঙ্খল হইতে নিজেদের মুক্ত করিয়াছিল।

বিচারের যুগে অন্ধ-বিশ্বাসের কোনই মর্য্যাদা নাই, কারণ অন্ধ-বিশ্বাসের সমাধির উপরই বিচারের প্রাসাদ নির্ম্মিত। স্বামী অভেদানন্দ—যৌবনের সেই ভক্ত কালীপ্রসাদ তাই একদিন একান্ত নির্ভয়ে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণকেও বলিতে পারিয়াছিলেন—"আমি অন্ধ-বিশ্বাস চাহি না। ঈশ্বর কি, যত দিন না তাহা বুঝিতে পারিতেছি, তত দিন কেমন করিয়া মানিব? আমাকে জানাইয়া দিন, তবে মানিব।"

এইরূপ তীব্র সত্যানুরাগ দেখিয়া পরমহংস দেব প্রসন্ন-মুখে বলিয়াছিলেন—"তুই সব জান্‌বি। তুই একঘেয়ে হোস্ নি। আমি একঘেয়ে ভালবাসি না।"

আমায় দে মা পাগল ক'রে
কাজ নাই আর জ্ঞান বিচারে—

কালীপ্রসাদ সে ধাতুতে গঠিত ছিলেন না। ঊনবিংশ শতকের প্রভাব তাঁহাকে একান্ত বিচারশীল করিয়াছিল—উচ্ছৃঙ্খল করে নাই। বিচারের পথ, জ্ঞানের পথ—উচ্ছৃঙ্খলতা দম্ভপূর্ণ অজ্ঞানতা মাত্র। যে যুগের জলে-বাতাসে কালীপ্রসাদ পরিপুষ্ট হইয়াছিলেন, সে যুগের মন্দ ফল ছিল উচ্ছৃঙ্খলতা কিন্তু তাহার শুভ ফল ছিল বিচারনিষ্ঠা। কালীপ্রসাদ অশুভকে পরিত্যাগ করিয়া শুভকেই জীবনাদর্শ-রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সমস্ত জীবন ধরিয়া প্রতিকার্য্যে তাহারই অনুশীলন করিয়াছিলেন। জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম তিনে এক—একে তিন। কালীপ্রসাদের জীবন ইহারই অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন হইতে পারিয়াছিল, কারণ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ সে জীবনকে নিজের মনোমত করিয়া নিজেই গঠন করিয়াছিলেন এবং গতানুগতিকতার গণ্ডীবদ্ধ পন্থায় অগ্রসর হইতে দেন নাই। সে জীবন এই কারণেই "একঘেয়ে" হয় নাই। সে জীবন-কথা, তীর্থযাত্রার কাহিনী। জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের সমুচ্চয়ে সে তীর্থ চিরদিনই সুমনোহর।

রাজা রামমোহন রায়ের ১৮২৩ খৃষ্টাব্দের শিক্ষা-সংক্রান্ত প্রতিবাদ-পত্র এবং তাহার প্রায় দ্বাদশ বর্ষ পর লিখিত লর্ড মেকলের ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের 'মিনিট্' ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে এক

নবযুগ আনয়ন করিয়াছিল বটে, কিন্তু মেকলের মিনিটেরও প্রায় ১৯ বৎসর পর, ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে কোম্পানী-বাহাদুর বিলাত হইতে শিক্ষানীতি সম্বন্ধে যে 'ডেস্‌প্যাচ্' এ-দেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন, ভারতের শিক্ষা-বিষয়ক ইতিহাস তাহাকেই "The Magna Charta of English Education in India" অর্থাৎ, ভারতের শিক্ষানীতি সম্বন্ধে চরম সনন্দরূপে পরিচিত করিয়াছে। এই আদেশের ফলে উপাধি-পরীক্ষা গ্রহণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা, শিক্ষা-কমিটির স্থলে সরকারি শিক্ষা-সংসদ স্থাপন, দেশের প্রচলিত বিদ্যালয়গুলিকে ক্রমে ক্রমে উচ্চ-ইংরাজি, মধ্য-ইংরাজি, মধ্য-বাঙ্গালা, পাঠশালা প্রভৃতি নানা স্তরে বিভক্ত করণ, স্ত্রীশিক্ষার সুব্যবস্থা প্রভৃতি নানারূপ সংস্কার সাধিত হইয়াছিল। যে সকল বিদ্যালয়ে সাহিত্য ও বিজ্ঞানাদি পাশ্চাত্য জ্ঞানের ভাণ্ডার ছাত্রদিগের জন্য উন্মুক্ত হইয়াছিল, কেবল সেই সকল বিদ্যালয়ের ছাত্রগণই উপাধি-পরীক্ষায় উপস্থিত হইতে পারিত। স্বনামধন্য গৌরমোহন আঢ্য কর্ত্তৃক অপার চিৎপুর রোডে স্থাপিত ওরিএণ্টাল্ সেমিনরি ছিল সেইরূপ একটি সুবিখ্যাত বিদ্যালয়। কালীপ্রসাদ ছিলেন এই বিদ্যালয়ের অতীব প্রতিভাশালী ছাত্র এবং তাঁহার পিতা রসিকলাল চন্দ্র মহাশয় ছিলেন সেই বিদ্যালয়ের একজন কুশলী অধ্যাপক। তিনি ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপনা করিতেন।

প্রত্যেক ক্রিয়ারই প্রতিক্রিয়া আছে এবং তাহা ক্রিয়ার মতই প্রবল ও বেগবান্। প্রবলভাবে পাশ্চাত্যশিক্ষা প্রবর্ত্তনের ফলে ঊনবিংশ শতকে আমাদের দেশে যে পরিবর্ত্তন ঘটিতে লাগিল তাহার প্রতিক্রিয়া তদ্রূপ বেগের সহিতই আসিয়া দেখা দিল প্রধানতঃ সাহিত্য-সেবা ও ধর্ম্মান্দোলনের পথে। সেই প্রতিক্রিয়ার বিস্তৃত আলোচনার স্থান এই গ্রন্থ নহে।

স্কুলপাঠ্য গ্রন্থাবলী রচনার প্রয়োজনে বঙ্গ-সাহিত্যের বিকাশের প্রথম পরিচয় ফুটিয়া উঠে। যতই দিন যাইতে লাগিল ততই সেই সাহিত্যের রূপের ও রসের পরিবর্ত্তন ঘটিতে লাগিল। যাহা ছিল সাধারণের কথ্যভাষা, তাহা হইতে লাগিল লেখ্যভাষা—যাহা ছিল শুধু যুক্তির ভাষা—বিবৃতির ভাষা, তাহা হইতে লাগিল রূপ-রসের ভাষা—সুন্দরের পূজার ভাষা। সাধারণ কাহিনী বা প্রচলিত নীতিকথা মাত্রই ছিল যাহার প্রাণবস্তু তাহার সহিত ক্রমে ক্রমে আসিয়া যুক্ত হইল রাষ্ট্র-চেতনার উদ্বেল তরঙ্গ, ধর্ম্মালোচনার মত্ততা, সমাজ-সংস্কারের সাফল্যপূর্ণ উদ্বেগ। রামমোহন হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত একটা বিরাট যুগ সেই সাহিত্যবিকাশের ধারাটিকে ধরিয়া রাখিয়াছে।

ইংরাজ-শাসনের প্রাক্কালে বঙ্গভাষা ছিল তাহার সূতিকাগারে। রামমোহন শিশুটিকে বাল্যের সীমা অতিক্রম করাইলেন। বিদ্যাসাগর সেই বালিকাকে করিলেন হৃষ্ট,

পুষ্ট, বলিষ্ঠ ও সুন্দরী। নিরাভরণা ছিল যে, সে এখন পরিল সংস্কৃত-লক্ষ্মীর অক্ষয় ভাণ্ডার হইতে নির্ব্বাচিত হার-বলয়-কঙ্কণ। কিন্তু তখনও সে সসঙ্কোচে পদক্ষেপ করিত—তাহার গতি সাবলীল হয়নি তখনও—সে তাহার মাতৃঅঞ্চল পরিত্যাগ করিতে পারে নাই! টেকচাঁদ বালিকাকে লীলাচঞ্চল সহজ গতি দিবার জন্য যে চেষ্টা করিলেন তাহা সার্থক হইল না। তাহার পর আসিলেন বঙ্কিম।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে কালীপ্রসাদের জন্মের মাত্র দুই বৎসর পূর্ব্বে গড়মন্দারণের চূড়ায় বঙ্কিমের দুর্গেশনন্দিনীর জয়পতাকা উড্ডীন হইল। বঙ্কিম ছিলেন বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সৃষ্টিকর্ত্তা। "শবদাহ মড়িপোড়া" প্রভৃতি ব্যঙ্গোক্তি তাঁহার চরণের অনেক নিম্নে পড়িয়া রহিল। তখন দেখা দিল 'কপাল-কুণ্ডলা' প্রভৃতি অপূর্ব্ব সাহিত্য-সম্পদ্। যাহারা ব্যঙ্গ করিতেছিল, তাহারা স্তাবক হইয়া উঠিল—যাহারা ধ্বংস করিতে উদ্যত-কৃপাণ হইয়াছিল, তাহারাই শেষে ধ্বস্ত-বিধ্বস্ত হইল—'ভাষা' যাহারা পড়িতেই চাহিত না, তাহারাও কেহ বা প্রকাশ্যে কেহ বা গোপনে পাঠ করিতে লাগিল 'মৃণালিনী', 'চন্দ্রশেখর', 'আনন্দমঠ', 'কমলাকান্তের দপ্তর' প্রভৃতি। কুমারী বঙ্গভাষা তখন হরিণ-শিশুর মতই নৃত্য করিতে শিখিয়াছে! অতি অল্পকালের মধ্যেই তাহার যৌবন দেখা দিল। বঙ্গনিকুঞ্জে যৌবনমদদৃপ্তার কলকণ্ঠধ্বনি যখন বাজিয়া

উঠিল, তখন দেশের লোক বিস্ময়-বিপ্লুত পরমানন্দে বলিয়া উঠিল—হায় রে, এই কি আমার মাতৃ-ভাষা! এ-ই কি আমার 'বন্দে মাতরম্!'

এতদিনও মাতৃভাষা যাহাদিগের পাণ্ডিত্যাভিমানের নিকট আপাংক্তেয়ই ছিল—যাহারা বলিত 'উহা মুদী-মালার ভাষা', ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে—কালীপ্রসাদের জন্মের ছয় বৎসরের মধ্যে—"বঙ্গদর্শন" প্রকাশিত হইতেই তাহারা বুঝিতে পারিল যে, পাণ্ডিত্যাভিমানের দিন শেষ হইয়াছে! বঙ্গ-সাহিত্য তখন বাঙ্গালী জাতির অন্তরের স্তরে স্তরে অমৃতরসধারা পরিবেষণ করিতে করিতে বলিতে লাগিল—ওরে পথ-ভোলার দল, ঘরের দিকে মুখ ফিরাও। রাজরাণীর সন্তান তোমরা, পরের দ্বারে ভিখারীর মত দাঁড়াইয়া থাকিবে কেন? এক কালে তোমরাই ছিলে দাতা। বিশ্ব অঞ্জলি পাতিয়া সে দান গ্রহণ করিত। আবার তোমরা দাতা হও—আর ভিখারী থাকিও না। চক্ষু মুদিয়া নিজের মূর্ত্তি একবার দেখ। দেখিবে, তোমরা কেশরী—শৃগাল নহ!

উনবিংশ শতকের এই যুগবার্ত্তা বহন করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী অভেদানন্দ ইউরোপে এবং মার্কিনদেশে সন্ন্যাসী-রাজপুত্রের মতই ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সে দেশের লোক বুঝিল, ভারত হৃতসর্ব্বস্ব ও পরপদদলিত হইলেও ধর্ম্মরাজ্যে রাজ-রাজেশ্বর। তাহার ধর্ম্ম মহামানবের ধর্ম্ম—

তাহার তটই মহামানবের মিলন-ভূমি। প্রাচীরবদ্ধ নহে সে ধর্ম্মের সীমা, সঙ্ঘ ও অনুষ্ঠান মাত্রই তাহার অঙ্গ নহে—বহু তাহার মর্ম্ম নহে। তাহার মর্ম্ম এক—তাহা অনাদি অবিনশ্বর, "বহুরে মিলায়ে" সেই একই শুধু জাগ্রত আছেন—যে পথে যাও সেই পথেই তাঁহাকে পাইবে—'যত মত তত পথ।' বাঙ্গালীর যে মুখ পশ্চিমের দিকে ফিরিয়াছিল তাহা আবার ধীরে ধীরে ফিরিতে লাগিল পূর্ব্বের দিকে—বাহির হইতে ঘরে, স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী অভেদানন্দ এবং পূর্ব্বগ মনীষীদিগের হুঙ্কারে।

রামমোহনের 'ব্রহ্মসভা' খৃষ্টানীর স্রোত কতকাংশে রোধ করিল বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ সার্থক হইতে পারিল না। বাঙ্গালার আধ্যাত্মিক গগনে তখন দেখা দিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—বিশ্ব-কবির পিতা; বেদ-বেদান্তের আলোচনা তখন অপেক্ষাকৃত প্রবল ভাবে আরম্ভ হইল 'তত্ত্ববোধিনী সভায়' ও 'তত্ত্ববোধিনী' পাঠশালায়। অদ্ভুত-কর্ম্মী কেশবচন্দ্র সেন আসিয়া সেই সমাজে যেদিন যোগ দিলেন, সে দিন শুধু বাঙ্গালা নয়—সমগ্র ভারতের ধর্ম্মগগন এক নবীন আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সেই আলোকের অন্তরে যে বজ্র ছিল তাহা গুরুগম্ভীরে নিনাদ করিল—'ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্'। কেশবের মর্ম্মস্পর্শী ইংরাজি বক্তৃতায় মুগ্ধ হইয়া শত শত শিক্ষিত ব্যক্তি আসিয়া ব্রাহ্ম-সমাজে যোগ দিতে

লাগিলেন। ব্যাপার দেখিয়া খৃষ্টান্ মিসনরিগণ প্রমাদ গণিলেন।

কিছুকাল পর কেশবচন্দ্রের সঙ্গে মহর্ষির মতানৈক্য ঘটায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইল। তাহার পর বিজয়কৃষ্ণের সহিত মতান্তর ঘটিলে কেশব 'নববিধান' নাম দিয়া একটি নূতন ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিলেন। তখন খৃষ্টানের গির্জ্জা ছাড়িয়া "ইয়ং বেঙ্গল" দলে দলে আসিয়া নববিধানের সমাজ-মন্দির পূর্ণ করিয়া দিল্। কেশবই ছিলেন সেকালের 'ইয়ং বেঙ্গলের' মুকুটমণি ও অবিসংবাদী নেতা। 'ইয়ং বেঙ্গলের' আশা-আকাঙ্ক্ষার তিনিই ছিলেন অনেকাংশে প্রতীক, তিনিই ছিলেন সেকালের বাঙ্গালার প্রাণ—বাগ্মীর শিরোমণি এবং ভক্তাগ্রগণ্য। এক দিন কতকগুলি ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বীকে একত্র ধ্যানপরায়ণ দেখিয়া, কেশব সেনকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন —'দেখিতেছি ইহারই শুধু ফাত্না নড়িয়াছে।' কেশব ছিলেন সেকালে নারীকল্যাণসাধনের অগ্রদূত—একেশ্বরবাদ প্রচারের পাঞ্চজন্য শঙ্খ। প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ছিলেন কেশবের দক্ষিণ হস্ত। একদিন গোস্বামীজির মুখে নামকীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে ঢাকার আশ্রমে জড় বৃক্ষের মধ্যেও চৈতন্য জাগ্রত হইয়াছিল এবং বৃক্ষের দেহ হইতে মধুক্ষরণ হইয়াছিল।

অপরদিকে দেখিতে পাই, পরিব্রাজক কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন তখন সনাতন হিন্দুধর্ম্মের মহিমা কীর্ত্তন করিতে করিতে পঞ্চ-মুখ হইয়াছেন—লোকে শুনিয়া শুনিয়া মোহিত হইয়া যাইতেছে। বাঙ্গালা ভাষায় যে আছে অত তেজ—সে ভাষাও যে আবার বক্তৃতা-সভায় কখনও অগ্নি, কখনও মধু বর্ষণ করিতে পারে, ধর্ম্মগগনে কৃষ্ণপ্রসন্নের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে সে কথা বড় বেশী জানা ছিল না। একদিন কলিকাতার এক সুবিখ্যাত রঙ্গমঞ্চে কৃষ্ণপ্রসন্নের চিত্তমত্তকরী ভাষণ শুনিতে শুনিতে ধীর, স্থির, সুপণ্ডিত ও তীক্ষ্ণধী সাহিত্যিক চন্দ্রনাথ বসু পর্য্যন্ত এতই আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলেন যে, কৃষ্ণপ্রসন্নের বাহু ধরিয়া সেই সভার মধ্যেই নৃত্য করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

পাদ্রীদিগের ধর্ম্মপ্রচারের প্রতিক্রিয়া হেতু কি ভীষণ চাঞ্চল্যই না দেখা দিয়াছিল সে দিন ভারতের নানা দিকে। দয়ানন্দের মুখে তখন গম্ভীর নাদ উঠিয়াছে পঞ্চনদের তীরে—ওঁ ওঁ; বাঙ্গালার মহর্ষির কণ্ঠে বাজিতেছে—'অসতো মা সদ্গময়'; ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরের চূড়ায় প্রহত হইয়া তখন শত শত কণ্ঠের ধ্বনি "একমেবাদ্বিতীয়ম্" আকাশ ছাইয়া ফেলিয়াছে! এত গণ্ডগোল ও এত ভিড়ের মধ্যে বাধ্য হইয়াই তখন মিসনরিদিগকে দূরে সরিয়া যাইতে হইল। এমন সময় বারাণসী হইতে আসিলেন পরম পণ্ডিত শশধর তর্ক-

চূড়ামণি। বঙ্গসাহিত্য-গগনের একচ্ছত্র সম্রাট্ বঙ্কিম নানা গ্রহ-নক্ষত্রে পরিসেবিত হইয়া শশধরকে অর্ঘ্য দিলেন।

হিন্দুধর্ম্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আরম্ভ হইয়া গেল। ভারতের সাধনা তখন এক নব মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়া পড়িল। যখন সুবিখ্যাত বৈদান্তিক কৃষ্ণদাস বেদান্তবাগীশ এবং শক্তি-সাধক শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব আসিয়া ধর্ম্ম-ব্যাখানের ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন, তখন যেন ভাগীরথীর তরঙ্গের সহিত আসিয়া মিশিল প্রবল বন্যার বারিপ্রবাহ। ইহাদিগের বক্তৃতায় ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে স্বাদেশিকতারও সুর ছিল, সুতরাং বাঙ্গালায় যে সনাতন-ধর্ম্মের তরঙ্গ উঠিবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? বালক-যুবক-বৃদ্ধ তখন দলে দলে সভামণ্ডপে যাইয়া ভিড় করিতে লাগিল এবং অঞ্জলি পূর্ণ করিয়া সনাতন হিন্দুধর্ম্ম-তত্ত্বামৃত পান করিতে আরম্ভ করিল। কিশোর কালীপ্রসাদও ছিলেন এই ভিড়ের মধ্যে একজন, যেমন ছিলেন শরৎ-মহারাজ এবং আরও অন্যান্য ধর্ম্মপিপাসুগণ।

কোনও যুগাবতারের আবির্ভাবের পূর্ব্বেই তাঁহার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত হইতে থাকে। তিনি আবির্ভূত হইয়া সেই ক্ষেত্রে বীজ বপন করিলেই নানা মহীরুহের জন্ম হয়। বাঙ্গালায় তখন যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব হইয়াছিল কিন্তু প্রথমে তাহা অনেকেই জানিত না। 'ইয়ং বেঙ্গলে'র নেতা কেশবচন্দ্র উহা জানিতে পাইয়াই সংবাদপত্রে সে কথা

প্রকাশ করিলে পর তাঁহাকে দেখিবার জন্য লোকে দলে দলে দক্ষিণেশ্বরে যাইতে আরম্ভ করিয়াছিল,—দক্ষিণেশ্বরে 'ইয়ং বেঙ্গলে'র ভিড় লাগিয়াছিল।

ঠাকুর একদিন একজন স্ত্রীভক্তকে বলিয়াছিলেন—'ওগো, এই যে সব দেখ্‌ছ, এত হরিসভা-টরিসভা, এ-সব জান্‌বে (নিজ শরীর দেখাইয়া) এইটের জন্য। এসব কি ছিল? কেমন এক রকম সব হয়ে গিছ্‌লো। (পুনরায় নিজ শরীর দেখাইয়া) এইটে আসার পর থেকে এ-সব এত হয়েছে, ভিতরে ভিতরে একটা ধর্ম্মের স্রোত বয়ে যাচ্ছে!' যুবকভক্ত-দিগকেও ঠাকুর বলিয়াছিলেন—"এই যে দেখ্‌ছ সব 'ইয়ং বেঙ্গল্' এরা কি ভক্তি-টক্তির ধার ধারতো? মাথা নুইয়ে পেরণাম (প্রণাম) করতেও জান্‌তো না! মাথা নুইয়ে আগে পেরণাম্ কর্‌তে কর্‌তে তবে এরা ক্রমে ক্রমে মাথা নোয়াতে শিখেছে। কেশবের বাড়ীতে দেখা করতে গেলুম, দেখি চেয়ারে ব'সে লিখ্‌ছে। মাথা নুইয়ে পেরণাম করলুম্, তাতে অমনি ঘাড় নেড়ে একটু সায় দিলে। তারপর আস্‌বার সময় একেবারে ভুঁয়ে মাথা ঠেকিয়ে পেরণাম করলুম্। তাতে হাত জোড় ক'রে একবার মাথায় ঠেকালে। তারপর যত যাওয়া-আসা হ'তে লাগ্‌লো ও কথাবার্ত্তা শুন্‌তে লাগ্‌লো, আর মাথা হেঁট ক'রে পেরণাম কর্‌তে লাগ্‌লুম, তত ক্রমে ক্রমে তার মাথা নীচু হ'য়ে আস্‌তে লাগ্‌লো। নইলে

আগে আগে ওরা কি এ-সব ভক্তি-টক্তি করা জান্‌তো, না মান্‌তো।" (৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর সম্যক্ প্রকাশিত হইবার সমকালে কলিকাতায় এবং তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে ধর্ম্মের একটি স্রোত বহিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কোথাও হরি-সভায় নাম-কীর্ত্তন, কোথাও সমাজ-গৃহে উপাসনা—কোথাও কলিকাতার বাগানে মিসনরি-দিগের বক্তৃতা, আবার আলবার্ট হল্ বা কোন বিখ্যাত রঙ্গমঞ্চে হিন্দু-ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যা ইত্যাদি কিছু-না-কিছু একটা হইতই এবং যাহারা দক্ষিণেশ্বরে যাইত তাহাদিগের ত কথাই ছিল না —স্বয়ং ধর্ম্মরাজের সাক্ষাৎ পাইয়া তাহারা ধন্য হইয়া ফিরিত। কিন্তু ঠাকুর যখন প্রকাশিত হন নাই, অথবা আবির্ভূতও হন নাই তখনকার ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, তখন হইতেই সেবা ও ধর্ম্মালোচনার দিকে লোকের মন আকৃষ্ট হইতেছিল। শাস্ত্র বলেন, চেষ্টা ও উদ্যমবিহীন যাহারা, ভগবান্ তাহাদিগকে সাহায্য করেন না—'ন ঋতে শ্রান্তস্য সখ্যায় দেবাঃ'। বাঙ্গালী তখন ভগবানের আশীর্ব্বাদ লাভ করিবার জন্য চেষ্টিত হইতেছিল।

দেখা যায় তখন একটা নবীন প্রেরণা আসিয়া অনেককে সৎকার্য্য করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ করিতেছে। কেহ বা তখন

(৮) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, গুরু-ভাব—উত্তরার্দ্ধ (১৩৩৭) স্বামী সারদানন্দ। পৃষ্ঠা—২২৮

৩

বহু অর্থ ব্যয় করিয়া দেশে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য চেষ্টিত; কেহ বা আর্ত্তের সেবার জন্য দাতব্য-চিকিৎসালয় স্থাপিত করিতেছেন, কেহ বা জলপ্লাবন ও দুর্ভিক্ষাদির কালে বাঙ্গালার বাহিরেও তণ্ডুল, বস্ত্র প্রভৃতি প্রেরণ করিয়া সেবা-ধর্ম্ম পালন করিতেছেন। কুষ্ঠরোগীর চিকিৎসালয়, গঙ্গা-যাত্রীদিগের জন্য নিবাস-ভবন, অতিথিশালা, ঔষধ প্রস্তুত করিয়া বিতরণ, পুল ও পথ নির্ম্মাণ, দীঘি-পুষ্করিণী খনন, দেবমন্দির নির্ম্মাণ, আর্ত্তত্রাণের জন্য সাহায্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা, দীনহীনের থাকার জন্য নিজ অট্টালিকা দান, দুস্থ ঋণগ্রস্ত কারারুদ্ধ ব্যক্তিদিগের উদ্ধারার্থ ঋণ মোচন, চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য অর্থদান প্রভৃতি নানা সদনুষ্ঠানের বৃত্তান্ত "সংবাদ পত্রে সেকালের কথা" পাঠ করিলে জানিতে পাওয়া যায়। সেই সময় ছিল ঠাকুরের আবির্ভাবের সমকাল। ঠাকুর আবির্ভূত হইয়া যখন প্রকাশিত হইলেন তখনও এই সকল সদনুষ্ঠান ত ছিলই, ইহার উপর আরম্ভ হইয়াছিল হরিনাম-কীর্ত্তন ও অন্যান্য পথে ধর্ম্মান্দোলন। দেশের বাতাস যে তখন কিছু ফিরিতে আরম্ভ করিয়াছিল, ঠাকুর স্বয়ংই তাহা বলিয়া গিয়াছেন।

উনবিংশ শতকে বাঙ্গালীর শিক্ষায়, সমাজে, ধর্ম্মে, রাষ্ট্রে যে কর্ম্মব্যাকুলতার পরিচয় পাওয়া যায় তাহা একটি পরাধীন অধঃপতিত জাতির ইতিহাসে তখনই প্রকাশ পায়, যখন সেই

জাতি নব অভ্যুদয় লাভ করিবার জন্য অগ্রসর হয়। কেশব-চন্দ্র, বা শশধর বা যে-কোন বিদ্যাদিগ্‌গজ বাঙ্গালী সেকালে যাহা করিতে পারেন নাই, তাহাই তখন করিয়া গেলেন, বলিতে গেলে একজন নিরক্ষর বাঙ্গালী। সেই বাঙ্গালীর প্রভা এখন প্রতিদিনই অধিকতর তেজঃপূর্ণ হইয়া শুধু বাঙ্গালায় নয়—শুধু ভারতে নয়—সমস্ত বিশ্বের আকাশে স্ফুরিত হইতেছে—যেন বিদ্যুতের মালা বিশ্বের গগনে খেলিয়া বেড়াইতেছে !

সেকালের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী কেশবচন্দ্র শেষে আসিয়া সেই বাঙ্গালীর শ্রীচরণে আত্মাহুতি দিলেন "কমল কুটীরে" ; শশধর আসিয়া করজোড়ে বলিলেন—"আমার হৃদয় শুষ্ক, দয়া করিয়া ভক্তি দিন" ; বিজয়কৃষ্ণ তাঁহারই প্রভাবে ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করিয়া গুরুর সন্ধানে বনবাসী হইলেন। তখন পাশকরা ছেলের দল—সেকালের সেই "ইয়ং বেঙ্গল" আসিলেন গজ-ফিতা ও পাশ্চাত্য দর্শন বিজ্ঞান লইয়া, তাঁহারা শ্রীভগবানকে মাপিয়া ও পরীক্ষা করিয়া বুঝিয়া লইবেন ! দক্ষিণেশ্বরে আসিয়াই শুনিলেন, সেই অদ্ভুত আত্মভোলা হাস্য-করুণাময়-মূর্ত্তি শ্রীশ্রীভবতারিণীর পূজারী ঠাকুর নিজে ভগবানকে দর্শন করিয়াছেন—ভগবানের সহিত তিনি নিত্য আলাপ করেন ! তিনি কহিলেন—"ভগবান কাহারও একার নহেন—তিনি সকলেরই 'সেই 'চাঁদা মামা।' পথের সন্ধানে কেন জীবন

ক্ষয় করিবে? জানিও—যত মত তত পথ। যে-কোনও একটাকে পাকা করিয়া ধর, ভগবানকে পাইবে। যদি তেমন করিয়া ডাকিতে পার আজই পাইবে।”

উদ্যতফণা বিবেকানন্দ সেই পূজারীর পায়ে মস্তক বিক্রয় করিলেন—তিনি “কালী মানিলেন”—জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্মত্ত কালীপ্রসাদ কাঁদিয়া কাঁদিয়া কহিলেন, ‘ঠাকুর, ঠাকুর! তোমার চরণ-ধূলায় ধূলায় ধূসর হবো—‘তোমার আসন তলের মাটীর পরে লুটিয়ে রবো।’ সন্ধানীরা তখন সন্ধান করিতে লাগিলেন —কে ইনি? কি ইনি? যে যেমন মন লইয়া তাঁহার নিকটে আসিল, ফিরিয়া যাইবার সময় দেখিল যে, তাহাতেই রঙ্ লাগিয়া গিয়াছে! দেহ দক্ষিণেশ্বর হইতে দূরে চলিয়া যায়, কিন্তু মন পড়িয়া রহে সেইখানেই, সেই অদ্ভুত ঠাকুরের চরণমূলে! এই ঠাকুরের চরণরেণু হইতে যে-কয়েকটি কণা বিশ্বে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল তাহাদের একটির কাহিনীই আমরা এই গ্রন্থে বলিতে প্রয়াস করিব। তিনি ছিলেন ত্যাগে দধীচি, যোগে মহাদেব, জ্ঞানে শঙ্কর, বুদ্ধিতে বৃহস্পতি—তিনি ছিলেন তেজে ভাস্কর, কর্ম্মে সব্যসাচী এবং বাগ্মীতায় শ্রীশ্রীসারদা-মাতার বরপুত্র—যাঁহার আশীর্ব্বাদে তাঁহার কণ্ঠে বীণাবাদিনীর অধিষ্ঠান হইয়াছিল। বর্ত্তমান জগতের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক আচার্য্য উইলিয়ম্ জেমস্ পর্য্যন্ত দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে বহুঘণ্টা-ব্যাপী তর্ক-যুদ্ধের পর তাঁহার নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া

বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন—"That from the Swami's standpoint it was impossible to deny ultimate unity."

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শৈশব

শ্রীযুক্ত রসিকলাল চন্দ্র ছিলেন ওরিএণ্টাল্ সেমিনরির ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপক। একজন কুশলী অধ্যাপক বলিয়া সেকালে যেমন তাঁহার খ্যাতি ছিল, তেমনি ছিল তাঁহার সত্যনিষ্ঠ ধার্ম্মিক জীবনের প্রশংসা। তিনি যে-যুগের মানুষ ছিলেন সে-যুগে সত্যনিষ্ঠা, ধর্ম্মপরায়ণতা ও গোঁড়ামি-বিবর্জ্জিত সুদৃঢ় চরিত্র একই পাত্রে বড় বেশী দেখা যাইত না। সেই যুগের প্রায় অবসান সময়ে, কালীপ্রসাদের কৈশোর কাল-প্রভাবে কতটা প্রভাবান্বিত হইয়াছিল সে আলোচনা যথাস্থানে করা হইবে। রসিক মাষ্টার মহাশয় ছিলেন একজন অমায়িক পরোপকারী নিরভিমান এবং বিদ্বান্ ব্যক্তি। সে-কালে ছিল এইরূপ যে, ইংরাজি-নবিস্ ত ইংরাজি-নবিসই—আসল হারাইয়া নকলের বাহার দিতেছেন—আবার সনাতনী ত সনাতনীই, বাঙ্গালা ভাষা পর্য্যন্ত ঘৃণা করেন এবং ধর্ম্মকে ছাড়িয়া শুধু আচারকেই মানিয়া চলেন! মাষ্টার মহাশয় তেমন ছিলেন না; তিনি ছিলেন ইংরাজি-নবিস্ ও সনাতনীর সমন্বয়। আহেরিটোলায় নীমু গোস্বামীর লেনে ছিল তাঁহার বাস।

বলিতে গেলে সে পল্লীর তিনি ছিলেন অন্যতম প্রধান ব্যক্তি। অনর্গল বিশুদ্ধ ইংরাজি বলিতে পারিতেন বলিয়া প্রতিবেশিদিগের ইংরাজি লেখাপড়ার কাজ-কর্ম্ম সর্ব্বদা তাঁহাকেই করিতে হইত। প্রয়োজন উপস্থিত হইলে তাহারা যখন সাহেব-সন্দর্শনে যাইত তখন মাষ্টার মহাশয় সঙ্গে না গেলে তাহাদিগের মনে হইত কার্য্যে সুফল হইবে না।

বেহারীলাল ছিলেন রসিক মাষ্টার মহাশয়ের প্রথমা পত্নীর গর্ভজাত সন্তান। আলেক্‌জাণ্ডার ডফের ফ্রি চার্চ্চ ইন্‌ষ্টিটিউসনে বাঙ্গালার বিদ্রোহী-যুগের অন্যতম নেতা স্বনামপ্রসিদ্ধ কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বেহারীলালের সহপাঠী ছিলেন। যুগধর্ম্মের প্রভাবে উভয়েই হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া খৃষ্টমতাবলম্বী হইলেন। খৃষ্টান্ হইয়া বেহারীলাল যখন পিতৃগৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক মিসনরিদের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন তখন দুঃখে রসিক মাষ্টার মহাশয়ের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল। তিনি ছিলেন বিপত্নীক। বেহারীলাল ও তাহার ভগ্নীর মুখ চাহিয়াই তিনি পত্নী-শোক সম্বরণ করিতেন। সেই প্রাণাধিক প্রিয় পুত্র যখন তাঁহার ধর্ম্ম ও সংস্রব ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল তখন মাষ্টার মহাশয়ের জীবন যেন শূন্য হইয়া গেল। হৃদয়ের সেই গুরুভার লইয়া একদিন তিনি পূতসলিলা ভাগীরথীর শীতল তরঙ্গে যাইয়া নামিলেন, মনে করিলেন ডুবিয়া দেহত্যাগ করিবেন—মনের জ্বালা জুড়াইবেন, তিনি সলিল-সমাধি লাভ করিয়া

শীতল হইবেন! ও কি ও? কোন্ অশরীরী বাণী সেই সময়ে সুস্পষ্টকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—'কেন তুমি আত্মহত্যা করিবে? আত্মহত্যা মহাপাপ। ঘরে যাও—আবার বিবাহ কর।'

হয়ত, হইতে পারে মাষ্টার মহাশয়ের ক্ষুধিত ব্যথিত নিপীড়িত হৃদয় হইতেই এই বাণী উত্থিত হইয়াছিল! তিনি স্তম্ভিত হইলেন। সত্যই যে কেহ তাঁহাকে কিছু বলিল ইহা তিনি প্রথমে বিশ্বাসই করিতে পারিলেন না। কিন্তু অশরীরী বাণী তখনও তাঁহার কর্ণে বাজিতেছিল। তিনি কর্ত্তব্যবিমূঢ়ের মত ধীরে ধীরে তীরে উঠিলেন এবং ধীরে ধীরে আসিয়া তাঁহার শূন্যগৃহে প্রবেশ করিলেন। সেখানে প্রতি ধূলিকণা প্রতিদণ্ডে বেহারীলালের নিষ্ঠুর স্মৃতিটি জাগ্রত করিয়া দিল। স্বর্গত পত্নীর শোকস্মৃতি আবার নূতন করিয়া তাঁহাকে পীড়া দিতে আরম্ভ করিল।

মাষ্টার মহাশয় আর্ত্তের শরণ গীতা হাতে লইলেন এবং মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। এইভাবে গীতার পর বাইবেল্ অধীত হইল। তিনি কোরাণও পাঠ করিলেন। উপনিষদাদি ধর্ম্মগ্রন্থসমূহ নিবিষ্টচিত্তে অধ্যয়ন করিতে করিতে তাঁহার সুদৃঢ় প্রতীতি হইল যে, হিন্দুর ভগবান, মুসলমানের আল্লা, খৃষ্টানের যীশু সকলেই এক। সেই এক অদ্বিতীয় ঈশ্বর মনোবুদ্ধির অগোচর। মঙ্গলময় তিনি। এইরূপ মনোভাব বেহারীলালের ধর্ম্মান্তর গ্রহণের বেদনাকে হয়ত

কিছু লাঘবও করিয়া থাকিতে পারে। যাহা হউক, 'ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্' এই মহামন্ত্রটি বৃহৎ অক্ষরে লিখাইয়া তিনি ফ্রেমে বাঁধাইয়া লইলেন এবং সর্ব্বদা দেখিতে পান এমন স্থানে উহা রক্ষা করিলেন। হিন্দুধর্ম্মের এই সার সত্যটি জীবনান্ত-কাল পর্য্যন্ত তাঁহার প্রাণ হইতে কখনও দূরে যায় নাই।

বেহারীলালের ধর্ম্মান্তর গ্রহণের পর কিছুকাল অতীত হইয়া গেল। রসিক মাষ্টার মহাশয় অষ্টাবিংশতি বর্ষ বয়সে দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করিলেন। তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নীর নাম ছিল নয়নতারা। নয়নতারার গর্ভে নয়টি সন্তানের জন্ম হয়, তন্মধ্যে পাঁচটির শৈশবেই মৃত্যু ঘটে। অবশিষ্ট চারিটি সন্তানের মধ্যে কালীপ্রসাদ ছিলেন দ্বিতীয়। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ১৭ই অক্টোবর (বাঙ্গালা ১২৭৩ সালের ১৭ই আশ্বিন) পুষ্যা নক্ষত্রে কৃষ্ণানবমী তিথিতে রাত্রি প্রায় দশ ঘটিকার সময় জন্মযোগী কালীপ্রসাদের আবির্ভাব হয়। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের ১২ই জানুয়ারী যেমন ভারতের ইতিহাসে একটি অতি গৌরবের দিন, কারণ স্বামী বিবেকানন্দ এই দিনেই ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ১৭ই অক্টোবরও তেমনি ভারতের জয়যাত্রার ইতিহাসে আর একটি বিশেষ শুভলগ্ন; কারণ এই দিনে যে শিশু-আচার্য্য জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন উত্তরকালে তাঁহার কর ধারণ করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ মার্কিণ-বিজয় করিয়াছিলেন।

অধ্যাপক বিনয় সরকার মহাশয় ঠিকই বলিয়াছেন—"রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠায় বিবেকানন্দ ও অভেদানন্দ বাস্তবিক পক্ষে কানাই, বলাই।……অভেদানন্দ বিবেকানন্দের কাজগুলো বজায় রাখতে পেরেছেন—ফুলিয়ে তুলেছেন—বাড়িয়ে দিয়েছেন। প্রথম কয়েক বছর ধ'রে বিবেকানন্দকে ইউরোরামেরিকায় বাড়তির পথে ঠেলে তুলেছিলেন অভেদানন্দ।……রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা-যুগে প্রথম ঘটনাগুলার ভেতর বিবেকের কথা বল্‌তে গেলে অভেদকে টান্‌তে হ'বে, আর অভেদের কথা বল্‌তে গেলে বিবেককেও টান্‌তে হবে।

"যুবক-ভারতের ইতিহাস যারা আলোচনা কর্‌তে চায় তারা এই দু'জনকে অন্তত সেই দশ বছরের জন্য জার্ম্মাণ-সমাজতন্ত্রী মার্ক্স ও এঙ্গল্‌সের মতন পুরামাত্রায় সহযোগীরূপে বিবৃত কর্‌তে বাধ্য। আমাদের দেশী দৃষ্টান্ত দিয়ে বল্‌বো যে, বিবেক আর অভেদ—এই দু'জন যেন আমাদের একালের বৈদিক অশ্বিনীকুমারদ্বয়।" (১)

স্বর্গত সুপ্রসিদ্ধ ব্যবহারজীব বি. সি. চাটার্জ্জি মহাশয়ও বলিয়া গিয়াছেন—"ঐতিহাসিকের ভাষায় বলিতে গেলে একজনকে বাদ দিয়া আর একজনের কথা ভাবা যায় না। পাশ্চাত্যের সেই সুদূর পশ্চিম-জগতে বিবেকানন্দ হিন্দুধর্ম্মের

---

(১) অধ্যাপক বিনয় সরকার: "সমসাময়িক ভারতের চোখে অভেদানন্দ" ইতি শীর্ষক নিবন্ধ। (শিক্ষাতীর্থ কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত)।

দীপ প্রজ্জ্বলিত করিয়াছিলেন। একথা কে না জানে? কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গে এই কথাটিও বিশেষ ভাবে মনে রাখিতে হইবে যে, আর কেহ নহেন, কেবল অভেদানন্দই সেই দীপটিকে প্রজ্জ্বলিত রাখিয়াছিলেন, উহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন এবং নিজের সমগ্র জীবনের ভক্তি শ্রদ্ধা ও সাধনা দিয়া সেই শিখাটিকে এমনভাবেই পরিবর্দ্ধিত করিয়াছিলেন যে, যাহা ছিল একদিন একটি শিখামাত্র, তাহাই হইয়া উঠিল অপূর্ব্ব প্রভায় সমুজ্জ্বল একটি অনির্ব্বাণ হোমানল। রামকৃষ্ণ-মিশনের যে সকল প্রতিষ্ঠান (সে দেশে) জন্মলাভ করিয়াছে—অভেদানন্দের আত্মাহুতির পশ্চাতে যে দুষ্কর কর্ম্মপ্রচেষ্টা বর্ত্তমান ছিল—সেগুলি তাহারই বহিঃপ্রকাশ মাত্র।" (২)

শিশু-আচার্য্য কালীপ্রসাদ যখন ভূমিষ্ঠ হইলেন সকলে তখন সবিস্ময়ে দেখিল নাড়ীর পাকে পাকে শিশুদেহ আবদ্ধ। যাহারা দেখিল তাহাদিগের মনে হইল, শিশুটি বোধ হয় কোনও যোগী মহাপুরুষ হইবে—এবার আর সংসারে আসিতে ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু কোনও মহাশক্তি যেন তাহাকে বলপূর্ব্বক বাঁধিয়া পৃথিবীতে পাঠাইয়াছে! নাড়ী কাটিয়া শিশুকে বন্ধন মুক্ত করা হইল বটে কিন্তু বহুক্ষণ চলিয়া গেল, শিশু রোদনও করিল না—জীবনের লক্ষণও দেখাইল না।

---

(২) সুবিখ্যাত ব্যবহারজীব বি. সি. চাটার্জ্জি—"সমসাময়িক ভারতের চোখে অভেদানন্দ" ইতি শীর্ষক নিবন্ধ। ('শিক্ষাতীর্থ কার্য্যালয়' হইতে প্রকাশিত)।

তখন তাহার নিমীলিত নয়ন-পত্রে লঙ্কার গুঁড়া লাগাইতেই শিশু চীৎকার করিয়া রোদন করিয়া উঠিল—এতক্ষণে যেন তাহার ধ্যানভঙ্গ হইল। নাড়ীর বন্ধন-চিহ্ন বহুদিন পর্য্যন্ত শিশুর দেহে বর্ত্তমান ছিল।

মাতা নয়নতারা ছিলেন সতী, সাধ্বী, ধর্ম্মপ্রাণা হিন্দুনারী। প্রতিদিবস উপাসনার শেষে রামায়ণ ও মহাভারতের কিয়দংশ পাঠ না করিয়া তিনি জলগ্রহণ করিতেন না। বহুদিন হইতেই তিনি মনে মনে মা কালীর নিকট এই প্রার্থনা করিয়া আসিতেছিলেন যে, তাঁহার গর্ভে যেন এমন একটি পুত্র জন্মে যাহার মহত্ত্বে তাঁহার মাতৃহৃদয় গৌরবে পূর্ণ হইয়া উঠিবে—কুল উজ্জ্বল হইবে, পৃথিবী হইবেন ধন্যা! যদিও নয়নতারা ছিলেন বৈষ্ণবমতাবলম্বিনী কিন্তু এই প্রার্থনা নিবেদিত কুসুমার্ঘ্যের মত প্রতিদিনই কালীঘাটে জগজ্জননীর শ্রীচরণ-তলে যাইয়া পৌঁছিত। মা তাঁহার কন্যার প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন দেখিয়া নয়নতারা ছয় মাস বয়স্ক শিশুটিকে লইয়া একদিন কালীঘাটে যাত্রা করিলেন।

মন্দিরে উপস্থিত হইয়া নয়নতারা পরম ভক্তিভরে পুত্রকে বিশ্বমাতার চরণমূলে অর্পণপূর্ব্বক নিজের বক্ষ চিরিয়া রক্ত দিয়া যুক্তকরে কহিলেন—'নে মা, রক্ত নে মা—প্রসীদ জগদীশ্বরি! তোমারই প্রসাদে পাওয়া পুত্রের নাম রাখিলাম—'কালীপ্রসাদ।' কালীকে মনুষ্যত্ব দাও, জ্ঞান দাও, মহত্ব

দাও মা—তার কালীপ্রসাদ নাম সার্থক হোক্।' শ্রীমন্দির বোধ হয় তখন জগজ্জননীর প্রসন্ন হাস্যে ঝল্‌মল্ করিয়া উঠিয়াছিল। মাতৃহৃদয়-শোণিতের আরক্ত তিলক ললাটে পরিয়া শিশু কালীপ্রসাদ সেদিন বিশ্বজয়ের শক্তি লাভ করিয়াছিলেন।

একালের কলিকাতা দেখিয়া যেমন সেকালের কলিকাতাকে চিনিতে পারা যায় না, তেমনি একালের কালীঘাট দেখিয়া সেকালের কালীঘাটকেও চিনিতে পারা যায় না। আহেরি-টোলা হইতে কালীঘাট বহুদূরের পথ। একালের বৈদ্যুতিক ট্রাম-গাড়ী সে দূরত্বকে কমাইয়া দিয়াছে বটে, কিন্তু সেকালে যাতায়াতের ব্যবস্থা ছিল অশ্বযানে বা শিবিকায়। তাহাতে এই তীর্থে পৌঁছিতে সময় এবং অর্থ উভয়েরই প্রাচুর্য্য প্রয়োজন হইত। গড়ের মাঠের পথে গোরাদিগের দস্যুতার ভয়ে গাড়ীর দ্বার বন্ধ না করিয়া কেহ স্ত্রীলোক লইয়া যাতায়াত করিতে সাহসী হইত না। যাহা হউক, দস্যু-ভীতি ও পথশ্রম উপেক্ষা করিয়া নয়নতারা কালীপ্রসাদকে লইয়া প্রতি মাসে একবার করিয়া কালী-দর্শনে যাইতেন এবং যথারীতি পূজা দিয়া প্রসাদ পাইতেন।

নয়নতারার অসীম দেবীভক্তি শিশুকাল হইতেই কালী-প্রসাদের হৃদয়ে বিশেষ করিয়া মাতৃভক্তির ভাব উদ্রিক্ত করিয়াছিল। বয়োবৃদ্ধি এবং জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই

ভক্তি ক্রমেই গভীর হইতে গভীরতর হইয়া অবশেষে প্রবাহিণী গঙ্গায় পরিণত হইয়াছিল এবং বিশ্বের মা তাঁহার নিকটে হইয়াছিলেন—"অশেষ সৌম্যেভ্যাস্ত্বতিসুন্দরী"—শুধু "সৌম্যা" নহেন, "সৌম্যতরা"-ও নহেন—"সৌম্যতমা" এবং তিনিও হইয়াছিলেন সর্ব্বভাবে মাতৃময়। শ্রীশ্রীঠাকুরের পদাশ্রয় লাভ করিয়া তিনি শিখিয়াছিলেন—"যিনি শ্যামা, তিনিই ব্রহ্ম। যাঁরই রূপ, তিনিই অরূপ। যিনি সগুণ, তিনিই নির্গুণ। ব্রহ্ম শক্তি—শক্তি ব্রহ্ম—অভেদ। তিনি লীলাময়ী, এই সংসার তাঁর লীলা। তিনি ইচ্ছাময়ী, আনন্দময়ী। তোমরা মার কাছে আব্দার কর্‌বে। কথায় বলে মায়ের টান বাপের চেয়ে বেশী। মায়ের উপর জোর চলে, বাপের উপর চলে না।" মাতৃভক্তি হইতেই ভগবদ্ভক্তি জন্ম লাভ করে, কালীপ্রসাদেরও তাহাই হইয়াছিল।

দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীঠাকুর দেবকণ্ঠে গাহিতেন—

কে জানে কালী কেমন, ষড়্‌দর্শনে না পায় দরশন।
আত্মারামের আত্মা কালী, প্রমাণ প্রণবের বচন,
সে যে ঘটে ঘটে বিরাজ করে, ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন॥
কালীর উদরে ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড, প্রকাণ্ড তা বুঝ কেমন,
যেমন শিব বুঝেছেন কালীর মর্ম্ম,
অন্যে কেবা জানে তেমন।

মূলাধারে সহস্রারে সদা যোগী করে মনন,
কালী পদ্মবনে হংস সনে হংসীরূপে করে রমণ।
প্রসাদ ভাবে লোকে হাসে সন্তরণে সিন্ধু-তরণ,
আমার মন বুঝেছে, প্রাণ বুঝে না,
ধরবে শশী হ'য়ে বামন॥

মধুর কণ্ঠের এই মধুসঙ্গীত দক্ষিণেশ্বরে শুনিতে শুনিতে কতদিন কালীপ্রসাদ মাতৃভাবে আত্মহারা হইয়া যাইতেন।

পিতামহস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্‌সামযজুরেব চ॥

ভগবানের এই মহাবাক্যের প্রকৃত অর্থ দক্ষিণেশ্বরেই তিনি মনে-প্রাণে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। পরে প্রচারক-জীবনে তিনিই সর্ব্বপ্রথম পাশ্চাত্য জগতের সম্মুখে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, যদি সাধনায় সহজে সিদ্ধি লাভ করিতে চাও, ভগবানকে মাতৃভাবে উপাসনা কর। ১৮৯৯ সালের ৮ই জানুয়ারী তারিখে নিউইয়র্কের টাম্প্লেডো-হলে তিনি যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহার বিষয়বস্তু ছিল—"ভগবানের মাতৃভাব।"

চিন্তার গভীরতা, জ্ঞানের প্রসার, বিচারশক্তির তীক্ষ্ণতা, ইতিহাস ও বিজ্ঞানের সহিত দার্শনিক তত্ত্বের সমন্বয় সাধন, জটিল বিষয় সরল করিয়া প্রকাশ করিবার অনন্যসাধারণ ক্ষমতা, ভারত-সংস্কৃতির গৌরব ঘোষণা এবং মাতৃভক্তি যে

ভগবদ্ভক্তির জননী, এই সত্যের অন্তর্নিহিত দার্শনিক-তত্ত্ব প্রভৃতি নানা বিষয় মহারাজের এই ভাষণে পরিস্ফুট হইয়াছে বলিয়া উহার কোন কোন অংশের বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

এই বহু প্রশংসিত সুদীর্ঘ ভাষণে (৩) তিনি বলিয়াছিলেন—

"খৃষ্টধর্ম্মের আবির্ভাবের পর ভগবানকে জগৎপিতা ও সৃষ্টিকর্ত্তা রূপে উপাসনা করিবার পদ্ধতি খৃষ্ট-প্রচারক ও পুরোহিতগণ-কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হয়। খৃষ্টধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা যীশুও ভগবানকে তাঁহার পিতা স্বরূপ উপাসনা করিতেন—এবং জগৎ-পিতা বলিয়া তাঁহার নিকট প্রার্থনা নিবেদন করিতেন। যতই আমরা আধ্যাত্মিকতার পথে অগ্রসর হই এবং ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করি—তাঁহার সহিত আমাদের সম্বন্ধ ততই নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠে। উপাসক ও উপাস্যের মধ্যে কোন-একটি সম্বন্ধ স্থাপন না করিলে উপাসনা করা অসম্ভব হয়।

"প্রেমের একটি বন্ধন আছে যাহা পুত্রকে পিতার নিকটবর্ত্তী করে। সেই সম্বন্ধই আত্মাকেও ভগবানের সান্নিধ্যে আনে।

---

(৩) "On Sunday, January 8th. (1899), at 3 P. M. I delivered a public lecture on "The Motherhood of God" *for the first time.* It was liked so much that it was printed in a pamphlet form and it ran through several editions afterwards." *"Leaves from my Diary"—Swami Abhedananda : Page 56.*

চলিত ভাষায় লোকে ইহাই বলে যে, পার্থিব পিতাই আমাদের স্থষ্টিকর্ত্তা। যেখানে কিছুই ছিল না, সেই অবিদ্যমানতা বা অনস্তিত্ব হইতে পিতা যেন পুত্রকে স্থষ্টি করিয়াছেন। মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি যখন তেমন বেশী উন্নত হয় নাই তখন তাহারা মনে করিত যে, এইরূপ অনস্তিত্বের ভিতর হইতেই ভগবান বিশ্বকে স্থষ্টি করিয়াছেন। সেই জন্যই এই স্থষ্টি-কর্ত্তাকে পিতা বলা হয়। মানবে যে সকল গুণাবলী দৃষ্ট হয় সে সমুদয়কে অতিশয় বৃহৎ করিয়া আমরা ভগবানে আরোপ করি। ভগবান সম্বন্ধে আমাদের ধারণার আরম্ভ এই ভাবে হইয়া থাকে। তাহার পর ক্রমেই আমরা তাঁহাকে একে একে সকল ঐশ্বর্য্যশূন্য করিয়া ঐশ্বর্য্যবিহীনরূপে ভাবিতে শিখি।

"পুরুষ জন্মদাতা—স্ত্রী বা প্রকৃতি ধারণকর্ত্রী মাত্র। এই ভাবনাই খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারের আদিযুগে নারীকে অতিশয় নিম্নস্থান প্রদান করিয়াছিল। 'জেনেসিসে' এইরূপ আছে যে, পুরুষের পঞ্জরাস্থি হইতেই নারীর জন্ম হইয়াছে। এই বিশ্ব-স্থষ্টির মূলে যে প্রকৃতির ক্রিয়া বর্ত্তমান ইহা প্রত্যেক খৃষ্টমতাবলম্বীই স্বীকার করেন, কিন্তু সেই প্রকৃতির পূজা কখনও করা হয় নাই। পুরুষ বা পিতাকেই ক্রমে ক্রমে অধিকতর শক্তিশালী করিয়া গড়িয়া তুলিতে যাইয়া, মাতা বা প্রকৃতিকে ক্রিয়াহীনা করা হইয়াছে এবং শেষে প্রকৃতিকে

একেবারে বিসর্জ্জনই দেওয়া হইয়াছে। যতই আমরা বেশী বুঝিতে পারি যে, ভগবান এই বিশ্বপ্রকৃতির অন্তরে অবস্থিত—বাহিরে নহেন, ততই আমাদের জ্ঞানচক্ষু বেশী মুক্ত হয় এবং আমরা দেখি যে, তিনি আমাদের পিতাও যেমন, মাতাও তেমনি। তিনি "পিতামহস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।" যখন আমরা বুঝিতে পারি যে, এই প্রকৃতি বা স্ত্রী-শক্তিকে পুরুষ-শক্তি হইতে পৃথক্ করা যায় না, তখনই আমরা দেখিতে পাই যে, পুরুষ ও প্রকৃতি এতদুভয়ে মিলিয়া যাহা, তাহাই স্বয়ং ভগবান। এই সম্মিলিত পুরুষ-শক্তি ও স্ত্রী-শক্তিই ঐশ্বরিক-শক্তি; ভগবানে এই দুই শক্তিই সমভাবে বর্ত্তমান। এইরূপ জ্ঞান জন্মিলেই আমরা আর প্রকৃতিকে ভগবান হইতে পৃথক ভাবিতে পারি না। বর্ত্তমান বিজ্ঞানও এই লক্ষ্যেই উপস্থিত হইতে প্রয়াসী।

"বিজ্ঞান এই শিক্ষা দেয় যে, এই বিরাট শক্তির মধ্যেই বিশ্ব অপ্রকাশিতভাবে বিদ্যমান ছিল এবং ক্রমবিবর্ত্তনের ফলে বিশ্বের অস্তিত্ব-সম্ভাব্যতা শেষে শক্তি ও গতিবেগ লাভ করিয়া সত্যরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্যে এই বিরাট শক্তিকেই প্রকৃতি বলা হইয়াছে—ইনিই "জগৎ-জননী শিবে।" ইনি পরমা প্রকৃতি বা ভগবানের ঐশ্বরিক শক্তি। ইঁহা হইতেই বিশ্বের জন্ম হইয়াছে বলিয়া ইনি মঙ্গলময়ী বিশ্বজনয়িত্রী। এই শক্তি বা পরাপ্রকৃতিকে পিতা না বলিয়া মাতা বলাই উচিত,

কারণ মাতা যেমন সৃষ্টির বীজ ধারণ করেন, ইনিও তেমনি জন্মের পূর্ব্বে এই বিশ্বের বীজ ধারণ করেন, উহাকে পরিপুষ্ট করেন, পালন করেন এবং জন্মকালে অনন্ত মহাশূন্যে বিশ্বকে প্রক্ষেপ করিয়া থাকেন। সৃষ্টিকর্ত্তা, পালনকর্ত্তা এবং লয়কর্ত্তা এই ত্রয়ীর ইনিই জননী—যত কিছু শক্তি, যত কিছু কর্ম্ম আছে সে সকলের মূলাধার। ইনিই সেই শক্তি যিনি ক্রিয়াশীলা। ঐতিহাসিক যুগেরও পূর্ব্বে—বৈদিককালেই হিন্দুরা জানিত যে, এই শাশ্বতশক্তিই বিশ্বজননী এবং তদবধিই তাহারা এই জগজ্জননীকে পূজা করিয়া আসিতেছে।

"ঋগ্বেদই হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রের প্রাচীনতম গ্রন্থ। তাহাতে দেখিতে পাই বিশ্বমাতা বলিতেছেন—এই বিশ্বের রাণীই আমি। যত কিছু সম্পদ ও কর্ম্মফল তাহা আমিই দিয়া থাকি; আমি চৈতন্যময়ী, আমি সর্ব্বজ্ঞানের মূলীভূতা আধার। যদিও আমার আর কেহ দ্বিতীয় নাই, আমি এক ও অনাদি—কিন্তু আমারই আত্মশক্তি বলে আমি বহু হইয়াছি। মনুষ্যকে রক্ষা করিবার জন্য আমিই সমরায়োজন করি—শত্রুবধ করিয়া শান্তি-সংস্থাপন তাহাও আমিই করি। স্বর্গ এবং পৃথিবী আমিই সৃষ্টি করিয়াছি—পরম পিতারও জননী আমি। বায়ু যেমন আত্মবলেই প্রবহমান, আমিও তেমনি আমারই ইচ্ছায় যাবতীয় দৃশ্য প্রপঞ্চ রচনা করিয়া থাকি। আমি স্বাধীনা এবং কাহারও নিকটে আমার কোনরূপ দায়িত্বও নাই। আমি

মহাব্যোমের অতীত—আমি বিশ্বেরও অতীত। পরিদৃশ্যমান বিশ্বই আমার জয়-নিদর্শন। আমার নিজের শক্তিতেই আমি এইরূপ হইয়াছি। সুতরাং এই জগন্মাতাই সর্ব্বেসর্ব্বারূপে পরিকীর্ত্তিতা হইয়াছেন। কাহাকেও বা তিনি করিয়াছেন সৎ, ধার্ম্মিক ও দেবোপম; আবার কাহাকেও করিয়াছেন দুষ্ট ও পাপী। তাঁহার শক্তিবলেই আমরা পুণ্যও করি, আবার পাপও করি। কিন্তু তিনি নিজে পাপ-পুণ্যের—ইষ্টানিষ্টের অতীত। তাঁহার শক্তি ইষ্টজনকও নহে—অনিষ্টকারীও নহে—পাপ পুণ্য, ইষ্ট বা অনিষ্ট যে-ভাব লইয়া আমরা সেই শক্তিকে দেখি, তিনি আমাদিগের নিকটে সেই ভাবেই প্রতীয়মান হন।

"এই সর্ব্বপরিব্যাপ্ত ঐশ্বরিক শক্তি দুই পথে প্রকাশ পান। একটির নাম বিদ্যা, অপরটির নাম অবিদ্যা। বিদ্যাশক্তি আমাদিগকে ভগবানের দিকে আকর্ষণ করে, অবিদ্যাশক্তির প্রভাবে আমরা সংসারে আবদ্ধ হই। বিদ্যা জ্ঞান এবং অবিদ্যা অজ্ঞান—বিদ্যা আলোক, অবিদ্যা অন্ধকার। প্রত্যেকের হৃদয়েই এই দুইটি শক্তি নিরন্তর ক্রিয়া করিতেছে। বিদ্যা চাহে অবিদ্যাকে জয় করিতে, অবিদ্যা চাহে বিদ্যাকে জয় করিতে। বিদ্যা জয়যুক্ত হইলে আমরা ভগবান-লাভে সচেষ্ট হই, স্বার্থশূন্য হই এবং ধার্ম্মিক হইয়া উঠি। কিন্তু বিপরীত ধর্ম্ম অবিদ্যা প্রাধান্য লাভ করিলে আমরা স্বার্থপর, দুষ্টবুদ্ধি এবং সংসারী হইয়া পড়ি। বিদ্যা-ধর্ম্ম সকলের মধ্যেই বর্ত্তমান

আছে। ভক্তি, উপাসনা, পবিত্রতা, অহিংসা প্রভৃতি দ্বারা যে-কেহ বিদ্যা-ধর্ম্মকে অন্তরে জাগ্রত করিতে পারে। এই ঐশ্বরিক শক্তির, এই বিদ্যা-ধর্ম্মের অনুশীলন ও সাধনা করিলে আমরা সহজেই উহা লাভ করিতে পারি। এই সাধনা বা উপাসনা বা অনুশীলনের অপর নাম—সর্ব্বদা স্মরণ মনন।

"এই ঐশ্বরিক শক্তি কখনও বা পুরুষরূপে এবং কখনও বা নারীরূপে বিশ্বে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন এবং তখনই অধর্ম্ম বিনষ্ট হইয়া ধর্ম্ম সংস্থাপিত হয়। বিশ্বের সকল নর-নারীই তাঁহার সন্তান। পুরুষ অপেক্ষা এই নারী-অবতারে কিছু বেশী বিশেষত্ব আছে। পৃথিবীতে নারীই মাতৃত্বের প্রতীক। সুতরাং বিবাহিতাই হউন বা কুমারীই হউন—নারীমাত্রেই জগজ্জননীর প্রতিমূর্ত্তি। এই কারণেই হিন্দুরা নারীর এত পূজা করিয়া থাকে।

"পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষই একমাত্র দেশ যেখানে ভগবানের এই নারীমূর্ত্তি আবহমানকাল হইতে জগজ্জননীরূপে সম্পূজিতা। ভারতবর্ষই পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র দেশ যেখানে জননী জীবিতা পরমেশ্বরীরূপে পরিগৃহীতা—এই ভারতবর্ষই একমাত্র দেশ যেখানে শৈশবেই শিশু শিক্ষা করে—সহস্র পিতা অপেক্ষা এক মাতাই গরীয়সী।

"ভারতে নারীর যথেষ্ট অমর্য্যাদা হয় এইরূপ অনেক কাহিনীই আপনারা শুনিয়া থাকিবেন। কিন্তু জানিবেন

তাহার অনেকগুলি খুবই অতিরঞ্জিত, কতকগুলি একেবারেই মিথ্যা এবং সামান্য কয়েকটি মাত্র আংশিকরূপে সত্য। এ-বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করিবার সময় আমার নাই। তবে ইহাই জানিবেন যে, ভারতবর্ষ ছাড়া আপনারা এমন আর একটি দেশ কোথাও পাইবেন না, যেখানে প্রত্যেক মাতাই দেবীরূপে সন্তানের পূজা পাইয়া থাকেন—যেখানে প্রত্যেক গ্রাম বা নগরেরও বিশেষ রক্ষাকর্ত্রী একজন 'মাতা'। ইহা শুধু আমার কথা নহে—সার মনিয়ার মনিয়ার উইলিয়ম্‌সও এই কথাই বলিয়া গিয়াছেন।

"ভগবানে মাতৃভাবের আরোপ করায় ভারতের স্ত্রী-পুরুষের প্রাত্যহিক জীবনে যে ফল ফলিয়াছে তাহা শুনিলে বিস্মিত হইবেন। প্রত্যেক হিন্দু নারীই মনে করে যে, সে সেই পরমারাধ্যা জগন্মাতারই অংশ—শুধু তাহাই নহে—তাঁহার সহিত অভিন্ন সে। পৃথিবীর সমুদয় নর-নারীকে সে তাহার নিজের সন্তান-সন্ততি বলিয়া মনে করে। সে মনে করে যে, এই বিশ্বের মঙ্গলকারিণী জননী সে। এমন যাহার মন, অপরের প্রতি সে কেমন করিয়া নির্দ্দয়া হইবে? তাহার সুপবিত্র মাতৃ-প্রেম পৃথিবীর সমুদয় নর-নারীর উপর সমধারায় বর্ষিত হয়। সেই হৃদয়ে কোন অপবিত্র ভাব বা রিপু-তাড়িত উত্তেজনার স্থান নাই। অন্তরপূর্ণ মাতৃভাব লইয়া নরদেহে বিরাজিতা বিশ্ব-জননীর মতই তাহার জীবন অতিবাহিত হয়। তাহার

পুত্রই তাহার নরদেহে অবতীর্ণ ঈশ্বরাবতার। ভগবানের অবতারকে সে বাৎসল্যভাবেই পূজা করিয়া থাকে। মেরী যেমন ছিলেন ঈশার জননী, তেমনি ভারতের হিন্দু নারীও এই মনে করে যে, সে কৃষ্ণ-জননী যশোদা।

"আবার পুরুষের দিক হইতে দেখিলে বলা যায় যে, যখন একজন পুরুষ ভগবানে মাতৃভাব আরোপ করিয়া তাঁহার উপাসনা করেন তখন নিশ্চয়ই তাঁহার এই কথাই মনে হয় যে, তিনি যেন তাঁহার মাতৃক্রোড়ের শিশু। মাতার নিকটে যখন সন্তান থাকে তখন সে কোনো-কিছুতেই ভয় পায় না, তেমনি বিশ্বমাতার অঙ্কে যে সন্তান অধিষ্ঠিত হয় তাহার আর ভয় কোথায় ?"

কালীপ্রসাদের হৃদয় বাল্যকাল হইতেই সর্ব্বদা অপূর্ব্ব মাতৃ-ভাবে বিগলিত হইয়া থাকিত বলিয়াই মাতৃপূজার এইরূপ স্তুতি তাঁহার ভাষণে পরিস্ফুট হইয়াছে। কিন্তু কে তাঁহার হৃদয়ে এই মহৎ ভাব প্রথমে ফুটাইয়াছিল ? উত্তরে বলিব, প্রথমে তাঁহার জননী নয়নতারা দেবী এবং পরে তাঁহার গুরু—তাঁহার ইষ্ট—তাঁহার ইহপরকালের সর্ব্বস্ব—ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ। মাতা নয়নতারাকে পরমারাধ্যা ভগবতীরূপে পূজা করিয়া কালীপ্রসাদের অন্তরে ভগবৎপ্রেম প্রথমে স্ফুরিত হইয়াছিল। তিনি ছিলেন মাতার পূজারী। মাতৃবাক্য তাঁহার নিকটে ভগবানের আদেশ স্বরূপ ছিল। কোনো-কিছুই তাঁহাকে সেই

আদেশের বিরোধী করিতে পারে নাই। তিনি সন্ন্যাসী হইয়াও, লৌকিক কর্ম্মকাণ্ডের সহিত সংস্রববিহীন পরমহংস হইয়াও মাতার দেহান্তের পর যেভাবে তাঁহার পারলৌকিক কার্য্য সুসম্পন্ন করাইয়াছিলেন তাহা গৃহীর পক্ষেও আদর্শ হইবার যোগ্য। উত্তরকালে শ্রাদ্ধাদি বিষয়ে তিনি যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহার কিছু আভাস দিতেছি।

তিনি বলিতেন, শ্রাদ্ধাদি যথাশক্তি সম্পন্ন করা খুবই উচিত। শ্রাদ্ধের জন্য দিন-নির্ণয়ের কোন প্রয়োজনীয়তা তিনি অনুভব করিতেন না; তবে সমাজে বাস করিতে গেলে সামাজিক নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়, সেই জন্যই লোকে দিন নির্ণয় করিয়া থাকে। শ্রাদ্ধের মূল তত্ত্ব শ্রাদ্ধ কর্ত্তার নিজের কোনও কল্যাণ কামনা নহে, বিদেহী আত্মার কল্যাণ প্রার্থনা। সেই মঙ্গল কামনার ফলে সত্য সত্যই বিদেহী আত্মা উন্নত লোকে গমন করিয়া থাকে। এই বিষয়ে লণ্ডনে ও মার্কিন দেশে মহারাজ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। অনেক প্রেতাত্মা তাঁহার আশীর্ব্বাদ লইয়া মঙ্গলের পথে অগ্রসর হইয়াছিল। মহারাজ বলিতেন যে, ভক্ত বলরাম বসুর যখন দেহত্যাগ হয় তখন তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি তিনি দেখিয়াছিলেন।

মহারাজ বলিতেন যে, শ্রাদ্ধ ক্রিয়া শুধু যে হিন্দুর পক্ষেই কর্ত্তব্য এবং অবশ্য-প্রতিপাল্য একটি সামাজিক নিয়ম, তাহা নহে; পুরাকাল হইতেই ইজিপ্সিয়ান্, ব্যাবিলোনিয়ান্,

চ্যাল্‌ডিয়ান্‌, আসিরিয়ান্‌, চীনা, পার্শী, হিন্দু প্রভৃতি সকল জাতির মধ্যেই কোন-না-কোন আকারে শ্রাদ্ধ করিবার রীতি বর্ত্তমান আছে। শ্রাদ্ধেরই অপর নাম পিতৃ-পূজা।

অতিশয় সুপ্রাচীন কালে উপাসনার প্রধান রূপ ছিল স্বর্গত পিতৃপুরুষের পূজা। পৃথিবীতে থাকা কালে তাঁহারা যাহা করিতে ভালবাসিতেন তাহাই করা, তাঁহারা যাহা পানাহার করিতে ভালবাসিতেন, তাঁহাদিগের উদ্দেশে সেই সকল দ্রব্যের নিবেদন, তাঁহাদিগের উপদেশাদি পালন এই সকলই পিতৃপূজার উপকরণ। চীন দেশে কোনও ব্যক্তি-বিশেষ উচ্চ সম্মানাদি লাভ করিলে তাহার পিতৃপুরুষকেই সেই সম্মানের অধিকারী করা হয়। ধর্ম্ম বলিতে এক সময়ে এই পিতৃপূজাকেই বিশেষ ভাবে বুঝাইত।

ভগবানের নামে আমরা যে সকল নৈবেদ্য নিবেদন করিয়া থাকি, তাহার মূলেও এই পিতৃপূজাই বর্ত্তমান আছে। পিতৃগণ বিদেহী অবস্থাতেও ক্ষুধা তৃষ্ণাদির অধীন এই ধারণা হইতেই ক্রমে ক্রমে দেবতার উদ্দেশে ভোগ নিবেদন করিবার রীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। বীর্য্যবন্ত পুরুষগণ পিতৃপুরুষের শৌর্য্য-বীর্য্য ও ধার্ম্মিকতার কাহিনী স্মরণ করিয়া শ্রদ্ধান্বিত হৃদয়ে যে-সকল গাথা গাহিত, তাহাই ক্রমে ক্রমে দেবপূজার স্তোত্ররূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া পৃথিবীর নানা দেবায়তনে এখন শত কণ্ঠে গীত হইতেছে।

মহারাজ বলিতেন, বৈদিক যুগের সাহিত্য আলোচনা করিলে পিতৃপুরুষের উদ্দেশে উদ্গীত বহু মন্ত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। শ্রাদ্ধকালে তাঁহাদিগকে শ্রাদ্ধক্ষেত্রে আবাহন করিয়া আনা হয় এবং নানাবিধ উপচারে পরম শ্রদ্ধার সহিত পুজা করা হয়। তাঁহাদিগের উদ্দেশে যাহা-কিছু করা হয় তাহারই নাম শ্রাদ্ধ। প্রার্থনা, স্তব-স্তুতি, উপচার নিবেদন প্রভৃতি সমস্তই সেই 'যাহা-কিছুর' অন্তর্গত। হিন্দুরা পিতৃপুরুষের কল্যাণের জন্য তীর্থযাত্রা করে, দরিদ্র-নারায়ণকে সেবায় তুষ্ট করে, ক্ষুধিতকে অন্ন দেয়, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দান করে—এইরূপ আরও কত কি করে। এই সমস্তই শ্রাদ্ধের অঙ্গ। হিন্দুরা বিশ্বাস করে যে, পিতৃপুরুষের কল্যাণ কামনা করিয়া এই সকল কার্য্য করিলে তাহার ফলে পিতৃগণের পিতৃলোকে যাত্রার পথ সহজ হয়। পিতৃলোকে যাইয়া তাঁহারা সেই সকল সুমঙ্গল চিন্তা ও সদনুষ্ঠানের ফল ভোগ করিয়া থাকেন।

আমেরিকায় থাকা কালে অনেক প্রেতাত্মার সহিত মহারাজের সাক্ষাৎ হইয়াছিল, কাহারও কাহারও সহিত তিনি করমর্দ্দনও করিয়াছিলেন। তাহাদিগের সূক্ষ্ম বায়বীয় দেহ। সুতরাং করমর্দ্দনকালে স্পর্শানুভূতি ঘটিতে পারে নাই। তাহারা মহারাজের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিত এবং তিনিও পরিপূর্ণ হৃদয়ে তাহাদিগের মঙ্গল কামনা করিতেন। আত্মার উদ্ভব কিরূপে হইল, আত্মার স্বরূপই বা কি, পরমাত্মার

সহিত জীবাত্মার সম্বন্ধ কেমন—এ সকল প্রশ্নের কোন সদুত্তর তাহারা দিতে পারে নাই। জিজ্ঞাসিত হইলে অকপটে বলিত—'আপনিই আমাদিগের অপেক্ষা অনেক ভাল জানেন।' তাহাদিগের কথায় মহারাজ বুঝিয়াছিলেন যে, সত্য-প্রতিষ্ঠায় আমাদিগকে সাহায্য করিবার শক্তি তাহাদিগের নাই—কারণ পরমব্রহ্মের সংবাদ তাহারা রাখে না। সাধারণতঃ তাহারা 'পৃথ্বীবদ্ধ' আত্মা, এবং নিজেদের মঙ্গলের জন্য আমাদিগের সাহায্যপ্রার্থী হইয়া সর্ব্বদাই আশে-পাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সুতরাং শ্রাদ্ধাদির দ্বারা তাহাদিগের মঙ্গল বিধান করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

মহারাজ তাঁহার 'প্রেততত্ত্ব ও বেদান্ত' ইতি শীর্ষক একটি ভাষণে এই সকল বিষয়ের সুযুক্তিপূর্ণ আলোচনা করিয়া পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে ইহাই প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন যে, প্রেত-তত্ত্বানুসন্ধান শক্তির অপচয় মাত্র। যতক্ষণ বাসনা-কামনা থাকিবে ততক্ষণ জন্ম-মৃত্যুচক্রের চির আবর্ত্তন হইতে কিছুতেই নিষ্কৃতি নাই; পিতৃলোক হইতে মরলোকে এবং মরলোক হইতে আবার পিতৃলোকে পুনঃ পুনঃ গতায়াত করিয়া বাসনা-কামনাদিকে সম্পূর্ণরূপে ক্ষয় করিতেই হইবে—তবে আসিবে কর্ম্মবন্ধন হইতে পূর্ণমুক্তির শুভ ক্ষণ। কর্ম্মবন্ধন হইতে কিরূপে মুক্ত হইতে পারা যায়, বেদান্তের শিক্ষা তাহাই। প্রেততত্ত্বের আলোচনায় জীবন ক্ষয় করিয়াও সে তত্ত্বের সন্ধান মিলিবে

না! যে পথে গতি হইলে জীবাত্মা পরমাত্মার সন্নিকট হইতে পারিবে—কি সদনুষ্ঠান, কি প্রেতাত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস, কি পিতৃপুরুষের পূজা—কিছুতেই সেই পরম পথের সন্ধান পাওয়া যাইবে না। সেই তত্ত্ব জানিতে হইলে চাই আত্মজ্ঞান এবং তৎপূর্ব্বে চাই সেই অভিজ্ঞান যাহা বলিয়া দিবে জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার সম্বন্ধ কি। আত্মজ্ঞান ও আত্মসুখ এই দুইটিই সকল ধর্ম্মের মুখ্য বিষয়। এই দুইটি সংজ্ঞার সহজ অর্থ হইতেছে—"ঐশীপ্রকৃতি বা পরমাত্মার জ্ঞান, এবং নীচ প্রকৃতি বা স্বার্থপর স্বভাবের দমন।" মনে রাখিতে হইবে, পাশবদ্ধ আত্মাই জীব এবং পাশমুক্ত আত্মাই শিব—আর মনে রাখিতে হইবে ভগবানের মহা বাক্য—'যান্তি মদ্ যাজিনোঽপি মাম্'—আমাকে ভজনা করে যে, আমাকেই সে পায়।

> যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
> ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্॥
>
> —গীতা, ৯।২৫

কালীপ্রসাদের জন্মের অল্পদিন পূর্ব্বে, ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার স্যানিটরি কমিশনের সভাপতি জন্ ষ্ট্রেকি (সার্) কলিকাতার তাৎকালীক স্বাস্থ্য সম্বন্ধে যে বিবৃতি দিয়াছিলেন তাহার একস্থানে ছিল—"ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী কলিকাতা পৃথিবীর মধ্যে একটি অতিশয় বৃহৎ ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন নগরী, কিন্তু যে-কোন সুসভ্য গবর্ণমেণ্টের পক্ষে উহা একটি ভীষণ

কলঙ্ক এবং লজ্জার কারণ।......নগরের অবস্থা এইরূপ যে উহা যে-কোন সভ্য ব্যক্তির পক্ষে বাসের অযোগ্য।"

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী লিখিয়াছেন—"তখন কলিকাতায় আসিলে অধিকাংশ বালকই এক বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ একবার গুরুতর পীড়া দ্বারা আক্রান্ত হইত। এই পীড়া সচরাচর অজীর্ণতা দোষরূপ দ্বার দিয়া প্রবেশ করিত; পরে বিকার দিয়া উপসংহার করিত।......দেওয়ান কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায় সে সময়কার কলিকাতার অবস্থা যাহা বর্ণনা করিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিতেছি—"তখন জলের কল ছিল না; প্রত্যেক ভবনে এক একটি কূপ ও প্রত্যেক পল্লীতে দুই চারিটি পুষ্করিণী ছিল......এই পুষ্করিণীগুলি জ্বরের উৎস স্বরূপ ছিল।...... এখনকার ফুটপাথের পরিবর্ত্তে প্রত্যেক রাজপথের পার্শ্বে এক একটি সুবিস্তীর্ণ নর্দ্দমা ছিল। কোন-কোনও নর্দ্দমার পরিসর আট দশ হাতের অধিক ছিল।......এই সকল নর্দ্দমা হইতে যে দুর্গন্ধ উঠিত তাহাকে বর্দ্ধিত ও ঘনীভূত করিবার জন্যই যেন প্রতি গৃহেই পথের পার্শ্বে এক একটি শৌচাগার ছিল। তাহাদের অনেকের মুখ দিন রাত্রি অনাবৃত থাকিত। নাসারন্ধ্র উত্তমরূপে বস্ত্র দ্বারা আবৃত না করিয়া সেই সকল পথ দিয়া চলিতে পারা যাইত না।"(৩)

স্বামী বিবেকানন্দ কালীপ্রসাদ অপেক্ষা প্রায় চারি বৎসরের

(৩) রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ—পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, পৃষ্ঠা ৫০।

বড় ছিলেন। ঠিক সেই সময়ে কলিকাতার অবস্থা যাহা ছিল স্বামীজির ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় তাহার একটি বর্ণনা দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

"কলিকাতার শহর এখনকার হিসাবে দুই আনা বা দেড় আনা শহর ছিল। এখনকার Oxford Mission কলু-বাড়ী ছিল, তারপর হাড়ি পাড়া; মহেন্দ্র গোঁসাই গলিটা ডোম পাড়া ছিল। মধুরায় গলিটা গয়লাপাড়া ছিল এবং দক্ষিণ দিকে প্রকাণ্ড একটা মাঠ ছিল—তাহাতে মরা গরু-বাছুর ফেলিয়া দিত। সে একটা গো-ভাগাড় ছিল—দিনে শকুনীর উৎপাত, রাত্রে শিয়ালের উৎপাত। হাতীবাগান 'অরণ্য বীজ-বন' ছিল, লোক জনের বাস ছিল না। প্রকাণ্ড মাঠ, মাঝে মাঝে ডোবা ও কাঁটানটের ঝাড়। কয়েকজন হাড়ি বাস করিত। রাস্তা অন্ধকার, একলা যাইলে জিনিস-পত্র কাড়িয়া লইত।

"কলিকাতা শহরে ঘোড়ার গাড়ীর প্রথা খুব কম ছিল। দু' চার ঘর বড় মানুষের বাটীতে ঘোড়ার গাড়ীর চলন ছিল। সাধারণ ঘরে পাল্কী থাকিত। তখন মেয়ে-সোয়ারি ঘোড়ার গাড়ী চড়িত না।

"তখনকার দিনে কলের জল সবে হইয়াছে। (১৮৭০ খৃষ্টাব্দ) এবং সব বাটীতে নল বসে নাই।...পাইপ করিয়া রাস্তা হইতে কলের জল আসিত। কিন্তু জলেতে গেড়ী ভরিয়া যাইত, এইজন্য মাঝে মাঝে পাইপ বন্ধ হইত। মাঝে

মাঝে রাস্তার চাপে পাইপ তুব্ড়াইয়া যাইত। সকল বাড়ীতে কলের জলের প্রচলন হয় নাই।

"তখন কেরোসিন তেল উঠে নাই, এজন্য কেরোসিন তেলের আলো কিছু ছিল না। সাধারণতঃ ব্যবহার করিবার জন্য তেলের গ্লাস (রেড়ীর তেলের) একটি সেজের ভিতর বৈঠকখানায় দেওয়া হইত। রাস্তায় তখন দূরে দূরে একটা করিয়া থামেতে রেড়ীর তেলের আলো জ্বলিত। পেট-মোটা ডাণ্ডাওয়ালা একরকম টিনের তেলপাত্র ছিল। তাহাতে রেড়ীর তেল দিয়া রাত্রিতে আলো দিত। আলো অনেক দূরে দূরে হইত। গলির ভিতর সর্ব্বত্র আলোর বিশেষ বন্দোবস্ত ছিল না। কোন কোন গলিতে একটা করিয়া আলো থাকিত।" (৪)

কলিকাতা শহরের অবস্থা এইরূপ অস্বাস্থ্যকর থাকায় কালীপ্রসাদ কঠিন রক্তামাশয় রোগে আক্রান্ত হইলেন। তখন তাঁহার বয়স অনুমান দেড় বৎসর হইবে। ব্যাধির আক্রমণ এতই ভীষণ হইল যে, সকলেই তাঁহার জীবনের আশা ত্যাগ করিলেন। নানারূপ চিকিৎসা করাইয়াও কোন ফল হইল না—শরীর ক্রমে শুকাইয়া উঠিল এবং চর্ম্মাবৃত কয়েকখানি মাত্র অস্থি সার হইল। যাহা হউক, অবশেষে কবিরাজি ঔষধ

(৪) কলিকাতার পুরাতন কথা—মহেন্দ্রনাথ দত্ত (প্রবর্ত্তক, মাঘ ও ফাল্গুন, ১৩৩৭)।

এবং গুগ্‌লির ঝোলের সহিত পুরাতন দাদখানি চাউলের মণ্ড কিছুদিন ব্যবহার করিবার পর কালীপ্রসাদ রক্ষা পাইলেন। পরবর্ত্তীসময়ে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের গলরোগের কালে কালীপ্রসাদকেই তাঁহার জন্য গুগ্‌লি সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল। জীবনের প্রারম্ভে তাঁহাকেও সেই গুগ্‌লির ঝোলই খাইতে হইত।

ইহার অল্প কিছুদিন পূর্ব্বে (১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ২রা নভেম্বর) সন্ধ্যার সময় প্রমত্ত ভৈরবের মত হা হা করিতে করিতে দুর্জ্জয় সাইক্লোন কলিকাতার উপর দিয়া ছুটিয়া গেল। পোর্ট-ক্যানিংকে ভাসাইয়া দিয়া পাঁচ ফিট্ উচ্চ একটি প্রবল জলোচ্ছ্বাস ভীষণ বেগে ধাবমান হইল। সঙ্গে সঙ্গে বহু গৃহ নিমেষে ধ্বংস হইয়া গেল। বারুইপুর, ডায়মণ্ড হার্বার, আঠারো বঙ্কা, বসিরহাট, গোবরডাঙ্গা, সাতক্ষীরা প্রভৃতি স্থান সেই খণ্ড-প্রলয়ে শ্মশান হইল—যশোহর, নদীয়া, ঢাকা কোন স্থানই বাদ গেল না। নোনা জল প্রবেশ করিয়া বহু স্থানে পানীয় জলের অভাব ঘটিল। ধ্বংসলীলা শেষ করিয়া সাইক্লোন ও প্লাবন নির্জ্জিতবীর্য্য হইয়া দিগন্তে মিলাইয়া গেল বটে, কিন্তু বাঙ্গালার সেই শ্মশানে রোদনের রোল থামিতে অনেক দিন লাগিয়াছিল! ক্ষুদ্র শিশুটিকে বক্ষে লুকাইয়া রাখিয়া মাতা নয়নতারা সেই ভীষণ রজনীতে দণ্ডে দণ্ডে যমরাজকে প্রত্যক্ষ করিতে করিতে কি ভাবে যে ক্ষণ গণনা

করিয়াছিলেন তাহা লিখিয়া প্রকাশ করা সম্ভব নহে। সরকারী বর্ণনায় প্রকাশ যে, সেই দুর্দ্দান্ত সাইক্লোন কলিকাতার বহু ধনসম্পত্তি ধ্বংস করিয়া বহু নর-নারীকে গ্রাস করিয়াছিল! (৫)

একালে নানা অবস্থার চাপে পড়িয়া আমরা হাসিতে ভুলিয়া গিয়াছি—সেই প্রাণখোলা সরল শুভ্র সুন্দর হাস্য! কিন্তু সেকালে এমন ছিল না। তখন হাসিবার জন্য মজ্‌লিস্‌ বসান হইত—সকলে মিলিয়া আনন্দ ভোগ্‌ করিবার জন্যই সেকালে আঢ্য ব্যক্তির গৃহে অথবা এ-পাড়ায় ও-পাড়ায় যাত্রা, পাঁচালি, রামায়ণ-মহাভারতের গান, কৃষ্ণকীর্ত্তন, কালীকীর্ত্তন—কবির লড়াই, হাফ্‌-আখড়াই প্রভৃতি একটা-না-একটা আয়োজন লাগিয়াই থাকিত। বসিবার সতরঞ্চ পাতা হইতে আরম্ভ করিয়া উৎসব-শেষে সেই সতরঞ্চ তোলা পর্য্যন্ত বহু নর-নারী এক মন প্রাণে গান শুনিত—গায়কের বা লব-কুশদের সঙ্গে সঙ্গে কখনও তাহারা হাসিত, কখনও কাঁদিত, কখনও বা রোষে চঞ্চল হইত। এখন আমরা কুণো হইয়াছি, যাত্রা-পাঁচালি, কথকতা, কীর্ত্তন উঠিয়া গিয়াছে বলিলেই চলে—মজ্‌লিসি উৎসব আর হয় না। ব্যক্তিগত 'হাসি-কান্নার' স্থান হইয়াছে অন্ধকার সিনেমা-গৃহের একান্ত নিরালায়!

---

(৫) Bengal under the Lieut. Governors.—Buckland, Vol. I, Pages 406—408.

৫

সেকালে এমন ছিল না বলিয়া রামায়ণের গান, মহাভারতের কথা দিনের পর দিন শুনিবার সুযোগ নয়নতারা দেবীর সর্ব্বদাই ঘটিত। কালীপ্রসাদও মাতার সঙ্গে সঙ্গে যাইয়া সেই সব শুনিতেন। গান শুনিতে শুনিতে—কখনও বা অভিনয়াদি দেখিতে দেখিতে তাঁহার অপূর্ব্ব ধারণা-শক্তিবিশিষ্ট অন্তরে ভারতের গৌরবময় মহিমার চিত্র একের পর এক ফুটিয়া উঠিত; রাম লক্ষ্মণ, ভীমার্জ্জুন, সীতা-সাবিত্রী, শৈব্যা-হরিশ্চন্দ্র, প্রভৃতির মনোমুগ্ধকর কাহিনী এবং অযোধ্যা ইন্দ্রপ্রস্থ প্রভৃতির শোভা সম্পদ সভ্যতা ও শৌর্য্যবীর্য্যের চিত্র বালকের হৃদয়ে এমনি সুদৃঢ় অঙ্কই পাত করিয়াছিল যে, কোন দিনও তাহা বিগতশ্রী হয় নাই। পরে পরিণত বয়সের নানা তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে, হৃতসর্ব্বস্ব ভূলুণ্ঠিত ভারতের অন্তর্যাতনা তাঁহার কর্ম্মত্যাগী সন্ন্যাসী-মনকেও বেদনা-কাতর করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি যোগী ছিলেন, সন্ন্যাসী ছিলেন—সমগ্র বিশ্বই ছিল তাঁহার "ঠাঁই"; আত্মার সহিত তাঁহার সম্বন্ধ, চেতন আত্মার প্রতি তাঁহার কর্ত্তব্য—সেই আত্মাকে সহায় করিয়া মানব-মঙ্গলের জন্য তাঁহার আকুতি—কোনও-কিছুই কিন্তু দণ্ডেকের জন্যও তাঁহাকে ভুলাইতে পারে নাই যে, তিনি ভারতবাসী—তিনি বাঙ্গালী। তাই তাঁহার বেদনা-কাতর হৃদয়ের অশ্রুসিক্ত কথা "ভারত ও ভারতবাসী" (India and Her People) নামক গ্রন্থে শোণিতের রেখায়

অঙ্কিত হইয়া আছে ! সেকালের রাজানুশাসন সেই বেদনাতুর কণ্ঠকে রোধ করিতে চাহিয়াও রুদ্ধ করিতে পারে নাই !

বাল্যেই কালীপ্রসাদের ভাবগ্রহণক্ষম কোমল চিত্তে ভগবৎ প্রেমের শুভ্র কুসুম-স্তবক প্রভাত-কমলের মত ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত হইতে থাকে। মাসের পর মাস মাতার সহিত কালী দর্শনে যাইয়া কালীপ্রসাদ দেখিতেন শ্রীমন্দির প্রাঙ্গণে লুণ্ঠিতা তাঁহার জননীর এবং বহু নরনারীর নয়নে বদনে যেন একটা নূতন রাগ লাগিয়াছে। সেই প্রাণস্পর্শী উপাসনা, সেই অশ্রুসিক্ত নয়নে কাতর প্রার্থনা কালীপ্রসাদকেও আকুল করিয়া তুলিত বটে, কিন্তু তাহার কারণ অনুসন্ধান করিবার শক্তি তখন তাঁহার ছিল না—সেই ব্যাকুলতাকে প্রকাশ করিবার ভাষাও তখন তাঁহার ছিল না। কিন্তু লোকের এইরূপ ভাব দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার হৃদয়মধ্যেও কি-যেন কি-একটা উদ্বেল তরঙ্গ যে খেলিয়া গেল, তাহা তিনি বুঝিতেন। আবার মাতার -সঙ্গে সঙ্গে বসিয়া সন্ধ্যার পর সন্ধ্যা তিনি যখন কৃষ্ণযাত্রাদি শুনিতেন তখন সকল কথা বুঝিবার যোগ্যতা তাঁহার না থাকিলেও কৃষ্ণপ্রেমবিধুরা শ্রীরাধিকার নয়নাশ্রু তাঁহার চক্ষেও জল আনিত—গোপীজন-বল্লভের জন্য গোপীদিগের প্রেমনিবেদন তাঁহার নিকটে অপূর্ব্ব ও মহৎ বলিয়াই মনে হইত ; মনে হইত গৃহে আত্মীয়দিগের মধ্যে অথবা বাহিরে ক্রীড়াসঙ্গীদিগের ভিতরে তো তেমন

বস্তুটি নাই ! উহা যেন মানবীয় নহে। উহা যেন সাংসারিক নহে—মানবমণ্ডলী ও সংসারের বাহিরে কোন্ এক স্বর্গীয় বৃন্দাবিপিনেই যেন উহার স্থান—দেব-দেবীর হৃদয়েই যেন উহার পূজাবেদী বিরচিত—উহা অসাধারণ ; উহা যেমন অনির্ব্বচনীয় কি-যেন-একটা-কি—উহা তেমনি সুন্দর, তেমনি উহা অতি সুন্দর।

ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ, শ্রীপ্রভুর অন্তরে ভগবৎ প্রেমের বিচিত্রবর্ণানুরঞ্জিত ইন্দ্রধনুর ন্যায় মনোহর ভাব-তরঙ্গের স্ফুরণ ও তাহার অচিন্তিতপূর্ব্ব প্রকাশ দেখিয়া বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কালীপ্রসাদও শেষে প্রেমিক হইয়াছিলেন। মাতার সহিত কৃষ্ণযাত্রা শুনিবার কালে যে ক্ষুদ্র বীজটি তাঁহার হৃদয়ে উপ্ত হইয়াছিল, উপযুক্ত জলধারা, আহার ও অপর্য্যাপ্ত আলোক পাইয়া তাহাই শেষে একটি মহান্ প্রেমকল্পতরু রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। সেই কল্প-বৃক্ষের একাধিক সুমিষ্ট ফলের মধ্যে অন্যতম একটি হইতেছে মহারাজের অপূর্ব্ব ভাষণ "ভালবাসা ও ভগবৎপ্রেম" (Human Affection and .Divine Love)। একজন আমেরিকাবাসী এই ভাষণটি পাঠ করিয়া সানন্দে বলিয়াছিলেন যে, উহা যেন ভগবৎপ্রেমের সৌরভে পরিসিঞ্চিত ভায়োলেট্ পুষ্পের একটি তোড়া !

সেই পূর্ণাঙ্গ পুষ্প-স্তবকটি তুলিয়া দেখাইবার ইচ্ছা

থাকিলেও স্থানাভাবে তাহা পাৱা যাইতেছে না। ঐ ভাষণের প্রারম্ভে তৈত্তিরীয় উপনিষদের একটি মন্ত্রাংশ উদ্ধৃত করিয়া মহারাজ বলিয়াছেন—ঈশ্বর প্রেম স্বরূপ। যিনি ভগবৎ প্রেমের মাধুর্য্যের আস্বাদ অনুভব করিয়াছেন, তিনিই এই জীবনে চিরস্থায়ী সুখ লাভ করেন। প্রেম কাহাকে কহে সেই প্রসঙ্গে মহারাজ বলিয়াছেন—

"মানবহৃদয়ে এক অনির্ব্বচনীয় স্বর্গীয় বস্তুর বীজ নিহিত আছে—যাহা মানবহৃদয়ে স্নেহ বা ভালবাসা রূপে অভিব্যক্ত হইয়া জীবনে সুখ শান্তি প্রভৃতি আনয়ন করে। এদেশে মনীষীরা এই অদ্ভুত তত্ত্বকে 'প্রেম' আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন। প্রেম-শক্তিই আমাদের জীবন নিয়ন্ত্রিত করে। যে মুহূর্ত্তে আমরা আপন অস্তিত্ব উপলব্ধি করি সেই মুহূর্ত্ত হইতেই আমরা জ্ঞাত কিংবা অজ্ঞাতসারে আপনাকে ভাল-বাসিতে আরম্ভ করি। (মাতৃ) প্রেমই মনুষ্য হৃদয়ে স্নেহ, ভালবাসা প্রভৃতিরূপে বিকসিত হইয়া অধিকতর শক্তি ও বিস্তৃতি লাভ করে।"

একটু চিন্তা করিলেই আমরা বুঝিতে পারি যে, মাতৃপ্রেমই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। পিতার করে শাসন দণ্ড আছে, ভ্রাতার হৃদয়েও উপেক্ষা এবং কখনও হিংসা প্রকাশ পায়, বন্ধুও ঘৃণা করিতে পারে, পত্নীও মনকে বিদ্ধ করিতে সমর্থ—কিন্তু সকল অবস্থায় সকল দুর্দ্দশায়, সকল অপরাধের পরও আমরা মাতার নিকটে

পাই কেবলই স্নেহ। যতই পঙ্ককালিমায় দেহ-মনকে কলঙ্কিত করি না কেন, মাতাই স্বকরে সেই মলিনতা ধুইয়া দিয়া ক্রোড়ে তুলিয়া লন, প্রার্থনা না করিতেই ক্ষমা করেন; না চাহিতেই এমন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিবার সামর্থ্য আর কাহারও নাই—দোষ-ত্রুটি দেখিতে এমন অনিচ্ছুক-নয়ন মাতার ভিন্ন আর কাহারও নাই। কিসে সন্তান সবল হইবে, পরিপুষ্ট হইবে, অ-মলিন হইবে—এক মাতার ভিন্ন আর কাহার আকাঙ্ক্ষা তদ্বিষয়ে এত বেশী তীব্র? তাই ভগবানই আমাদিগের মা, পরমাত্মাই আমাদিগের মা। আমাদিগকে সর্ব্ব-বিষয়ে ফুটাইয়া তুলিতে পরমাত্মার যে অবিচ্ছিন্ন আকুতি তাহা মায়ের আকুতিরই তুল্য। মহারাজ তাই বলিয়াছেন যে, "মাতৃ-প্রেমই মনুষ্য হৃদয়ে স্নেহ ভালবাসা প্রভৃতি-রূপে বিকসিত হইয়া অধিকতর শক্তি ও বিস্তৃতি লাভ করে।"

সেই স্বর্গীয় প্রেম দেহাত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট মানবের হৃদয়ে ভোগাসক্তিরূপে যখন আত্মপ্রকাশ করে তখনই তাহাকে কাম বলা হয়। কাম ভগবানের পূজায় লাগে না—উহা আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা, উহা জড়দেহের ভোগের উপকরণ মাত্র। প্রেমের ধর্ম্ম আকর্ষণ। যখন দেহের প্রতি দেহের আকর্ষণ ঘটে তখনই উহা ভোগ, তখনই উহা কাম এবং যখন আত্মা আত্মাকে আকর্ষণ করে তখনই উহা প্রেম।

মহারাজ বলিতেছেন—

"যেখানে প্রকৃত ভালবাসা আছে, সেখানেই আত্মার বিশুদ্ধ আকর্ষণ বর্ত্তমান। কিন্তু মনুষ্য-সমাজে সচরাচর যে ভালবাসা, স্নেহ বা প্রীতি দৃষ্ট হয় তাহা দেহাত্মবোধ বা স্বার্থপরতা-প্রণোদিত ও অন্ধ, তাহা ভোগাসক্তি বা ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির আকাঙ্ক্ষারই নামান্তর। ইহা বিপথগামী প্রেম। ইহা মানুষের মধ্যে একটা পাশবিক বৃত্তি বিশেষ। সমাজের যাবতীয় মহৎকার্য্য, সুপথে পরিচালিত নিঃস্বার্থ প্রেমের মধুর ফল।"

মনুষ্যের ভালবাসা স্বভাবতঃ প্রতিদান চায়। কিন্তু আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে ভালবাসিয়াই সে ধন্য, ভালবাসিয়াই সে চির পরিতৃপ্ত হয়। ইহাকেই 'ভগবৎপ্রেম' বলে। 'কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছা তারে বলি প্রেম।' নারদ ঋষি এইরূপ প্রেমের উদাহরণে বলিয়াছেন—ওঁ যথা ব্রজগোপিকানাং।

"'আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছা' সম্পূর্ণ পরিহার করিয়া ভালবাসাকে প্রেমাস্পদের প্রতি, প্রেমাস্পদের আত্মার প্রতি অথবা ঐশ্বরিক কোন উচ্চ আদর্শের দিকে অবিচ্ছিন্ন ভাবে পরিচালিত করিতে হইবে। এই নশ্বর জগতের যাবতীয় পদার্থই স্বল্পকাল স্থায়ী, যাবতীয় জীবই মরণশীল। সুতরাং মানুষ যতদিন কোনও অবিনাশী, নিত্য, সনাতন বস্তু বা ব্যক্তির সন্ধান করিয়া তাহাকে ভালবাসিতে না পারে, ততদিন

তাহার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা বা ভালবাসার পূর্ণ পরিতৃপ্তি হয় না। দেহবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া প্রেমের সার্থকতা অনুসন্ধান করা আত্মপ্রতারণা মাত্র। বেদান্ত তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছে যে, প্রত্যেক জীবহৃদয়েই পরমেশ্বর বিরাজমান এবং সখ্য, বাৎসল্য প্রভৃতি যে-কোনও ভাবের মধ্য দিয়া মানুষ তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে সক্ষম। ভক্ত বলেন—

ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব
ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব
ত্বমেব সর্ব্বং মম দেব দেব॥

"মানুষের ভালবাসা যখন নিঃস্বার্থভাবে ভগবতাদর্শ অভিমুখে ধাবিত হয় তখনই উহা ভগবৎপ্রেম বা পরাভক্তি নামে অভিহিত হয়। ' ভগবৎপ্রেম সমস্ত শোক, দুঃখ ও যন্ত্রণার সম্পূর্ণ নিবৃত্তিসাধন করে। ত্যাগের ভাবে অনুপ্রাণিত না হওয়া পর্য্যন্ত মানবের চিত্তে যথার্থ ভগবৎ প্রেমাকাঙ্ক্ষা স্ফুরিত হয় না। ভগবৎপ্রেম সম্পূর্ণ নিষ্কাম ও স্বার্থশূন্য। যে ভালবাসার বিনিময়ে কিছু প্রাপ্তির প্রত্যাশা আছে তাহা দোকানদারের ভালবাসার মত ব্যবসায়ের একটি নীতিবিশেষ। দাসত্বের মধ্যে, কোন বন্ধনের মধ্যে নিঃস্বার্থ প্রেম থাকিতে পারে না—কেবল মাত্র স্বাধীনভাবে ইহার স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে। ভগবৎপ্রেমে ভয়ের স্থান নাই। যেখানে শাস্তির

ভয় সেখানে কি ভালবাসা থাকিতে পারে? যথার্থ ভগবৎ প্রেমিক বিশ্বের সকল বস্তুকে ভালবাসেন। তিনি জগতে ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখ, রোগ-মৃত্যু প্রভৃতি দেখিতে পান না। তিনি প্রত্যক্ষভাবে দেখিতে পান যে, ভগবান্ স্বয়ং সমস্ত চেতন ও অচেতন পদার্থের মধ্যে বিরাজমান রহিয়াছেন এবং তাহাদের মধ্য দিয়া আপনার শক্তি প্রকাশ করিতেছেন। তাই তিনি সকল বস্তু ও সকল জীবকে সমভাবে না ভালবাসিয়া থাকিতে পারেন না।

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥

—(গীতা—৬।২৯)

"ভগবৎপ্রেমের ফল ভগবৎপ্রেম ভিন্ন আর কিছু নহে। প্রকৃত ভগবৎপ্রেমিক মুক্তি, নির্ব্বাণ বা স্বর্গসুখাদির বাঞ্ছা করেন না কিম্বা পুনরায় ইহলোকে দেহ ধারণ করিতেও ভীত হন না। তিনি সতত প্রার্থনা করেন:

নাথ যোনি সহস্রেষু যত্র যত্র ব্রজাম্যহম্।
তত্র তত্রাচলা ভক্তিরচ্যুতাস্তু সদা ত্বয়ি॥

হে নাথ, হে অচ্যুত, আমি সহস্র সহস্রবার এই সংসারে জন্মগ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত নহি। কিন্তু আমি যে-যে যোনিতেই পরিভ্রমণ করি না কেন, সকল অবস্থাতেই যেন আপনার প্রতি আমার অচলা ভক্তি থাকে।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যুগসন্ধিতে কালীপ্রসাদ

মিসনরিদিগের বিদ্যালয় বাঙ্গালাদেশে স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে এ দেশে শিক্ষাবিধান করিত গুরুমহাশয়দিগের পাঠশালা এবং অধ্যাপকদিগের টোল ও চতুষ্পাঠী। ধনাঢ্য-দিগের গৃহে বালক-বালিকাদিগের জন্য যে গৃহশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না, তাহা নহে। সাধারণতঃ আগেকার শিক্ষা পাঠশালাতে আরম্ভ হইয়া পাঠশালাতেই শেষ হইত। ১৮৩৫-৩৬ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া খৃষ্টান্ মিসনরি উইলিম্ এডাম্ বাঙ্গালা দেশের প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধানপূর্ব্বক যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা হইতে জানা যায় যে, সে সময়ে অন্ততঃ এক লক্ষ পাঠশালা বর্ত্তমান ছিল। তখন পর্য্যন্ত ছাত্রদিগের পাঠের জন্য কোনও মুদ্রিত পাঠ্যপুস্তক না থাকায় মার্সম্যান্, কেরি প্রভৃতি মিসনরিদিগের চেষ্টায় পরে কয়েকখানি পাঠ্য পুস্তক মুদ্রিত হয়, কিন্তু সাধারণ ভাবে দেশের লোক যে-কোনও মুদ্রিত পুস্তককে ভীতির চক্ষে দেখিত। তাহারা মনে করিত ছাপা-পুস্তক পড়াইয়া হিন্দু বালকদিগকে খৃষ্টান্ করা হইবে।

এডাম্ সাহেবের মন্তব্যে সেকালের পাঠশালা সম্বন্ধে নানা কৌতুহলোদ্দীপক তথ্য জানা যায়। ইহাও জানা যায় যে, তখনকার অনেক পাঠশালায় নিম্নশ্রেণীর চণ্ডাল, কুমার, নাপিত, বাগ্দী, তাঁতি, ধোপা, কলু, শুঁড়ি প্রভৃতি জাতির লোকও গুরুমহাশয় ছিলেন। তাঁহাদিগের নিকট বিদ্যালাভ করিতে উচ্চ শ্রেণীর বালকদিগের আপত্তি ছিল না। গুরু-মহাশয়গণ বালকদিগকে নানারূপ ভীষণ দণ্ড দিতেন। এডাম্ সাহেব চতুর্দ্দশ প্রকার দণ্ডের উল্লেখ করিয়াছেন।

স্বামী বিবেকানন্দের পিতা পুত্রের ও পল্লীবালকের বিদ্যা লাভের জন্য নিজগৃহে একটি পাঠশালা স্থাপন করিয়াছিলেন। সে পাঠশালা ছিল অন্যান্য পাঠশালাগুলির একটি অপেক্ষাকৃত সমুন্নত সংস্করণ। লাহাপাড়ার গোবিন্দ শীলের পাঠশালাও ছিল অনেকাংশে এইরূপ। পঞ্চম বর্ষ বয়সে 'হাতে খড়ি' দিয়া বালক কালীপ্রসাদ গোবিন্দ শীলের পাঠশালায় পড়িতে যাইতেন। স্বামী বিবেকানন্দের ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় এই কালের পাঠশালার একটি মনোজ্ঞ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। কালীপ্রসাদের বিদ্যারম্ভের কালে পাঠশালার অবস্থা কিরূপ ছিল এই বর্ণনা হইতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। দত্তজা মহাশয় এক স্থানে লিখিয়াছেন—

"তখনকার দিনে গুরুমশাইয়ের ছাত্রদিগকে তাঁহার জন্য তামাক আনিতে হইত এবং রবিবারে গুরুমশাইয়ের জন্য

একটি করিয়া সিধা আনিতে হইত ও সঙ্গে একটা করিয়া পয়সা দিতে হইত। গুরুমশাই বালকদিগকে লোকের বাগান হইতে চুরি করিতে উপদেশ দিতেন এবং তাহার অন্যথা হইলে বিশেষভাবে বেত্রাঘাত হইত। 'হাত ছড়ি' হইতে আরম্ভ করিয়া একপায়ে দাঁড়ানো, 'নাড়ুগোপাল' প্রভৃতি অনেক প্রকার দণ্ডের প্রথা ছিল।......সজোরে বেত না মারিলে গুরুমহাশয়ের হৃদয়স্থিত বিদ্যাশক্তি ছাত্রদের ভিতর প্রকাশ পায় না; এই জন্যই গুরুমশাই নির্দ্দয়ভাবে ছাত্রদিগকে প্রহার করিতেন এবং যত প্রকার কটুকাটব্য ভাষা আছে, গুরুমশাই তাহা সর্ব্বদা ব্যবহার করিতেন এবং পড়ুয়ারাও তাহাতে নিপুণ হইত।

"পাঠশালা দুইবার বসিত—সকালে ও বিকালে। সকালে পাঠ সাঙ্গ হইলে সব ছাত্রেরা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া নামতা, কড়াকিয়া, শতকিয়া আবৃত্তি করিত।......বিকালে পড়া সমাপ্ত হইলে ছাত্রেরা এক সঙ্গে সরস্বতীর বন্দনা করিত। তখনকার দিনে শ্লেট বা কাগজের প্রচলন ছিল না। লম্বা তালপাতায় খাকের কলম দিয়া বাংলা কালীতে লিখিতে হইত।

"তখনকার দিনে জামা জুতার প্রচলন ছিল না। গ্রীষ্ম কালে শুধু গায়ে খালি পায়ে পাঠশালায় যাওয়া হইত; শীতকালে সঙ্গতিমানের ছেলেরা লক্ষ্ণৌ ছিটের দোলাই গায়ে

জড়াইত এবং পিছনে খুটগুলিতে একটা গিঁট বাঁধিয়া দিত। তাহাতে লেখার অসুবিধা হইত না। গুরুমশাই মাঝে মাঝে নূতন পাঠ বা 'দাগা' দিতেন। সেদিন একটু কাগজ সংগ্রহ করিতে হইত এবং গুরুমশাই তাহাতে কড়া বা সটকে লিখিয়া দিতেন এবং পড়ুয়া তাহা দেখিয়া লিখিত—ইহাকে বলে দাগা। সে দিন গুরুমশাই প্রণামী হিসাবে কিছু পাইতেন। পাঠশালার চরম বিদ্যা হইল—দাতাকর্ণ এবং গঙ্গার বন্দনা মুখস্থ বলা এবং 'সেবক শ্রী' লেখা অর্থাৎ 'প্রণাম পুরঃসর' ইত্যাদি নানা রকমের পাঠ কিরূপে লিখিতে হয় এবং তমসুক্ অর্থাৎ ঋণ-কর্জ্জের লেখাপড়া কি রকম হয়......পাঠশালার বিদ্যা এই পর্য্যন্ত হইত।" (১)

লাহা পাড়ার পাঠশালায় দুই বৎসর অধ্যয়নের পর দাতাকর্ণ ও গঙ্গার স্তব মুখস্থ করিয়া কালীপ্রসাদ যদু পণ্ডিত মহাশয়ের একদা সুবিখ্যাত বঙ্গবিদ্যালয়ে প্রবেশ করিলেন। কি পাঠশালায়, কি বঙ্গবিদ্যালয়ে একজন কৃতী ছাত্ররূপে তাঁহার সুখ্যাতি ছিল। প্রতিবারই নানা পুরস্কার লাভ করিয়া তিনি তাঁহার বিদ্যা-বুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিতেন।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তিনি যখন কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধ নবম বর্ষের বালক তখন মহারাণী ভিক্টোরিয়ার

---

(১) কলিকাতার পুরাতন কথা—মহেন্দ্র নাথ দত্ত। (প্রবর্ত্তক, মাঘ ১৩৩৭, ৯০২—৯০৪ পৃষ্ঠা)।

জ্যেষ্ঠপুত্র প্রিন্স-অব্ ওয়েল্‌স্ ভারতভ্রমণে বহির্গত হইয়া কলিকাতায় আসিলে পর কলিকাতার নাগরিকগণ তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য বিপুল আয়োজন করিয়াছিল। কবি হেমচন্দ্র তাঁহার "বিবিধ কবিতা" এবং "কবিতাবলীতে" যুবরাজের ভারত ও কলিকাতা ভ্রমণকে অমর করিয়া রাখিয়াছেন। কলিকাতার উৎসব-সজ্জা সম্বন্ধে কবি বলিয়াছেন—

অপূর্ব্ব সুন্দর মোহন সাজ
সাধে কলিকাতা পরিল আজ ;
দ্বারে দ্বারে দ্বারে গবাক্ষ-গায়
রঞ্জিত বসন চারু শোভায় ;
দ্বারে দ্বারে দ্বারে গবাক্ষ কোলে
তরুণ পল্লব পবনে দোলে ;
ধ্বজা উড়ে চূড়ে বিচিত্র কায়
ঝক্ ঝক্ ঝকে কলস তায় ;
কোটি তারা যেন একত্র উঠে
সৌধ চূড়ে চূড়ে রয়েছে ফুটে ;
গৃহ পথ মাঠ কিরণময়—
নিশিতে যেন বা ভানু উদয় !
উঠিছে আতশবাজী আকাশে—
নব তারা যেন গগনে ভাসে।

ধন্য কলিকাতা কলি-রাজধানী।
সুরপুরী আজি পরাজিলে মানি—
ছাদে দেখ নিশি লাজে পালায়। (২)

ফুঁকো কাঁচের শিশিতে লক্ষ লক্ষ দীপ জ্বালিয়া কলিকাতায় বাঙ্গালীদের গৃহসজ্জা সেদিন ফুটিয়া উঠিয়াছিল এবং নানা রাজপথে অগ্নি-সর্পমালিকার নয়নমনোহর শোভা ও রাজপথে ধ্বজপতাকামণ্ডিত পত্র-পুষ্পে সুশোভিত তোরণরাজি এবং ময়দানে খ-ধূপগুলির বিচিত্র খেলা সেদিন লোকের মন হরণ করিয়াছিল। আবার—

দেখ দেখ দেখ চতুরঙ্গদলে
বাজীপৃষ্ঠে সাজি রাণী-পুত্র চলে;
পাছে পাছে কাছে ঘোটকপর
চলে রাজগণ, জ্বলে জহর—
শিরঃ শোভা করি, উজলি তাজ,
তবকে তবকে পথির মাঝ,
নগর দর্শনে করে গমন
ঝমক্ ঝমক্ বাজে বাদন;
বৃটিশের ভেরী শমন-দমন,
"রূল্ ব্রিট্যানিয়া, রূল্ দি ওয়েভস্",
সঙ্গীত তরঙ্গে নিনাদ ধায়।

(২) ভারত ভিক্ষা—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কবিতাবলী।

বালক কালীপ্রসাদ তাঁহার মাতার সহিত এই সব দেখিয়া পরম প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার বালকমনে এই উৎসবের দৃশ্য এরূপ গভীর ভাবে অঙ্কিত হইয়াছিল যে, পরবর্ত্তী জীবনেও তিনি কখন-কখনও প্রফুল্লবদনে সেই উৎসবের গল্প করিতেন।

যুবরাজ ভারতে আসিলেন, কয়েক দিন ভারতবাসীর পূজা লইলেন এবং উৎসব-রজনীর শেষে স্বপ্নের মত স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ইহার অল্প কাল পরই কালীপ্রসাদ যদু পণ্ডিত মহাশয়ের 'বঙ্গ-বিদ্যালয়' ছাড়িয়া তৎকালপ্রসিদ্ধ ইংরাজি বিদ্যালয় 'ওরিএণ্টাল্ সেমিনরিতে' আসিলেন। মিসনরিগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত উচ্চ ইংরাজি-বিদ্যালয়ে তখন রক্ষণশীল হিন্দুভদ্রগণ আপন আপন সন্তানদিগকে পাঠাইতে ইতস্ততঃ করিতেন। তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল যে, সেই সকল বিদ্যালয় হিন্দু বালকদিগকে খৃষ্টান করিবার কারখানা মাত্র! অথচ সন্তান-সন্ততিদিগকে পাশ্চাত্য বিদ্যায় কৃতী করিয়া তুলিতেই হইবে, এ বিষয়ে তাঁহারা ছিলেন কৃতসঙ্কল্প।

'ওরিএণ্টাল্ সেমিনরি' আনুমানিক ১৮২৯—৩০ খৃষ্টাব্দে গৌরমোহন আঢ্য কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়। গৌরমোহন যেভাবে বিদ্যালয়টি পরিচালন করিতেন তাহাতে অল্পদিনের মধ্যেই সেকালের সুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্র 'সমাচার-চন্দ্রিকায়' তাহার এইরূপ প্রশংসাবাদ প্রচারিত হইয়াছিল—"যে হেতুক প্রায়

তিন বৎসর হইল হইয়াছে, এ পর্য্যন্ত কোন বালকের নাস্তিকতা কলঙ্ক রাষ্ট্র হয় নাই, এজন্য ভদ্রলোক ঐস্থানে বালক পাঠাইতে সন্দিগ্ধ হইবেন না এবং যে সকল পুস্তকাদি পাঠে নাস্তিকতা হয় তথায় (তাহা) পাঠ হয় না। আমরা ইহাও শুনিয়াছি যে আঢ্য বাবু বালকদিগকে সর্ব্বদা সাবধান করিয়া থাকেন।" (৩) যুগপ্রভাবের কুফল হইতে যে কালীপ্রসাদ দূরে রহিতে পারিয়াছিলেন, মনে হয় কৈশোর হইতেই 'সেমিনরির' সহিত সম্পর্ক তাহার অন্যতম কারণ। সেমিনরির ছাত্রগণ খৃষ্টধর্ম্মমতের দিকে না ঝুঁকিয়াও যেভাবে ইংরাজি শিক্ষায় পারদর্শী হইতেছিল তাহার পরিচয়ও সেকালের প্রাচীন সংবাদপত্রে বর্ত্তমান আছে। এইরূপ বলা হইয়াছে যে, পরীক্ষার সময় বালকগণ "ইংরাজি গদ্য পদ্যের বিরাম স্থান ও দীর্ঘোচ্চারণ স্থানে যে প্রকার ধারা মত পাঠ করিয়াছেন তাহাতে অনেক ইংরাজ অপেক্ষাও ভাল জ্ঞান হইয়াছে আর উচ্চারণেতেও বিলাতী ছাত্রদের প্রায় সমতুল্য বটেন।" (৪) উত্তর কালে কালীপ্রসাদের বাগ্মীতা সম্বন্ধে সমালোচনা কালে একজন বৈদেশিক সমালোচক বলিয়াছিলেন—"His command of English is as perfect as his pronuncia-

(৩) সমাচার চন্দ্রিকা, ২৫ ফেব্রুয়ারী ১৮৩২, সংবাদ পত্রে সেকালের কথা (২য় খণ্ড)—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৪১ পৃষ্ঠা।

(৪) ঐ ৫০ পৃষ্ঠা।

tion……"—ইংরাজি ভাষার উপর তাঁহার অধিকার যেমন সর্ব্বায়বসম্পন্ন, তাঁহার ইংরাজি শব্দের উচ্চারণও তেমনি ক্রুটি-হীন! (৫) এখন মনে হয়, ওরিএন্টাল্ সেমিনরিতে অধ্যয়নের ফলই ইহার মূলীভূত কারণ। ইহার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যই মনে রাখিতে হইবে কালীপ্রসাদের অনন্যসাধারণ প্রতিভা ও যাহা শিখিতে হইবে তাহা পূর্ণাঙ্গ করিয়াই শিখিব, কোথাও ফাঁক থাকিবে না—এইরূপ একটি দৃঢ়সঙ্কল্প।

ওরিএন্টাল্ সেমিনরিতে ইংরাজি শিক্ষার প্রাথমিক গ্রন্থ হইতে আরম্ভ করিয়া ইতিহাস, গণিত, পদার্থবিদ্যা, ক্ষেত্র-পরিমাণ বিদ্যা, অর্থনীতি, ইংরাজি রচনা প্রভৃতি সমস্তই শিক্ষা দেওয়া হইত। কালীপ্রসাদ প্রথমে সেমিনরির নিম্ন শ্রেণীতে প্রবেশ লাভ করিয়া প্রতি বৎসর ডবল্ প্রমোশন প্রাপ্ত হইয়া অতি ত্বরায় প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার জন্য উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিলেন এবং পরে ঐ পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। বিদ্যালয়ের সম্পাদক বেচারাম চাটুয্যে এবং শিক্ষকগণ সর্ব্বদাই কালীপ্রসাদের বুদ্ধি-বিদ্যার যথেষ্ট প্রশংসা করিতেন।

কালীপ্রসাদ অঙ্কশাস্ত্রে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন এবং একজন সুদক্ষ শিল্পী হইবার সম্ভাব্যতা যে তাঁহার মধ্যে

---

(৫) NewYork Tribune, March 6th, 1898 (বিশ্ববাণী,) আষাঢ় ১৩৩৭, ২০৬ পৃষ্ঠা।

ছিল, নানাবিধ চিত্র অঙ্কন করিয়া ও তাহাতে রং লাগাইয়া বিত্থালয়ে তিনি সে পরিচয় দিয়াছিলেন। উইল্‌সন্‌-কৃত ভারতবর্ষের ইতিহাসে যেদিন তিনি অবতারপ্রতিম শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের বিবরণ পাঠ করিলেন, সেই দিন তাঁহার মনের মধ্যে একটি বিরোধ উপস্থিত হইল। মন কহিল—তুমি এ কি করিতেছ, কালীপ্রসাদ? চিত্রকর হইবার জন্য তোমার জন্ম নহে। তুমি একজন দার্শনিক পণ্ডিত হইতে আসিয়াছ, দার্শনিক হও। কালীপ্রসাদ চিত্র-শিক্ষকের নিকট যাইয়া কহিলেন—"আমি চিত্রকর হইতে চাহি না, দার্শনিক হইব।"

শিক্ষক কালীপ্রসাদকে অনেক বুঝাইলেন এবং কহিলেন —"দার্শনিক অপেক্ষা চিত্রশিল্পীই শ্রেষ্ঠ।"

কালীপ্রসাদ দৃঢ়কণ্ঠে কহিলেন—'কখনই তা' সম্ভব নয়। চিত্রশিল্পী বস্তুটার বাহিরটাই শুধু দেখেন—কিন্তু দার্শনিক উপরের স্তর ভেদ করিয়া নীচে অবতরণ করেন। কোন্ কার্য্য-কারণ সম্বন্ধের ফলে বস্তুটির উদ্ভব হইয়াছে, দার্শনিকের দর্শনক্ষেত্র তাহাই। তিনি শুধু বাহিরটা দেখিয়া তুষ্ট হইতে পারেন না।

এই শুভক্ষণ হইতেই কালীপ্রসাদের জীবনের গুরুতর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল।

বিত্থালয়ে পাঠকালে কালীপ্রসাদ যে গ্রন্থকীটরূপেই সর্ব্বদা পুস্তকের মধ্যে ডুবিয়া থাকিতেন, তাহা নহে।

আহেরিটোলার ব্যায়াম সমিতিতে যোগদান করিয়া তিনি দেহচর্চ্চা করিতেন। গঙ্গাস্রোতে সন্তরণ, ক্রিকেট এবং অন্যান্য খেলাধুলাতেও তিনি পরম উৎসাহে যোগ দিতেন। বাল্যাবধি ইহাই তাঁহার জানা ছিল যে, দেহ একটি যন্ত্র মাত্র। সেই যন্ত্রের খবরদারি না করিলে অচিরেই উহা ধ্বংস হইয়া যায়। দেহকে এইরূপ ভাবেই গঠন করিতে হইবে যেন মনে হয় দেহের শিরাগুলি ইস্পাতে প্রস্তুত। বলহীন যে, কখনও সে আত্মাকে লাভ করিতে পারে না, কৈশোরেই কালীপ্রসাদের অন্তরে সেই সত্য প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। তিনি শিখিয়াছিলেন—শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্। পরবর্ত্তীকালে নানা বক্তৃতাসভায় তিনি তারস্বরে এই কথাই প্রচার করিয়াছেন।

কালীপ্রসাদের স্মৃতিশক্তি ছিল অদ্ভুত। তিনি একবার যাহা শুনিতেন জীবনে কখনও তাহা বিস্মৃত হইতেন না। বাল্যকাল হইতেই অত্যাশ্চর্য্য ছিল তাঁহার তত্ত্বজিজ্ঞাসু মন। এই মনই সর্ব্বদা একজনকে অপরজন হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক করিয়া ফেলে। প্রত্যেকটি বিষয়ের অন্তর্নিহিত কার্য্য-কারণ সম্পর্ক জানিবার জন্য বাল্যকালেই তাঁহার এমন প্রবল আকাঙ্ক্ষা দেখিয়া পিতা রসিকলাল বিস্মিত হইয়া বলিতেন—'এত অল্প বয়সে এত অনুসন্ধিৎসা কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়!'

জানিবার ইচ্ছা হইতেই বিচার-বুদ্ধি আসে। যাহার বিচার-বুদ্ধি নাই সাংসারিক জীবনেও সে যেমন ব্যর্থকাম, ধর্ম্ম-জীবনেও সে তাহাই। ধার্ম্মিক হইবার প্রথম পথ সদসৎ বিচার। সর্ব্বদা পরের নজির তুলিয়া যে চলে, সে সত্য সত্যই চলে না—পদপ্রক্ষেপ করে মাত্র! সে যেন 'খরশ্চন্দনবাহী, ভারস্য বেত্তা ন তু চন্দনস্য।' তাই উত্তরকালে মহারাজ এই উপদেশই দিতেন—জ্ঞানের চর্চ্চা করিয়া আত্মোপলব্ধি লাভ কর। নিজের বুদ্ধি—নিজের বিচারশক্তি সর্ব্বদা প্রকাশিত করিয়া পথের সন্ধান কর। তোমরা প্রত্যেকেই অনন্ত শক্তিতে শক্তিমান্। আত্মশক্তিকে জাগ্রত কর—প্রকাশিত কর। কোন্ ঋষি কোন্ যুগে কি বলিয়া গিয়াছেন শুধু তাহাই ধরিয়া বসিয়া থাকিলে, জানিও অগ্রগতির পথ চিররুদ্ধ। আত্মশক্তি জাগ্রত না হইলে কি কখনও আত্মবিশ্বাস আসে? ভগবান্ তেজস্বরূপ—তাঁহার নিকট তেজ প্রার্থনা কর—তিনি বীর্য্য-স্বরূপ—তুমি সেই বীর্য্য চাও। তিনি বলস্বরূপ—তুমি তাঁহার নিকট সেই বল ভিক্ষা কর—ওজস্ ভিক্ষা কর, তবে না আত্মজ্ঞান হইবে!

স্বনামধন্য কৃষ্ণদাস পাল, স্বামী বিবেকানন্দের পিতা বিশ্বনাথ দত্ত, নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্র ঘোষ, তাঁহার ভ্রাতা হাইকোর্টের এটর্ণী অতুল চন্দ্র ঘোষ, রসরাজ অমৃতলাল বসু, শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গৃহী শিষ্য সুরেশচন্দ্র মিত্র, অক্ষয়

কুমার দত্ত, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি অনেকে ওরিএন্টাল্ সেমিনরিতে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ইঁহারা আপন আপন কার্য্যক্ষেত্রে যে বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন তাহা কাহারও অবিদিত নাই। রবীন্দ্রনাথের কথা ঠিক বলিতে পারি না, তবে অপর কয়েকজন ছিলেন কালীপ্রসাদের পিতা রসিক মাষ্টার মহাশয়ের ছাত্র। সুতরাং বুঝাই যাইতেছে যে, কালীপ্রসাদকেও বাঙ্গালার অপর দশ জনের মধ্যে একজন করিবার জন্য মাষ্টার মহাশয়ের চেষ্টার ত্রুটী ছিল না।

সে সময়ে এখনকার মতই নবপ্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদিগের পরীক্ষা লইয়া কৃতীত্ব অনুসারে এফ্-এ, বি-এ, বি-এল্, ডি-এল্ প্রভৃতি উপাধি দান করিতেন। ঐ সকল উচ্চ উপাধি প্রাপ্ত হইলেই ছাত্রগণ অনায়াসে উচ্চ রাজপদ ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেন। কালীপ্রসাদের যেরূপ সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা ছিল তাহাতে ইচ্ছা করিলে তিনিও অনায়াসে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কোন একটি উপাধি পাইয়া সম্মানিত রাজপদে নিযুক্ত হইতে পারিতেন। একালে বি-এ, এম্-এ প্রভৃতি উপাধি আপন আপন মূল্য হারাইয়া ব্যাধি স্বরূপ হইয়াছে! সেকালে এরূপ ছিল না। কিন্তু কালীপ্রসাদের মনই ছিল অনন্য-সাধারণ! সে মন তত্ত্বজিজ্ঞাসু ও বিচারপরায়ণ ছিল বটে, কিন্তু লব্ধজ্ঞানকে অর্থোপার্জ্জনের বাহনরূপে ব্যবহার করিবার কামনা তাঁহার কোনদিনই ছিল না। উত্তরকালে যখন

বহুজ্ঞানের আধার হইয়া তিনি মার্কিনের নানা সভায় সেই জ্ঞান বিতরণ করিতেন, তখনও সে জন্য শ্রোতাকে মূল্য দিতে হয় নাই! এদিকে হয়ত তিনি অনাহারেই আছেন, কিন্তু সেই দিন বক্তৃতা দান করিয়া অর্থ গ্রহণ করা তিনি একান্ত অসঙ্গতই মনে করিয়াছেন! স্বেচ্ছায় যদি কেহ কিছু দিয়াছে তাঁহার সঙ্গীরা শুধু তাহাই সংগ্রহ করিতেন। অথচ সে দেশের নিয়মই এই যে, অর্থদ্বারা টিকেট ক্রয় করিয়া সভায় প্রবেশ করিতে হয়। টিকেট-বিক্রয়লব্ধ অর্থের একাংশ বক্তা পাইয়া থাকেন। মার্কিনে ইহা দোষাবহ ত নহেই—বরং রীতিই এই। কালীপ্রসাদের অবচেতন মনের অন্তরালে ছিল তাঁহার স্বদেশের সংস্কৃতি ও সুমহান্ জ্ঞানরাজ্যের একটি অস্পষ্ট ছায়া। সেই ছায়াকে কায়া দিবার জন্যই সেমিনরিতে পাঠকালে তিনি সংস্কৃত ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "উপক্রমণিকা" ও "কৌমুদী" আয়ত্ত করিয়া তিনি নিজ বাটীতেই 'মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ' পাঠ করিতে লাগিলেন। প্রতিদিন সায়ংকালে অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈয়াকরণ হেরম্ব পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট গমন করিয়া ব্যাকরণের পাঠ গ্রহণ করা তাঁহার নিয়মিত কার্য্য ছিল। 'হিতোপদেশ' প্রভৃতি বিদ্যালয়পাঠ্য সংস্কৃত গ্রন্থাদি যেমন তিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই অধ্যয়ন করিলেন, তেমনি অধ্যয়ন করিলেন কালিদাসের 'রঘুবংশ', 'কুমারসম্ভব', 'শকুন্তলা' প্রভৃতি কাব্য—অধ্যয়ন

করিলেন ভর্ত্তৃহরির মহাকাব্য 'ভট্টি'। তাঁহার কবিচিত্ত এই সকল কাব্যের সৌন্দর্য্যে ডুবিয়া যাইত এবং উহা তাঁহাকেও কবি করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি সংস্কৃত অনুষ্টুপ্ ছন্দে কবিতা রচনা করিয়া সেই বয়সেই বাণীর চরণকমলের জন্য মাল্য রচনা করিতে লাগিলেন। সেমিনরির সংস্কৃতের অধ্যাপক অভয় পণ্ডিত মহাশয় ছাত্রের অদ্ভুত শক্তি দেখিয়া পুলকিতচিত্তে তাঁহার হস্তে স্নেহের দান স্বরূপ একখণ্ড "ছন্দোমঞ্জরী" দেওয়ায় সংস্কৃত সাহিত্যের ছন্দানুবর্ত্তন তাঁহার পক্ষে সহজসাধ্য হইয়াছিল। কিছুকাল পর সেমিনরির ছাত্র কালীপ্রসাদ যখন বরাহনগর মঠে 'কালী তপস্বী' রূপে দিবারাত্রি শাস্ত্রালোচনা করিতেন, তখন অবসর সময়ে যে শ্রীশ্রীমাতৃ-স্তোত্র রচনা করিয়াছিলেন মাতা ঠাকুরাণী তাহা শুনিয়া পরমানন্দে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিয়াছিলেন—"তোমার কণ্ঠে সরস্বতী বসুক।"

জগন্মাতৃস্বরূপিণী শ্রীশ্রীসারদা দেবীর বরে সত্য সত্যই কালীপ্রসাদের কণ্ঠে যে স্বরস্বতী অধিষ্ঠিতা হইয়াছিলেন, তাঁহার বক্তৃতাগুলি ও রচনাবলী পাঠ করিলে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। মার্কিনের এবং ইংলণ্ডের সমালোচকগণ তাঁহার রচনাবলী পাঠ করিয়া উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে প্রশংসা করিয়াছেন। সেই সকল রচনায় এবং তাঁহার ভাষণে শুধু যে ইতিহাসই আছে তাহা নহে, শুধু যে দর্শন-বিজ্ঞানই আছে

তাহাও নহে—সেগুলি যে শুধু একজন প্রচারকের ন্যায়শাস্ত্রানুমোদিত ভাষণ, তাহাও নহে। তাহার মধ্যে কাব্যের অভাব নাই, সৌন্দর্য্যের অভাব নাই অথচ ভাবপ্রবণতার ধার দিয়াও সেগুলি যায় না। স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন—"বৃন্দাবন-লীলা-ফিলা এখন রেখে দে। গীতা সিংহনাদকারী শ্রীকৃষ্ণের পূজা চালা, শক্তি পূজা চালা, শক্তি পূজা চালা।" মহারাজকেও বলিতে শুনিয়াছি—নাচা হরিবোলা করিয়াই আমাদের দেশটা মাটি হইল—শুধুই নকল-ভক্তির ভাবপ্রবণতা মাত্র! সর্ব্বদা তাঁহাতে কবির মন দেখিতে পাইয়াই একজন মার্কিনি-সমালোচক লিখিয়াছিলেন—স্বামী অভেদানন্দ বৃত্তিতে দার্শনিক, আত্মমনোনয়নে তিনি আচার্য্য এবং স্বভাবে কবি। (৬)

সেকালে বাঙ্গালীর মন লইয়া যে একটি প্রবল ঘূর্ণাবর্ত্ত ধাবমান হইয়া কলিকাতা হইতে ঢাকা, ঢাকা হইতে রঙ্গপুর এবং রঙ্গপুর হইতে বাঙ্গালার অন্যান্য স্থানে ভীষণ আলোড়ন উপস্থিত করিয়াছিল, সংক্ষেপে বলিতে হইলে বলিতে হয় যে, কেশবচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন ও শশধরের বক্তৃতা, দীনবন্ধুর "নীল-দর্পণ", বঙ্কিমের উপন্যাস, বিদ্যাসাগরের সাহিত্যসেবা—দয়া—বিধবাবিবাহের আন্দোলন এবং জনসেবা ও মহত্ত্বে সকল

(৬) Colorado Spring Gazette, Sept 26, 1901 (বিশ্ববাণী) শ্রাবণ ১৩৪৭, ২৪১ পৃষ্ঠা।

বাঙ্গালীর ঊর্দ্ধে তাঁহার শিরোত্তলন—বলিতে হয় ডাক্তার মহেন্দ্রলালের সত্যপ্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প, হরিশ্চন্দ্রের 'হিন্দু পেট্রিয়ট', মাইকেলের "রত্নাবলী ও শর্ম্মিষ্ঠার", বেলগাছিয়া-রঙ্গালয়ে অভিনয়—"তিলোত্তমা সম্ভবের" ওজস্বীতা নূতন ভাব, নূতন ছন্দ—তাহার পর "মেঘনাদবধ"—বাঙ্গালা কাব্যে সে এক নূতন রথ্যা রচনা তখন শিক্ষিত জনগণের মুখে মুখে কীর্ত্তিত হইতেছিল। "ব্রজাঙ্গনায়" শ্রীকৃষ্ণের যে বাঁশরী বাজিয়াছিল তাহার সুর তখন গৃহে গৃহে প্রতিধ্বনি তুলিতেছিল।

কালীপ্রসাদের জন্মের কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালায় ইংরাজদিগের বিষাণ নিনাদিত হইয়াছিল "নেভার্—নেভার্!" (৭)

সাহেবেরা বলিলেন এ দেশীয় 'কালা' বিচারকদিগের বিচারাধীন হইব না! ইংরাজ 'হাকিম' ভিন্ন আমাদের বিচার হইবে না। কলিকাতার পৌর-গৃহে (টাউন হলে) সাহেবদিগের প্রকাণ্ড একটি প্রতিবাদ সভা হইল। বাঙ্গালীরাও একটি তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি করিলেন। তীব্রতায় উহা 'ইল্‌বার্ট বিলের' আন্দোলনের সমকক্ষ এবং অনেক দিন পর্য্যন্ত বাঙ্গালীচিত্তকে সংক্ষুব্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। ১৮৬০ হইতে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজের নবোত্থানের যুগ; তাহা কেশবের 'সঙ্গত্ সভার' যুগ—তাহা স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের

(৭) নেভার্—নেভার্—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বিবিধ কবিতা।

যুগ। এই যুগেই বিভিন্ন জাতীয় নরনারীর মধ্যে ব্রাহ্মমতে উদ্বাহ কার্য্য সম্পন্ন হইতে আরম্ভ হয়। এই যুগেই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সমাজ ভাঙ্গিয়া "ভারতবর্ষীয় সমাজের" সৃষ্টি এবং কিছুকাল পর তাহা ভাঙ্গিয়া "নববিধানের" জন্ম হয়। তাহার পর আসিল সেই আন্দোলনের কাল যখন সুপ্রসিদ্ধ এম্, ডি ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার সকল লাঞ্ছনা অগ্রাহ্য করিয়া সত্যপ্রতিষ্ঠার জন্য হোমিওপ্যাথির জয় ঘোষণা করিলেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী লিখিয়াছেন—"যে তেজ, যে সত্যনিষ্ঠা, যে মনুষ্যত্ব লোকে দেখিল, তাহাই সকলের চিত্তকে বিশেষরূপে উত্তেজিত করিয়াছিল এবং বঙ্গবাসীর মনে এক নবভাব আনিয়া দিয়াছিল। তখন কলিকাতা তোলপাড় হইয়া যাইতে লাগিল।"

এই তোলপাড়ের মধ্যে বাঙ্গালীর হৃদয়ে একটি নবীন আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করিয়া দিল "ন্যাশান্যাল্ পেপার" নামক একখানি সাপ্তাহিক-পত্রের সম্পাদক নবগোপাল মিত্রের "জাতীয় মেলা" বা হিন্দুমেলা। সেই দিন বাঙ্গালীর মনে জাতীয় উন্নতির যে কামনা জাগিল, বহু পীড়নেও তাহা এখন পর্য্যন্ত মোহমগ্ন হয় নাই। এই মেলার দ্বিতীয় অধিবেশনে (১৮৬৮ খৃষ্টাব্দ) বাঙ্গালী সিভিলিয়ন্ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম জাতীয় সঙ্গীত—"গাও ভারতের জয়" গীত হইয়াছিল। হিন্দুমেলার প্রচেষ্টাতেই "স্বদেশীয় শিল্পের উন্নতি, স্বদেশীয়

সাহিত্যের বিকাশ, স্বদেশীয় সঙ্গীতাদির চর্চ্চা, স্বদেশীয় কুস্তি প্রভৃতির পুনর্বিকাশ” ঘটিতে আরম্ভ হইয়াছিল। (৮) হিন্দু-মেলার বাণী ছিল—স্বাবলম্বী হও—ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ।

১৮৬০ হইতে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কলিকাতা যেরূপ নানা আন্দোলনের তরঙ্গে বারংবার আহত হইতেছিল, ঐ সময়ে ঢাকাতেও অনুরূপ আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল। শিক্ষিত যুবকদিগের মধ্যে এমন একদল লোক ঢাকা অঞ্চলে দেখা দিলেন যাঁহারা সকলেই—

'যেন বা টানিয়া ছিঁড়িয়া ভূতলে
নূতন করিয়া গড়িতে চায়।'

এই আন্দোলনে যোগদান করিয়া রামশঙ্কর সেন, অভয়া-চরণ দাস, ঈশ্বরচন্দ্র সেন, দীননাথ সেন, কালীপ্রসন্ন ঘোষ প্রভৃতি অনেকে বাঙ্গালার ইতিহাসে প্রখ্যাত হইয়াছেন। কালীপ্রসাদের জন্মের দুই বৎসরের মধ্যে ঢাকায় “বল্লালী সংশোধনের” যে অগ্নি প্রজ্বলিত হইল, রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় ছিলেন সেই যজ্ঞের হোমকর্ত্তা। সেই অগ্নি শুধু ঢাকাতেই নিবদ্ধ রহিল না—ধীরে ধীরে সমগ্র বঙ্গে তাহার শিখার আঁচ লাগিল; রাসবিহারীকে সাহায্য করিবার জন্য বিদ্যাসাগর ভারতের আইন-সভায় পর্য্যন্ত তর্ক তুলিলেন।

(৮) রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ—পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, ২৫৭ পৃষ্ঠা।

কবি হেমচন্দ্র এই আন্দোলনকে সাহিত্যে স্থান দিয়া উহাকে অমর করিয়াছেন।

ইহার পর ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই কয়েক বৎসর ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব হ্রাস হইবার কাল। এই সময়েই হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান আরম্ভ হইয়াছিল। এই ১৮৭৮-১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ হইতে "ঠাকুরের চিহ্নিত ভক্তগণের" দক্ষিণেশ্বরে আগমন আরম্ভ হয়।

ইহার প্রায় ৪।৫ বৎসর পূর্ব্বে অসীম প্রতিভাশালী স্বদেশ-বৎসল ব্যবহারাজীব আনন্দমোহন বসু অত্যন্ত কৃতিত্বের সহিত ইংলণ্ডের শিক্ষা সম্পূর্ণ করিয়া দেশে ফিরিলেন। প্রায় সমকালে সুরেন্দ্রনাথের সহিত গবর্ণমেণ্টের বিরোধ ঘটায় তিনি আই-সি-এস্-এর কর্ম্মত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিলেন এবং আনন্দমোহনের সহিত মিলিত হইলেন। অগ্নির সহিত যেন প্রভঞ্জন আসিয়া মিশিল। অতি অল্পদিনের মধ্যেই দলে দলে ছাত্র আসিয়া সেই দাবানলের সম্মুখে দাঁড়াইতে লাগিল। তাঁহাদিগের মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতায় যুবজনচিত্ত উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। 'দেবী আমার, সাধনা আমার, স্বর্গ আমার—আমার দেশ'—সেই দেশের সেবা করিবার জন্য তাহারা বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিল। এদিকে বৃদ্ধের দল 'ভারত-সভা' স্থাপন করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষে রাজনৈতিক চর্চ্চা আরম্ভ করিয়া দিলেন (১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ)। এই আন্দোলনের বহু ফলের মধ্যে মাত্র

দুইটির কথা উল্লেখ করিতেছি—একটি 'নিখিল ভারত কংগ্রেসের' প্রতিষ্ঠা এবং অপরটি বাঙ্গালার স্বদেশী যজ্ঞ, যেদিন ঋষির মন্ত্র সার্থক হইয়াছিল—বন্দেমাতরম্ এবং বিশ্ব-কবির গান যেদিন অনল বর্ষণ করিয়াছিল—

"ওদের আঁখি যতই রক্ত হবে
মোদের আঁখি ফুটবে—
ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে
মোদের বাঁধন টুটবে।"

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে কালীপ্রসাদের জন্ম হয়। তাহার সমকাল হইতে 'ভারত-সভা' সংস্থাপন পর্য্যন্ত—সামান্য কয়েকটি বৎসর মাত্র। এই কয়েকটি বৎসরের আয়ুষ্কাল স্বল্প হইলে কি হয় —সেই অল্পায়ুর মধ্যেই ভারতের এবং বিশেষ করিয়া বাঙ্গালার নিদ্রিত ভিসুভিয়স্ অগ্ন্যুদগার করিয়াছে! এই অগ্ন্যুদগারের সহিত পরিচয় না হইলে, স্বামী বিবেকানন্দ বা কালীপ্রসাদ এবং ঠাকুরের অন্যান্য চিহ্নিত ভক্তগণের জীবন-লীলার অন্তর্নিহিত গূঢ়তত্ত্বটি হৃদ্‌বোধ হওয়া সময়-সাপেক্ষ। আমরা বাঙ্গালার সেই একাদশটি বীর গোস্বামীর কথা বলিতে প্রয়াস পাইব না। বলিব শুধু কালীপ্রসাদের কথা এবং প্রয়োজন বোধে প্রসঙ্গতঃ অন্যের কথা।

স্বামী বিবেকানন্দ এবং স্বামী অভেদানন্দের বক্তৃতা ও রচনাগুলি এবং পত্রাবলী ও শিষ্যদিগের সহিত কথোপকথন

প্রভৃতি পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, যে-যুগসন্ধিক্ষণে তাঁহারা আবির্ভূত হইয়াছিলেন তাঁহারা তাহার ধর্ম্মকর্ত্তৃক বহুলভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ মহীশূরের ছাত্রদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন—"আর একবার আমি আপনাদিগকে আমাদের জাতীয় আদর্শ স্মরণ করাইয়া দিতেছি। ব্যক্তি-বিশেষের হয় ত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র জীবনাদর্শ থাকিতে পারে ; কিন্তু সমগ্র জাতির আদর্শ ও লক্ষ্যের সম্মুখে ব্যক্তিগত আদর্শকে নতশির হইতেই হইবে। আমাদিগকে সর্ব্বদা স্বাধীনতারই স্তোত্র পাঠ করিতে হইবে এবং প্রত্যেকেরই লক্ষ্য হইবে স্বাধীনতা অর্জ্জন। এই স্বাধীনতা অর্থে আমরা বুঝিব জ্ঞানের এবং নীতির স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতা অর্জ্জন করাই হইবে আমাদের চরম লক্ষ্য—আমরা যেখানেই যাই না কেন, সেখানেই স্বাধীন থাকিব। কিন্তু হায়, এখন আমরা স্বাধীন নহি—আমরা পরাধীন !" (৯)

ঐ বৎসরেই কলিকাতার পৌরগৃহে (টাউন হলে) তাঁহাকে বলিতে শুনি—"পৃথিবীর সকল দেশের ইতিহাস এই কথাই বলে যে, কেবল তাঁহারাই মহৎকার্য্য করিতে সক্ষম হইয়াছেন, যাঁহারা মনুষ্যত্বের বেদীর উপর ব্যক্তিগত স্বার্থকে বলি

(৯) Lectures and Addresses in India—Swami Abhedananda, page, 244.

দিয়াছেন। এই পন্থা যদি আমাদের পন্থা না হয়—এই পন্থা, যাহা অন্যদেশের কর্ম্মপ্রচেষ্টাকে সফল করিয়া দেশের জন্য গৌরব আনিয়া দিয়াছে, তাহা যদি আমাদেরও পন্থা না হয় তাহা হইলে আমরা চিরদিন কৃতদাসই থাকিয়া যাইব, আমাদের ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা একেবারে নিশ্চিহ্ন হইবে! এই প্রাণান্ত প্রচেষ্টার জন্য আমাদিগকে জাগ্রত—সচেতন হইতে হইবে এবং নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইতে হইবে, জীবনের প্রত্যেক ব্যাপারে শৌর্য্য বীর্য্য দেখাইতে হইবে।

"আমরা চাই কি? আমরা এখন আমাদের জাতীয় শিল্পের উন্নতি বিধান করিতে তৎপর হইয়াছি, আমরা সর্ব্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করিতে প্রয়াসী। আমরা সকলে মিলিয়া একটি অখণ্ড জাতিরূপে দাঁড়াইতে চাই। অন্য জাতির পক্ষে যেমন, আমাদের পক্ষেও তেমনি; আমাদের সকলের লক্ষ্যই এক—আমরা স্বাধীনতা চাই।

"যে স্বাধীনতা আমরা আকাঙ্ক্ষা করি তাহার রূপটি কি? পৃথিবীর অন্যান্য জাতির স্বাধীনতার আদর্শ যাহা, আমাদের আদর্শ তাহা অপেক্ষা অনেক মহত্তর। ইউরোপীয় এবং আমেরিকানগণ তাহাদের নিজ নিজ সমাজে ও রাষ্ট্রে স্বাধীন হইতে পারিলেই পরিতৃপ্ত। মনে করুন, আমরাও সমাজে ও রাষ্ট্রে স্বাধীন হইলাম। শুধু উহা লইয়াই কি আমরা তুষ্ট থাকিব? কখনই নহে, কারণ পৃথিবীর অন্যান্য

জাতির আদর্শের তুলনায় আমাদের জাতীয় আদর্শ অনেক উচ্চে।

"স্বাধীনতা বলিলে সত্যই যাহা বুঝায় আমরা চাই সেই স্বাধীনতা। বেদ বলেন স্বাধীনতার আদর্শ মোক্ষ—আত্মিক স্বাধীনতা। বন্ধুগণ, আমি আপনাদিগকে বলিতে চাই যে, এই পৃথিবীতে স্বাধীনতার যত প্রকার আদর্শ আছে, সে সমস্তই আত্মিক স্বাধীনতার পাদপীঠের উপর বিরচিত। সেই আত্মিক-স্বাধীনতার আদর্শই আমাদের কাম্য হউক—উহা লাভ করাই আমাদের চরম লক্ষ্য হউক। স্বাধীনতার এই রূপটি যেন আমরা যথাপ্রযত্নে উপলব্ধি করিতে পারি, কারণ, তুলনায় উহাই হইল সর্ব্বপ্রকার স্বাধীনতার আদর্শ হইতে বৃহত্তর এবং মহত্তর। যে স্বাধীনতা আত্মাকে স্পর্শ করিতে পারে না, সে স্বাধীনতা আত্মার মুক্তি আনে না। আমার আত্মাই সত্যকার 'আমি'। আত্মিক-স্বাধীনতাই শাশ্বত। উহা লাভ করিলে আমরা এই জগতেই প্রত্যেকে রক্তমাংসে গঠিত এক একটি দেবতার মত বাস করিতে পারিব।"(১০)

কর্ম্ম অতি ত্বরায় নিজেকে ক্ষয় করিয়া ফেলে, কিন্তু যে ভাবের পতাকা বহন করিয়া সে আসিয়াছিল, সেই ভাব

(১০) Swami Abhedananda : Lectures and Addresses, Page, 294.

দিনের পর দিন নবশক্তি লাভ করিয়া মানবকে যুগে যুগে উদ্বোধিত করে। কোনও এক শুভলগ্নে সেই উদ্বোধনের শঙ্খ বাজিয়া উঠে নূতন রূপে রূপায়িত নবীন কর্ম্ম-প্রচেষ্টার পূজা-মণ্ডপে। স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী অভেদানন্দের ভাবধারা তাই একালে এবং অনাগত কালেও বিশুষ্ক হইবে না—বরং দিনে দিনে উহা শক্তি লাভই করিবে। তাঁহারা তো ছিলেন না এক একটি ব্যক্তি মাত্র—তাঁহারা ছিলেন বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এক একটি যুগ। যেমন উদার বৃহৎ অসীম আকাশের এক প্রান্তে বিদ্যুচ্ছটা জ্বলিলে তাহার প্রভায় দিগ্‌দিগন্ত আলোকিত হইয়া উঠে, তেমনি এক যুগের বাণী যুগ-যুগান্ত পর্য্যন্ত ঝঙ্কার দিতে থাকে। তাঁহারা যুগপ্রলয়কারী সেই বাণীই উচ্চারণ করিয়া গিয়াছেন যাহার ইঙ্গিত বহুদিন পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর ধর্ম্ম, সমাজ, রাষ্ট্র প্রভৃতি সব-কিছুরই পথ প্রদর্শক সাঙ্কেতিক চিহ্নরূপে বর্ত্তমান থাকিবে, এবং সুস্পষ্টরূপে দেখাইয়া দিবে সেই যুগের প্রভাব—যে যুগের ঘূর্ণাবর্ত্তের মধ্যে তাঁহাদিগের বাল্য, কৈশোর ও যৌবনকাল অতিবাহিত হইয়াছিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

গুরুর সন্ধানে

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তখন বাঙ্গালার ডিমস্থিনিস্। তিনি কোনও স্থানে বক্তৃতা দিবেন শুনিলেই বহু দূর হইতে লোক আসিয়া শুনিবার জন্য ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত। আবার ভক্ত কেশবচন্দ্র সেনের বক্তৃতাকালেও এইরূপই জনতা হইত। লোকে মুগ্ধের ন্যায় তাঁহার কথা শুনিত। রেভারেণ্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও রেভারেণ্ড ম্যাক্‌ডোনাল্ড ছিলেন প্রথিতনামা ঈশাহী-ধর্ম্মপ্রচারক। প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, লাল-মোহন ঘোষ প্রভৃতি কয়েকজন সুবিখ্যাত বক্তা তখন কলিকাতার নানা স্থানে বক্তৃতা করিতেন। ইঁহাদিগের বক্তৃতা হইতেছে শুনিলেই কালীপ্রসাদ সাগ্রহে সভাস্থলে ছুটিতেন।

উত্তরকালে কালীপ্রসাদকে স্বদেশে এবং বিদেশে কতই না বক্তৃতা করিতে হইয়াছে। বাঙ্গালার এই সকল সুপ্রসিদ্ধ বক্তাগণের ভাষণ শুনিতে শুনিতে কালীপ্রসাদ তন্ময় হইয়া যাইতেন। বক্তৃতা দিবার যে অসাধারণ শক্তি তাঁহার ভিতরে লুক্কায়িত ছিল, তাহা ক্রমে ক্রমে এই উপায়ে জাগ্রত

হইতেছিল। কালীপ্রসাদ তখন তাহা জানিতেন না, পরে জানিয়াছিলেন যখন রাজনগরী লণ্ডনে তাঁহার প্রথম বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া অন্যান্য শ্রোতৃমণ্ডলী তো বটেই, স্বামী বিবেকানন্দের ন্যায় জগদ্বিখ্যাত বক্তাও আনন্দবিগলিত হৃদয়ে কালীপ্রসাদের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন।

১৮৮২ খৃষ্টাব্দের মাঘোৎসবের দিন অপূর্ব্ব বক্তা কেশবচন্দ্র সেন শত সহস্র শ্রোতার সম্মুখে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে আবেগভরে বলিয়া উঠিলেন—'এই যে আমি হরিকে সর্ব্বত্র দেখিতেছি। ঐ যে হরি—ঐ যে হরি। ঐ বৃক্ষের শাখায় পল্লবে আমি শ্রীহরির দর্শন পাইতেছি'—সেদিন অন্যের মত কালীপ্রসাদের অন্তরেও উন্মাদনার একটা তরঙ্গ খেলিয়াছিল। তিনিও তখন মনে করিয়াছিলেন যে, যেদিকে নয়ন যায় সেই দিকেই যেন শ্রীহরিকে দেখিতেছেন।

পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি তখন দিনের পর দিন হিন্দু ধর্ম্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করিতেন। তাঁহার বক্তৃতায় বাঙ্গালা দেশ মাতিয়া গিয়াছিল।

পণ্ডিত-চূড়ামণি শশধরের মুখে হিন্দুধর্ম্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা শুনিবার জন্য সেকালের কলিকাতায় কিরূপ ভীষণ জনসমাগম হইত, প্রত্যক্ষদর্শী স্বামী সারদানন্দ মহারাজ 'লীলাপ্রসঙ্গে' তাহার নিম্নলিখিত রূপ বর্ণনা করিয়াছেন—"নানা মুনির নানা মত কথাটি সর্ব্ববিষয়ে সকল সময়েই সত্য; পণ্ডিতজির

বৈজ্ঞানিক ধর্ম্মব্যাখ্যা সম্বন্ধেও ঐ কথা মিথ্যা হয় নাই ; কিন্তু তাই বলিয়া শ্রোতার হুড়া-হুড়ির অভাব ছিল না। আফিসের ফেরতা বাবু-ভায়া ও স্কুল-কলেজের ছাত্রদিগের ভিড় লাগিয়া যাইত। এলবার্ট হলে স্থানাভাবে ধাক্কা-ধাক্কি করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে হইত। সকলেই স্থির, উদ্‌গ্রীব—কোনও রূপে পণ্ডিতজির অপূর্ব্ব ধর্ম্মব্যাখ্যা যদি কতকটা শুনিতে পায়। ....কলিকাতার অনেক স্থলেই তখন ঐ এক আলোচনা, শশধর পণ্ডিতের ধর্ম্মব্যাখ্যা।" সেই ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে অনেকেই যেমন ভিড় ঠেলিয়া পণ্ডিতের মুখে ধর্ম্মব্যাখ্যা শুনিতে যাইতেন, সপ্তদশ বর্ষ বয়স্ক যুবক কালীপ্রসাদও তেমনি যাইতেন।

অনেকের নিকট যাহা ছিল একটা সাময়িক হুজুগ মাত্র, কালীপ্রসাদের সর্ব্বদা জ্ঞানপিপাসু ভাবগ্রাহী দার্শনিক চিত্তের নিকটে তাহা ছিল প্রাণের বস্তু। প্রতি পুষ্প হইতেই তিনি তখন নিজের অজ্ঞাতে মধু সংগ্রহ করিতেছিলেন। খৃষ্টধর্ম্ম, হিন্দুধর্ম্ম এবং তাহারই অঙ্গস্বরূপ ব্রাহ্মধর্ম্ম—এই তিনেরই কতক কতক বিশিষ্টতা তিনি এই সকল বক্তৃতা শুনিয়া জানিতে পাইতেন।

পণ্ডিতজির মুখে যেদিন তিনি পাশ্চাত্য বিবর্ত্তনবাদ সম্বন্ধে আলোচনা শুনিলেন এবং সেই সঙ্গে সাংখ্যদর্শনের ক্রম-বিকাশবাদের তুলনামূলক ব্যাখ্যাও শোনা হইল, সেদিন প্রাচীন ও নবীন ইউরোপের দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার জন্য

তাঁহার হৃদয়ে একটি তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগিল। যখন তিনি আবার পতঞ্জলির যোগশাস্ত্রের আলোচনা শুনিলেন, তখন যোগশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া যোগী হইবার জন্য তাঁহার অপরিসীম ব্যগ্রতা জন্মিল।

উত্তরকালে কালীপ্রসাদ যেদিন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম দর্শনলাভে কৃতার্থ হইয়াছিলেন, সেদিন শ্রীভগবান তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—তুমি গতজন্মে একজন বড় যোগী ছিলে। পতঞ্জলির যোগশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া যোগী হইবার জন্য কালীপ্রসাদের চিত্তের তুর্দ্দমনীয় আবেগ তাঁহার সেই পূর্ব্বজন্মের যোগী-জীবনেরই সুষুপ্ত আকাঙ্ক্ষা। যোগ-শাস্ত্রের ব্যাখ্যা শুনিতে শুনিতে তাহা সহসা জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল।

বোধ হয় অনুরূপ সময়েই ভূ-কৈলাসের একজন অসাধারণ হঠযোগীর বৃত্তান্ত তাঁহার কর্ণগোচর হইয়াছিল। যোগী ছিলেন সুন্দরবনের অরণ্যে। কেহ তাঁহার সংবাদ জানিত না। জড়সমাধিমগ্ন যোগীর পদদ্বয়ের ফাঁক দিয়া একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষ ঊর্দ্ধে শির উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান ছিল! তিনি যে কতদিন হইতে পদ্মাসনে সমাধিমগ্ন হইয়া সেই অবস্থায় ছিলেন তাহা কেহ বলিতে পারে না। যখন সেই বনটি পরিষ্কৃত হইতেছিল তখন বৃক্ষটিকে কাটিয়া যোগীবরকে স্থানান্তরিত করা হইল।

তাঁহাকে ভূ-কৈলাসে আনিবার পর বহু লোক যোগী-দর্শনে যাইত। কখনও বা তাঁহাকে গঙ্গাতটে এরূপভাবে বাঁধিয়া রাখা হইত যে, প্রবল জোয়ারের জল তাঁহার উপর দিয়া তাঁহাকে ডুবাইয়া বহিয়া যাইত। ভাটা পড়িলে সকলে দেখিত, যোগী পূর্ব্ববৎ বাহ্যচৈতন্য শূন্যই আছেন। একদিন একজন ইংরাজ-ডাক্তার সাঁড়াশির সাহায্যে তাঁহার মুখবিবর হইতে তালুমূললগ্ন জিহ্বাটিকে টানিয়া বাহির করিলেন। যোগীর অমনি চৈতন্য ফিরিয়া আসিল। সাহেব-ডাক্তার তখন তাঁহাতে জীবনীশক্তি দিবার আশায় তাঁহার মুখে সুরা ঢালিয়া দিলেন। যোগী তখন বিষাদভারাক্রান্ত হৃদয়ে দুই একটি কথা বলিয়াই দেহ ত্যাগ করিলেন। এই হঠযোগীর কাহিনী তখন কলিকাতার সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল এবং দক্ষিণেশ্বরেও ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের কর্ণগোচর হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন, 'যোগী যে এত কষ্ট পাইলেন, উহা তাঁহার কর্ম্মফল!' যাহা হউক এই যোগীর কাহিনী, যোগ শিক্ষা করিয়া যোগী হইবার জন্য কালীপ্রসাদকে যেন খুবই উত্তেজিত করিয়া তুলিল।

কালীপ্রসাদের পিতার পাঠগৃহে ত পতঞ্জলির যোগশাস্ত্র ছিল না, সেখানে ছিল শ্রীভগবদ্গীতা। কালীপ্রসাদ প্রথমে তাহাই পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাকে নিবিষ্টমনে গীতা পাঠ করিতে দেখিয়া পিতা পুস্তকখানি কাড়িয়া লইয়া

বলিলেন—'এ বই পড়িলে পাগল হইয়া যাইবে। ইহা বালকের পাঠ্য গ্রন্থ নহে।'

পিতা গ্রন্থখানিই কাড়িয়া লইলেন বটে, কিন্তু পুত্রের হৃদয়ে যে সুতীব্র জ্ঞানলাভেচ্ছা অনির্ব্বাণ হোমানলের মত জ্বলিতেছিল, তাহা তো নির্ব্বাপিত করিতে পারিলেন না! গীতা পাঠ করিবার জন্য কালীপ্রসাদের চিত্ত আরও বেশী ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি তখন সকলের অজ্ঞাতে রাত্রিকালে লুকাইয়া লুকাইয়া গীতা পাঠ করিতে লাগিলেন।

সত্যই গীতার অপূর্ব্ব ভাব-সমন্বয় তাঁহার সমগ্র জীবনেই মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। দিব্য জ্ঞানলাভের পরও লোক-কল্যাণরূপ কর্ম্মক্ষেত্রে যখন তিনি নিজেকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন, গীতার পূর্ণ অভিব্যক্তি তাঁহার প্রতি প্রচেষ্টার স্পন্দনেই প্রাণময় হইয়া উঠিয়াছিল। আর সেজন্যই দেখিয়াছি, তাঁহার সকল কর্ম্মের ভিত্তিই হইয়াছিল 'শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু'। গীতার সকল বাণীই স্বামীজী মহারাজের মতে বিশ্বমানবের জন্য,—অর্জ্জুন একজন উপলক্ষ্য মাত্র। শ্রীভগবান 'কর্ম্মণ্যে বাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।'—এই কথাও আমাদের মত মানুষকেই লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন; এজন্য তিনি বলিতেন—"প্রত্যেকেই কর্ম্ম করিয়া যাও, ফল চাহিও না। ফলের আকাঙ্ক্ষা করিয়াছ কি কর্ম্মবন্ধনে পড়িবে! ফলাকাঙ্ক্ষা বন্ধন মাত্র। সেজন্য, ভগবানের প্রীতির জন্য কর্ম্ম কর, তখন সিদ্ধি এবং অসিদ্ধি

উভয়ই তোমার কাছে এক হইবে। তখন কে আর তোমাকে বাঁধিতে পারে? ভগবানের কাছে ভাল-মন্দ নাই—পাপ-পুণ্যও নাই। হীনবুদ্ধি স্বার্থপর মানুষের কাছেই শুধু ভাল-মন্দ। ফলটি যদি তোমার মনের মত না হয়, কার্য্যটি তোমার কাছে মন্দই হইবে! শুধু কি ভালোটিই লইবে? তাহা হয় না। ভালোটি লইলে মন্দটিকেও লইতে হইবে। সুখ লইলে দুঃখকেও লইতে হইবে। দুঃখের মুকুট মাথায় পরিয়াই তো সুখ আসে। সুতরাং 'আমি' 'আমার'—এ সব চিন্তা ত্যাগ করিয়া ভগবানের প্রীতির জন্য সকল কর্ম্ম কর।"

গীতা পাঠ শেষ হইল, কিন্তু গ্রন্থের অভাবে যোগশাস্ত্র—অধ্যয়ন করা তো হইল না! কালীপ্রসাদ অত্যন্ত দুর্ম্মনা হইয়া উঠিলেন এবং নিজের জলখাবারের পয়সা বাঁচাইয়া পতঞ্জলির যোগশাস্ত্র ক্রয় করিলেন। অন্যের সাহায্য না লইয়া উহা অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিয়া কালীপ্রসাদ অচিরেই দেখিলেন, সেই দুরূহ শাস্ত্র নিজে নিজে পাঠ করিয়া আদৌ হৃদয়ঙ্গম করা যায় না! কালীপ্রসাদ অনন্যোপায় হইয়া পণ্ডিত শশধরের শরণাপন্ন হইলেন।

পণ্ডিত শশধরের অবসর ছিল না বলিয়া যোগশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য তিনি কালীপ্রসাদকে তৎকালপ্রসিদ্ধ বৈদান্তিক পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশের নিকট প্রেরণ করিলেন। তাঁহারও সময় বেশী ছিল না। যাহা হউক, তিনি স্নানের

পূর্ব্বে তৈল মর্দ্দনের কালে কিছু অবসর করিয়া লইয়া কালী-প্রসাদকে পাঠ দিতে আরম্ভ করিলেন। এইভাবে পতঞ্জলির যোগদর্শন পাঠ করিয়া কালীপ্রসাদ অবিলম্বে একখানি 'শিবসংহিতা' ক্রয় করিয়া তাহাও পড়িয়া ফেলিলেন।

অনতিকালের মধ্যেই কালীপ্রসাদ বুঝিতে পারিলেন যে, শুধু যোগ-গ্রন্থ পাঠ করিলেই যোগী হওয়া যায় না—গুরুর নিকট আসন করিয়া বসিয়া তাঁহারই উপদেশ মত সাধন করিতে হয়! গ্রন্থে সূত্র পাঠ করিয়াই যোগাভ্যাস করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। শুধু কালীপ্রসাদ কেন, অপরিণত বয়সে অনেকের মনেই এইরূপ ধারণা জন্মে যে গুরুকরণ না করিয়াই শুধু গ্রন্থের সাহায্যে যোগী হওয়া যায়। কিন্তু যাঁহারাই এইরূপ চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারাই পরিণামে অকৃতকার্য্য তো হইয়াছেনই, শেষে ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া কষ্ট পাইয়াছেন। মন্ত্র তখনই প্রাণময় হয় যখন প্রাণবান্ ব্যক্তি তাহাতে প্রাণের প্রতিষ্ঠা করেন। (১) জ্ঞানমূর্ত্তি শ্রীগুরুই সেই ব্যক্তি। সুতরাং তাঁহার প্রসাদ লাভ না করা পর্য্যন্ত যোগী হইবার আশা দুরাশা মাত্র। যোগবিভূতি লাভের আশায় অনেককে এইরূপ দুরাশা পোষণ করিতে দেখা যায়।

---

(১) চৈতন্যরহিতা মন্ত্রাঃ প্রোক্তবর্ণাস্তু কেবলাঃ।
ফলং নৈব প্রযচ্ছন্তি লক্ষকোটিজপৈরপি॥
—তন্ত্রসার।

যোগবিভূতি বাহিরের বস্তু নহে। উহা প্রত্যেকের মধ্যেই বর্ত্তমান আছে—উহা গূঢ়চারী। সাধনার দ্বারায় সেই শক্তিকে প্রকাশ করিতে পারিলেই যোগী হওয়া যায়। শ্রীঅরবিন্দের 'Bases of Joga' নামক গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ 'যোগসাধনার ভিত্তির' একস্থানে আছে—

"যদি যোগ সাধনা করতে চাও, তবে ছোট হোক্, বড় হোক্ সব বিষয়ে ক্রমে অধিকতর সাধকোচিত ভাব গ্রহণ করতে হবে। আমাদের সাধনায় বাসনার ক্ষেত্রে সে ভাবটি হ'ল জোর ক'রে দমন নয়, তা হ'ল অনাসক্তি ও সমতা। জোর ক'রে দমন (উপবাস এ পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত) অবাধ ভোগেরই সাথে সমান স্তরে। উভয় ক্ষেত্রেই বাসনা থেকে যায়—একটিতে ভোগে সে পুষ্ট হয়, আর একটিতে দমনের ফলে উগ্রভাবে ও গুপ্তরূপে বর্ত্তমান থাকে। কেবল যখন পিছনে সরে দাঁড়ান যায়, নিম্নতন প্রাণ হ'তে নিজেকে পৃথক করা যায়, তার বাসনা ও বুভুক্ষারাশি নিজের ব'লে কখনও স্বীকার করা না যায়, এদের সম্বন্ধে চেতনায় পূর্ণ সমতা ও স্থিরতা অভ্যাস করা যায়, তখন নিম্নতন প্রাণ নিজেও ক্রমে শুদ্ধ হ'তে থাকে, নিজেও হয় সম ও স্থির। বাসনার প্রত্যেকটি তরঙ্গ যেমন আসে তেমনি পর্য্যবেক্ষণ ক'রে যেতে হবে, তোমার বাহিরে যে জিনিস ঘটে তাকে যেমন তুমি দেখ, ঠিক তেমনি শান্তভাবে, ঠিক ততখানি অটল অনাসক্ত-

থেকে—তাকে কখনও ধ'রে রাখবে না, চলে যেতে দেবে, চেতনা থেকে যেন বহিষ্কৃত হয়, আর সেই সঙ্গেই তার স্থানে ক্রমে সত্য ক্রিয়াটি, সত্য চেতনাটি স্থাপন করবে।" যোগ-সাধনা করিবার জন্য যিনি প্রস্তুত হইতেছেন তাঁহার চেষ্টাকে সফল করিবার জন্য এইরূপ আরও অনেক উপদেশের প্রয়োজন—যোগশাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত সূত্রগুলির অনেক ভাষ্যের প্রয়োজন। উপদেশানুযায়ী অগ্রগতি হইতেছে কিনা—তাহা না হইলে, কোথায় ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটিতেছে গুরুই শুধু তাহা দেখিতে পান এবং যখন যেটুকু প্রয়োজন, শিষ্যকে সেইটুকু জানাইয়া দিয়া বলেন,—অগ্রসর হও। শিষ্য যেমন অগ্রসর হইতে থাকেন, গুরুর তীক্ষ্ণ অন্তর্দ্দৃষ্টিও তেমনি শিষ্যের সঙ্গে সঙ্গে চলে। সুতরাং যোগের গ্রন্থমাত্র অবলম্বন করিয়া কালীপ্রসাদ যখন নিজে নিজে যোগাভ্যাস করিতে চেষ্টিত হইয়া বিফলকাম হইলেন তখন তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছু ছিল না।

কিন্তু এই অকৃতকার্য্যতার যে শুভ ফল ঘটিল তাহাই কালীপ্রসাদের জীবনের গতিকে অচিরকাল মধ্যে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত করিয়া দিল। অকৃতকার্য্যতার সেই শুভ ফল—সদ্‌গুরু লাভের জন্য তীব্র ব্যাকুলতা। যতক্ষণ ব্যাকুলতা না আইসে, ততক্ষণ গুরুর সন্ধান মিলে না। গুরু তো কখনও কালো জামের মত বৃক্ষের শাখায় শাখায় পুঞ্জে পুঞ্জে ঝুলিয়া নাই যে, হস্ত প্রসারণ মাত্রেই পাওয়া যাইবে। তিনি যেমন

দুর্ল্লভ তেমনি আবার খুবই সুলভ। ব্যাকুলতা আসিবা-মাত্রই তিনি শিষ্যকে আকর্ষণ করিতে বাধ্য। না আকর্ষণ করিয়া তাঁহার উপায়ান্তর নাই।

কে গুরু, কোথায় গুরু—এই ভাবনায় যাহার হৃদয় দিবা রাত্রি মথিত হইতেছে, বুঝিতেই হইবে—সদ্‌গুরু লাভের শুভ মুহূর্ত্ত তাহার নিকট হইয়াছে। উষার বেদনামাখা রক্তরাগ প্রকাশিত হইলেই অরুণোদয়ের আর বিলম্ব থাকে না। শ্রীশ্রীঠাকুরের কথায় কালীপ্রসাদ ছিলেন জন্মযোগী।

যাঁহারা জন্মযোগী তাঁহারা বাল্যকাল হইতেই অদ্ভুত মানসিক শক্তির পরিচয় দিয়া থাকেন। সুপবিত্র জীবনধারা, ধর্ম্মলাভের জন্য একাগ্র ইচ্ছা, গুরু লাভের জন্য তীব্র আকুলতা, অখণ্ড মনোযোগ, সর্ব্বদা সৎ চিন্তা ও সৎকথার আলোচনা এবং সৎসঙ্গ প্রভৃতি বাল্যকাল হইতেই জন্ম-যোগীতে দেখিতে পাওয়া যায়। কালীপ্রসাদের জীবনেও আমরা এই সকলের পরিচয় পাই।

কালীপ্রসাদের ভাস্বর প্রতিভা ছিল, সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি ছিল, অপরিমেয় মনোবল ছিল, আর ছিল অতৃপ্ত জ্ঞান-পিপাসা। ইংরাজি ও সংস্কৃত সাহিত্যে সবিশেষ ব্যুৎপত্তি, ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠে নিয়ত আকাঙ্ক্ষা, সুস্থ ও সবল দেহ এসকলই কালীপ্রসাদের ছিল। তাঁহার পিতা ছিলেন নির্ম্মল চরিত্র ধর্ম্মপ্রাণ কুশলী অধ্যাপক, মাতা ছিলেন পরমা ভক্তিমতী। সাধারণ গৃহস্থ

ভদ্রলোকের সচরাচর যেরূপ আর্থিক অবস্থা থাকে পিতার অবস্থাও সেইরূপই ছিল। আবার মাতুলগণ ছিলেন ধনাঢ্য। এইরূপ সাংসারিক সচ্ছল অবস্থায় থাকিয়াও কালীপ্রসাদের যোগীচিত্ত ক্রমেই সংসারে অনাসক্ত হইতেছিল এবং ধর্ম্মালোচনা ও যোগশিক্ষার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল। সংসারে থাকিয়া সংসারী হইয়া নিজের স্বাভাবিক প্রতিভা ও বিদ্যার বলে উচ্চ রাজপদ ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার কামনা তাঁহার হৃদয়ে কখনও উদিত হয় নাই। জলখাবারের পয়সা বাঁচাইয়া অর্থাৎ জলখাবার হইতে স্বেচ্ছায় নিজেকে নিত্য নিত্য বঞ্চিত করিয়া ধর্ম্মগ্রন্থ ক্রয় ও পাঠ একজন কিশোরবয়স্ক ছাত্রের পক্ষে অসাধারণ বলিয়াই বিবেচিত হইবে।

গুরু ও তাঁহার যোগ্য শিষ্যের মধ্যে যে প্রবল টান লোক-চক্ষুর অন্তরালে বর্ত্তমান থাকে, সেই আকর্ষণী শক্তি তখন কালীপ্রসাদকে নিয়ত দক্ষিণেশ্বরের দিকে টানিতেছিল। কুঠির ছাদে উঠিয়া তৎপূর্ব্বেই ঠাকুর আকুলভাবে ডাকিতেন—'আয়রে আয়রে—কোথায় তোরা—আয়!' কালীপ্রসাদ সে আহ্বান শুনিতে পান নাই, কিন্তু তাঁহার হৃদয় তাহা শুনিয়াছিল। তাহারই ফলে তাঁহার হৃদয়ে জাগ্রত হইল একজন যোগী-গুরুর সন্ধানের তীব্র আকাঙ্ক্ষা। তিনি যাহা চাহিতেছিলেন, আচার্য্য শশধরের নিকট তাহা পাইলেন না, অধ্যাপক কালীবর বেদান্তবাগীশের নিকটেও তাহা মিলিল না। সেই

সময়ে তিনি ঠিক বুঝিতে পারুন বা না-ই পারুন, কিন্তু সত্য সত্যই তাঁহার এমন একজন গুরুর প্রয়োজন হইয়াছিল, যিনি তাঁহার অন্তর্নিহিত সুষুপ্ত ভগবৎ শক্তিকে প্রকাশ করিয়া দিতে পারেন। সে শক্তি তখন জাগ্রত হইয়া প্রকাশিত হইবার জন্য যেন ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল। আনুষঙ্গিক সকল ব্যবস্থাই তখন সুসম্পন্ন হইয়াছে, কেবল প্রয়োজন ছিল গুরুরূপী যাদুকরের অঙ্গুলি স্পর্শ! প্রয়োজন ছিল সেই মন্ত্রদ্রষ্টার যিনি নামে শক্তি সঞ্চার করিয়া শিষ্যকে দান করিবেন এবং বলিবেন—এই নে তোর ধর্ম্ম অর্থ-কাম-মোক্ষ—এই নে তোর ইহকালের সর্ব্বস্ব, পরকালের সম্বল। আমি মন্ত্র দিলাম—এখন মন তোর!

কালীপ্রসাদ সেই গুরুর সন্ধান জানিবার জন্য নানা লোকের নিকট তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইলেন, কিন্তু কেহই কিছু বলিতে পারিল না। মনের কথা প্রকাশ করিয়া পিতামাতাকে জিজ্ঞাসা করিতেও সাহসে কুলাইল না—ভয় পাছে তাঁহারা নিবৃত্ত করেন! অন্য দশজনের পিতামাতার মত তাঁহার পিতা-মাতাও তো নিয়ত এই আশাই পোষণ করিয়া আসিতে-ছিলেন যে, অচিরকাল মধ্যেই কালীপ্রসাদের উচ্চ রাজপদ জুটিবে—কালীপ্রসাদও বাঙ্গালা দেশের তথা-কথিত সুপ্রতিষ্ঠিত বাঙ্গালীর মধ্যে একজন হইবে! সেই কালীপ্রসাদের যোগী হইবার দিকে ঝোঁক দেখিলে তাঁহারা যে প্রতিনিবৃত্ত করিবেন ইহা তো স্বাভাবিক।

কালীপ্রসাদ একদিন কথাপ্রসঙ্গে তাঁহার সহপাঠী যজ্ঞেশ্বর ভট্টাচার্য্যকে মনের কথা খুলিয়া বলিলেন। যজ্ঞেশ্বর কহিলেন, দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির কালীবাড়ীতে একজন যোগী আছেন। তাঁহার নাম রামকৃষ্ণ। বহু লোকে তাঁহাকে দর্শন করিতে যায়। তিনি হয় তো যোগ-শিক্ষা দিতে পারেন।

কালীপ্রসাদ হাতে স্বর্গ পাইলেন।



শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

গুরুলাভ

যিনি রাম যিনি কৃষ্ণ—এ যুগে, ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে, তিনিই আবার অবতাররূপে কামারপুকুরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সাধারণ নররূপে আগমন বলিয়া এবার সর্ব্বপ্রকারে তাঁহার নরলীলাই হইয়াছিল। জন্মের পর পিতামাতা তাঁহার নাম রাখিয়াছিলেন গদাধর। পরে সেই নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া হয় শ্রীরামকৃষ্ণ।

উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা জানবাজারের প্রথিতকীর্ত্তি কৈবর্ত্তজাতীয়া রাণী রাসমণির কালীবাড়ী যেদিন গঙ্গাতীরে দক্ষিণেশ্বরে প্রতিষ্ঠিত হইল, সে দিনটি পৃথিবীর ইতিহাসে বরেণ্য হইয়া থাকিবে। সেদিন সেখানে বর্ত্তমান যুগের দেবমানবের লীলাস্থলী সুনির্ম্মিত হইয়াছিল—সেইখানেই আবার নূতন করিয়া প্রমাণিত ও প্রচারিত হইয়াছিল—"ত্রিভুবন মায়ের মূর্ত্তি"—সেইখানেই লীলা করিয়াছিলেন অবতার-বরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণ—সেইখানেই তাঁহার চরণরেণু হইতে উদ্ভূত হইয়াছিলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ, বিবেকানন্দ, অভেদানন্দ প্রভৃতি একাদশটি মহাপুরুষ, যাঁহারা

উত্তরকালে ত্যাগ, সংযম, সন্ন্যাস, সাধনা এবং সাধনার পর সিদ্ধিলাভ করিয়া লোকগঠনে ও জনসেবায় নিজেরাই এক একজন দিক্‌পালরূপে সম্পূজিত হইয়াছিলেন।

গদাধর বা শ্রীরামকৃষ্ণ ইচ্ছা করিয়াই কেতাবী-বিদ্যা বিশেষ কিছু শিখিলেন না। কহিলেন—চাল-কলা-বাঁধা বিদ্যা আমি চাহি না। আমি সেই বিদ্যা চাই যাহাতে ঈশ্বরলাভ হয়।

পরিণত বয়সে তিনি রাণী রাসমণির কালীবাড়ীতে শ্রীশ্রীমা ভবতারিণীর পূজারী ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। ইহা ছিল একটি উপলক্ষ্য মাত্র। তাঁহার সাধনার প্রথম কয়েক বৎসর (১৮৫৩—১৮৬০ খৃষ্টাব্দ) দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গাশিকরসিক্ত নির্জ্জন তপোবনে কাটিয়া গেল। অধিকাংশ ইংরাজি শিক্ষিত বাঙ্গালী তখন ইংরাজের ভাঁড় মাত্র, আবার বঙ্গসমাজ হইতেও তাঁহারা নিজেদের সর্ব্বপ্রকারে দূরে রাখিতে চেষ্টা করিয়া গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতেছিলেন!

দক্ষিণেশ্বরের এই ঠাকুরের ছিল সবই অদ্ভুত। তাঁহার আবির্ভাব অদ্ভুত, বাল্য-যৌবন কৈশোর অদ্ভুত। তাঁহার বাণী অদ্ভুত—বিনা অধ্যয়নে জ্ঞান অদ্ভুত—নিরভিমানিতা ও নির্ভিকতা অদ্ভুত—তাঁহার কাম-কাঞ্চন ত্যাগ অদ্ভুত—প্রেম অদ্ভুত, সহানুভূতি অদ্ভুত, মায়া ছিল না—দয়া অদ্ভুত—তাঁহার সারল্য ও নর-নারীর হৃদয়-জয় অদ্ভুত—আর অদ্ভুত

ইচ্ছা মাত্রেই, স্পর্শ মাত্রেই, দৃষ্টি মাত্রেই অপরের মধ্যে ধর্ম্মভাব জাগরণের শক্তি, আগমন মাত্রেই আগন্তুকের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত দর্শন—আর অদ্ভুত ছিল মানব-কল্যাণের নিমিত্ত নিজেকে দণ্ডে দণ্ডে ক্রুশবিদ্ধ করণ, সকলের পাপ-তাপ নিজে লইয়া তাহাদিগকে ভগবৎ প্রেম প্রদান—সর্ব্বাপেক্ষা অদ্ভুত ছিল তাঁহার সাধনাসিদ্ধ জ্ঞানের প্রকাশ—যত মত তত পথ।

ঠাকুরের সাধনার শেষ হইবার পর যখন তিনি লোক-গুরু হইলেন তখনও ইংরাজী-শিক্ষিত বাঙ্গালীর নিকট—বলিতে গেলে ভারতবাসীর নিকট তিনি অপরিচিতই ছিলেন। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে সেকালের ইঙ্গ-বঙ্গের নেতা ব্রাহ্ম ধর্ম্মাবলম্বী পরম ভক্ত কেশবচন্দ্র সেন তাঁহাকে দর্শন করিয়া 'ইণ্ডিয়ান মিরার' নামক সংবাদপত্রে যে স্তুতি-প্রশস্তি প্রচার করিলেন তাহাই সাধারণ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম প্রকাশরূপে ধরা যাইতে পারে। এই প্রচারের ফলে দক্ষিণেশ্বর বহু লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। ক্রমে অনেকেই জানিতে পাইল যে, দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণ পরমহংস নামে একজন অত্যাশ্চর্য্য যোগী-পুরুষ থাকেন। তখন কলিকাতার নর-নারীর ভিড় লাগিয়া গেল দক্ষিণেশ্বরে; ঠাকুরও মধ্যে মধ্যে কলিকাতার নানা পারিবারিক উৎসবে উপস্থিত হইয়া ভগবৎ প্রেম ও ভগবৎ ভক্তি মুষ্টিতে মুষ্টিতে বিলাইতে লাগিলেন। পাশ্চাত্যের দমকা ঝড় বহুদিন পূর্ব্বেই মন্দীভূত হইয়াছিল, তখন বহিতে লাগিল

শান্ত স্নিগ্ধ সুরভিত মলয়ানীল। বাঙ্গালার 'ইয়ং বেঙ্গল' সেই বাতাসে শ্বাস গ্রহণ করিতে লাগিলেন। এই যোগী শ্রীরামকৃষ্ণের কথাই যজ্ঞেশ্বর যোগশিক্ষার্থী কালীপ্রসাদকে বলিয়াছিলেন।

১৮৮৩ সালের শেষভাগে কালীপ্রসাদ যখন যৌবনের প্রথম সীমারেখায় পদার্পণ করিয়াছেন মাত্র—একদিন এক রবিবারে তিনি নিঃসঙ্গ অবস্থায় প্রভাতে চিৎপুর রোড ধরিয়া যাত্রা করিলেন এবং চেষ্টা করিয়াও যখন সহপাঠী যজ্ঞেশ্বরের বাস-গৃহের সন্ধান করিতে পারিলেন না তখন আর কালবিলম্ব না করিয়া গুরু দর্শনে অগ্রসর হইলেন। কলিকাতা হইতে দক্ষিণেশ্বর কম দূরের পথ নহে। একালের ন্যায় সেকালে সে পথ এত রাজরথ্যায় সুশোভিত ছিল না এবং কতকটা স্থান, বলিতে গেলে বনাকীর্ণও ছিল। গঙ্গাতীরে দক্ষিণেশ্বর—কালীপ্রসাদ শুধু এইটুকুই শুনিয়াছিলেন। কোন্ পথে কতদূর গেলে তাহা পাওয়া যাইবে, সে কথা কালীপ্রসাদ জানিতেন না। নৌকাযোগে দক্ষিণেশ্বরে যাওয়া যাইতে পারে ইহা তিনি জানিতেন, কিন্তু সঙ্গে কিছুই পাথেয় ছিল না। তিনি একবস্ত্রে নগ্নপদে পথ চলিতে লাগিলেন। চলিতে চলিতে সম্মুখে দেখিলেন বাগবাজারের পোল। পোল উত্তীর্ণ হইয়া তিনি সোজা 'বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড' ধরিয়া হাঁটিতে লাগিলেন। যতই অগ্রসর হন, সে দুরন্ত পথ আর শেষ হয় না। ক্রমেই

বেলা বাড়িতে লাগিল। ক্ষুধা ও পিপাসা দেহকে ক্লান্ত করিয়া তুলিল—চরণতলে জ্বালা ধরিল। কালীপ্রসাদ গুরুলাভের জন্য চলিয়াছেন—সেই পরম লাভের কাছে পথের কষ্ট তুচ্ছ বলিয়াই বোধ হইতে লাগিল।

আরও কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর একজন পথিকের নিকট শুনিলেন, তিনি পথ হারাইয়াছেন। তিনি যেখানে আসিয়াছেন উহা 'সাতপুকুর'—দক্ষিণেশ্বর নহে। পথিক পথ নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়া দিল—'আঁড়িয়াদহের ভিতর দিয়া যাও—দক্ষিণেশ্বর পাইবে।' কালীপ্রসাদ হৃষ্টচিত্তে কিছুদূর অগ্রসর হইলেন। কোথায় দক্ষিণেশ্বর? এ পথও তো শেষ হয় না! কালীপ্রসাদ ভাবিতে লাগিলেন, আবার কি পথ হারাইলাম!

কালীপ্রসাদ যেমন চলিতেছিলেন, তেমনি চলিতেই লাগিলেন।

ক্রমে নীচের সূর্য্য মাথার উপর উঠিল—ক্রমে পিপাসায় কণ্ঠ, তালু, জিহ্বা, ওষ্ঠ শুকাইল। তখনও বিশ্রামের জন্য কোন বৃক্ষতলে আশ্রয় না লইয়া তিনি চলিতেই লাগিলেন। হঠাৎ তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল মা'র নবরত্ন মন্দিরের অভ্রভেদী চূড়া। কালীপ্রসাদের হৃদয়ের সমস্ত তপ্ত রক্ত যেন সহসা এক সঙ্গে দেহমধ্যে ছুটিয়া ধাইল। তাঁহার মন বলিয়া উঠিল—দক্ষিণেশ্বর, দক্ষিণেশ্বর—ওই সেই দক্ষিণেশ্বর—শ্রীগুরুর লীলাস্থল। কালীপ্রসাদ হৃদয়ের আবেগে আরও

ক্ষিপ্রপদে চলিলেন এবং উত্তর দিকের সিংহদ্বার দিয়া মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলেন। প্রখর তপন তখন অগ্নিবর্ষণ করিতেছে—অদূরে ভাগীরথীবক্ষে অসংখ্য হীরক জ্বলিতেছে—পঞ্চবটীর পত্রান্তরালে ক্বচিৎ দুই একটি পক্ষী ডাকিতেছে। কালীপ্রসাদের উত্তেজিত মন বলিয়া উঠিল—গুরু গুরু—জয় গুরু। সম্মুখেই শ্রীমন্দিরের একজন কর্ম্ম-সচীবকে পাইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"পরমহংস মশায় কি এখানে আছেন ?"

কর্ম্মসচীব রামলাল চট্টোপাধ্যায়, ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র। তিনি উত্তর দিলেন—"তিনি এখানেই থাকেন। এখন নাই।"

কে যেন কালীপ্রসাদের শিরে বজ্র হানিল! তিনি অপেক্ষাকৃত বিকৃত কণ্ঠে কহিলেন—"না—ই ?"

উত্তর হইল—"না নাই। কলিকাতায় গিয়াছেন। রাত্রে ফিরিবেন।"

কালীপ্রসাদের মুখে আর বাক্য সরিল না। যাঁহার জন্য এত শ্রমকেও তিনি শ্রম বলিয়া মনে করেন নাই, তিনি তবে মন্দিরে নাই! যে প্রবল আকর্ষণ এতক্ষণ তাঁহাকে ভীষণ বেগে টানিতে টানিতে শ্রীমন্দিরে আনিয়াছিল, তাঁহাকে নিতান্ত অসহায় অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া সে আকর্ষণ যেন হঠাৎ পলায়ন করিল! তিনি হতবুদ্ধি হইয়া বারান্দার সিঁড়ির উপর বসিয়া পড়িলেন। কাতর হইয়া ভাবিতে লাগিলেন,

সঙ্গে পাথেয় নাই—বাড়ীতে না বলিয়া-কহিয়া এক বস্ত্রে পলাইয়া আসিয়াছেন—তাহার উপর তীব্র পিপাসা ও দারুণ ক্ষুধা! সেই অবস্থায় কেমন করিয়া কলিকাতায় ফিরিবেন, বার বার সেই কথাই তাঁহার মনে জাগিতে লাগিল। ক্ষত-বিক্ষত চরণে এত পথ আবার কিরূপে হাঁটিবেন সেই চিন্তা তাঁহাকে অত্যন্ত ম্রিয়মান করিয়া তুলিল।

এমন সময় আর একজন যুবক আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"পরমহংস দেব আছেন কি?"

কালীপ্রসাদ কহিলেন—"না এখন নাই। কলিকাতায় গিয়াছেন। রাত্রে আসিতে পারেন।"

আগন্তুক যুবকটি কালীপ্রসাদের পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। এখন কর্ত্তব্য কি সেই বিষয়ে উভয়ের মধ্যে আলোচনা হইতে লাগিল। এই নবাগতের নাম ছিল শশিভূষণ চক্রবর্ত্তী। উত্তরকালে ইনিই শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ শিষ্যদিগের মধ্যে একজন বিশিষ্ট শিষ্যরূপে পরিচিত হইয়াছিলেন। যেরূপ নিষ্ঠার সহিত তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা ও ভোগরাগাদি লইয়া বরাহনগর মঠে দিনের পর দিন অতিবাহিত করিতেন তাহা সে সময়ে মঠের সকল সন্ন্যাসীরই আদর্শ স্থানীয় হইয়াছিল। সন্ন্যাসগ্রহণের পর ইঁহার নাম হইয়াছিল স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ। মান্দ্রাজ প্রদেশকে নিজ কর্ম্মভূমিরূপে নির্ব্বাচিত করিয়া ইনি সেখানে নানাভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের বার্ত্তা প্রচার করিতেন।

পরম ভাগবত রামানুজের সুপবিত্র কাহিনী ইনিই প্রথমে বাঙ্গালা ভাষায় রচনা করিয়া বঙ্গসাহিত্যের অঙ্গপুষ্টি করিয়াছিলেন।

যাহা হউক, কথাপ্রসঙ্গে শশিভূষণ কহিলেন—'তুমি অপরাহ্নে বাড়ী ফিরিবে বলিতেছ, তাহা উচিত নয়। সাধু-দর্শনের এমন সুযোগ ছাড়িতে নাই। আমি তাঁহার সঙ্গে আরও কয়েকবার সাক্ষাৎ করিয়াছি। তিনি কলিকাতায় কাহারও বাড়ীতে রাত্রি বাস করেন না জানি। তিনি নিশ্চয়ই এখানে ফিরিবেন।'

মনের সহিত নানারূপ দ্বন্দ্ব করিয়া কালীপ্রসাদ দক্ষিণেশ্বরে থাকিয়া যাইবারই সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু তাঁহাকে মৌন দেখিয়া শশী কহিলেন—'মৌন কেন? কি ভাবিতেছ?'

কালীপ্রসাদ কহিলেন—'আমি এখানে থাকাই স্থির করিলাম, কিন্তু এখন ক্ষুধার অন্ন পাই কোথায়? আমার সঙ্গে দ্বিতীয় বস্ত্র বা গামছা পর্য্যন্ত নাই।'

শশী মৃদু হাসিয়া কহিলেন—'তাহার জন্য চিন্তা কি? এস, গঙ্গায় স্নান করিয়া আসি। মা ভবতারিণীর মন্দিরে প্রসাদের অভাব নাই, হয়ত একখানি বস্ত্রও মিলিতে পারে।'

উভয়ে তখন গঙ্গাস্নান করিয়া আসিয়া মা'র প্রসাদ গ্রহণ করিলেন এবং ঠাকুরের কক্ষের বারান্দায় বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। দেবতা যেখানে থাকেন সেখানকার বায়ু

তাঁহার দেবহৃদয়জাত পরম প্রশান্তির স্পর্শে সর্ব্বদা শীতল ও পবিত্রই থাকে। সেই কক্ষের সান্নিধ্যের জন্যই হউক অথবা গঙ্গার শীতল সমীর প্রভাবেই হউক, অল্প সময়ের মধ্যেই যুবক কালীপ্রসাদের সকল ক্লান্তি দূর হইয়া গেল—সে ক্লান্তি শুধু তাঁহার দেহের ছিল না—উহা ছিল দেহের ও মনের উভয়েরই। তিনি যেন বুঝিতে পারিলেন, কোন. এক অশরীরীর কোমল করপল্লবের স্পর্শে তাঁহাতে এক নবজীবনের আবির্ভাব হইতেছে—পুরাতন যাহা-কিছু; সবই যেন সেই স্পর্শে ধীরে ধীরে স্খলিত হইয়া যাইতেছে!

বিশ্রাম করিতে করিতে কালীপ্রসাদ মানস-নয়নে যোগী-গুরুর একটি মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া লইলেন। সে মূর্ত্তির মস্তক আচ্ছাদিত করিয়া ঘন পিঙ্গল জটাভার বিলম্বিত হইল, ভালে রক্তচন্দনের ত্রিপুণ্ড্রক শোভা পাইল, দেহখানি ভস্মে আচ্ছাদিত হইল, কটীতটে বিলম্বিত হইল একখানি অপরিচ্ছন্ন মলিন কৌপীন। যোগীর সবল করে রহিল একটি বৃহৎ ও সূক্ষ্মাগ্র লৌহ চিম্‌টা। কালীপ্রসাদ যেন শুনিতে পাইলেন, চিম্‌টার সুদৃঢ় লৌহ বলয়গুলি মধ্যে মধ্যে ঝনৎকার দিতেছে! কালী-প্রসাদ যোগীগুরুর আরক্ত চক্ষু, কণ্ঠে বিলম্বিত কর্কশ রুদ্রাক্ষ মালা এবং আনাভিবিস্তৃত নিবিড় শ্মশ্রুরাশি দেখিয়া চমকিত হইয়া উঠিলেন! এমন সময় তাঁহার সেই দিবা-স্বপ্ন ভঙ্গ করিয়া কালীমন্দিরে আরাত্রিকের বাদ্য বাজিয়া উঠিল।

সমবেত ভক্তমণ্ডলী যুক্ত করে ডাকিতে লাগিলেন—জয় মা, জয় মা!

শশী ও কালীপ্রসাদ দেবীর আরতি দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং পুনরায় আসিয়া ঠাকুরের কক্ষের বারান্দায় উপবেশন করিলেন। সন্ধ্যা অতিক্রান্ত হইয়া রাত্রির প্রথম প্রহর যতই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, কল্পনায় দৃষ্ট সেই ভীষণকায় উন্নত বপু যোগী-গুরুর সম্মুখে উপস্থিত হইবার সময় ততই সন্নিকট হইতেছে দেখিয়া কালীপ্রসাদ সত্য সত্যই একটু ভীত ও চঞ্চল হইয়া পড়িলেন, কিন্তু আগন্তুক বন্ধু শশীর নিকটে সে ভয়ের কথা প্রকাশ করিতে পারিলেন না।

এমন সময় কালীবাড়ীর প্রাঙ্গণ মুখরিত করিয়া একখানি জীর্ণ অশ্বযান শব্দ করিতে করিতে প্রবেশ করিল এবং ঠাকুরের কক্ষের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। ঠাকুর তাঁহার সেবক লাটুকে লইয়া ঘরে প্রবেশ করিতে করিতে তিনবার গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন—"কালী, কালী, কালী!" এইরূপ বলিবার কারণ কিছুই অনুমান করা যায় না। কালীপ্রসাদের আগমন-সংবাদ যে তিনি মানস-শক্তি বলে জানিতে পারিয়াছেন, হয়ত তিনবার "কালী কালী" বলা তাহারই দ্যোতক, অথবা ঠাকুর সমস্ত দিবস পরে নির্ব্বিঘ্নে শ্রীমন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন এবং আপন কক্ষে প্রবেশ করিতেছেন বলিয়াই হয়ত জগন্মাতাকে স্মরণ করিলেন।

কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত কালীপ্রসাদ যেন বিহ্বল হইয়া রহিলেন। তবে কি যোগী-গুরু এই গাড়ীতে আসেন নাই? যিনি এই মাত্র কক্ষে প্রবেশ করিলেন, তিনি তো জটা-জুট-শ্মশ্রু-চিম্‌টা-কমণ্ডলুধারী সন্ন্যাসী নহেন!

কালীপ্রসাদের চমক ভাঙ্গিয়া মার পূজারী রামলাল আসিয়া কহিলেন—"পরমহংসদেব আপনাকে ডাকিতেছেন।"

কালীপ্রসাদ বিস্ময়বিজড়িত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—"পরমহংসদেব!"

তাঁহার হৃদয়শোণিত চন্‌ চন্‌ করিয়া ছুটিয়া থাইল। ধীরে ধীরে কক্ষে প্রবেশ করিয়া তিনি দেখিলেন, জীবন্ত করুণার প্রস্রবণ যেন নরমূর্ত্তি লইয়া তক্তাপোষের উপর বসিয়া আছেন। তাঁহার মস্তকে জটাভার নাই, আছে—সাধারণ কেশ-কলাপ। কটিতে কৌপীনও নাই, গৈরিক বহির্ব্বাসও নাই! পরিধানে আছে লাল পেড়ে সুপরিচ্ছন্ন একখানি সাদা ধুতি এবং দেহে কালো বর্ণের একটি জামা। কোঁচার খুঁটটি স্কন্ধের উপর বিলম্বিত রহিয়াছে। মুখমণ্ডল দীর্ঘাকার রুক্ষ শ্মশ্রুতে আচ্ছাদিত নহে, ভদ্রজনোচিত গুম্ফ ও দাড়ীতে সুশোভিত। দেহে ভস্মের চিহ্নমাত্রও কুত্রাপি দেখা যায় না! আবার যে তক্তাপোষের উপর বসিয়া আছেন তাহার উপর একটি শুভ্র শয্যা সুবিস্তৃত রহিয়াছে—শয্যার উপর তাকিয়া! কক্ষের কোন্ স্থানেই নির্ব্বাপিত বা সাগ্নিক হোমকুণ্ড নাই, বল্কল বা

বাঘছাল কিছুই নাই। না আছে গড়্গিকা, না আছে উহা সেবনোপযোগী অন্যান্য আয়োজন!

কালীপ্রসাদ ভাবিতে লাগিলেন—ইনি তবে কিরূপ সাধু—কিরূপ পরমহংস? এ তবে কাহার নিকটে আসিলাম—যেন একটি মোমের পুত্তলী, হস্তপদ সঞ্চালন করিতে গেলে এখনই খান্ খান্ হইয়া ভাঙ্গিয়া যাইবে! এ-যেন একটি সদ্য প্রস্ফুটিত কুসুমস্তবক—বায়ুর হিল্লোলেই বুঝি ছিন্ন হইবে! কালীপ্রসাদের মন যাহাই বলুক্, কিন্তু মস্তকটি অমনি নামিয়া পড়িল সেই দিব্য পুরুষের চরণের উপর।

সাধু-সন্ন্যাসীদিগের সম্বন্ধে সাধারণের যে ধারণা আছে কোনও ব্যক্তিতে তাহার একটু ব্যতিক্রম দেখিলেই লোকের মনে অবিশ্বাস আসিয়া পড়ে! লোকে ভাবে না যে, সাধু-সন্ন্যাসী মনে—দেহে বা ভূষণে নহে। তাই সেকালে ঠাকুরের বেশভূষা দেখিয়াই অনেকে অনেক রকম কথা বলিত! আমরা নিজেরাই ভণ্ড তাই ভণ্ডের চক্ষে যাহা দেখি তাহাতেই ভণ্ডামীর ছাপ লাগিয়া যায়! আমরা নিজেরাই অপবিত্র তাই ভাগীরথীবক্ষে ভাসমান আবর্জ্জনার রাশি দেখিয়া মনে করি, গঙ্গা মলিনা পঙ্কিলসলিলা। একটিবারও ভাবিয়া দেখি না যে, বহু আবর্জ্জনাকে ধুইয়া লইয়া চলিয়াছেন বলিয়াই গঙ্গা পতিত পাবনী। নীল চশমার ভিতর দিয়া দেখিলে অগ্নিতুল্য সূর্য্যদেবকেও মলিন বলিয়াই মনে হয়!

কালীপ্রসাদ ভক্তিভরে প্রণাম করিলে পর ঠাকুর স্নেহ-মধুর কণ্ঠে তাঁহাকে মেঝের উপর বিস্তৃত মাতুরে উপবেশন করিতে বলিয়া পরিচয়াদি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন এবং কহিলেন—'এত অল্প বয়সে তোমার যোগ-সাধনের ইচ্ছা হইয়াছে ইহা খুবই ভাল। তুমি পূর্ব্ব জন্মে একজন বড় যোগী ছিলে। আমি তোমাকে যোগ শিক্ষা দিব। আজ বিশ্রাম কর। কাল প্রাতে এসো।'

কালীপ্রসাদের মন তখন এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দের সাগরে ভাসিতেছিল। মনুষ্যকণ্ঠে যে আছে এত কোমলতা তাহা তিনি জানিতেন না। কালীপ্রসাদের মনে হইতে লাগিল যেন ঠাকুরের স্বল্পাক্ষর কয়েকটি কথা তাঁহার কর্ণে মধু বর্ষণ করিল—তাঁহার পিতামাতার কণ্ঠও তো এত স্নেহ-মধুর নহে! স্বতঃই তাঁহার মনে হইতে লাগিল—যোগ শিক্ষা করিতে পারি বা না পারি, কিন্তু এই মহাপুরুষ দর্শনে আজ জীবন ধন্য হইল—জন্ম সার্থক হইল। শ্রীপাদপদ্মের ধূলি দুই করে শিরে তুলিয়া মুগ্ধ কালীপ্রসাদ কক্ষের বারান্দায় বিস্তৃত মাতুরের উপর শয়ন করিলেন।

দণ্ডের পর দণ্ড যাইতে লাগিল, কিন্তু কালীপ্রসাদের চক্ষের পাতা জুড়িল না। কিসের যেন একটা বিপুল উচ্ছ্বাস বায়ু-তাড়িত সাগর-তরঙ্গের মত তাঁহার হৃদয়মধ্যে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল! সে উচ্ছ্বাসে সুখ ছিল, না দুঃখ ছিল,

না আর কিছু ছিল কালীপ্রসাদ তাহা বুঝিতে পারিলেন না। চক্ষু চাহিয়া চক্ষু বন্ধ করিয়া তিনি কেবলই দেখিতে লাগিলেন সেই অত্যদ্ভুত পরমহংসদেবের করুণামাখা দেবমূর্ত্তিটি। তাঁহার কর্ণকুহরে নিরন্তর বাজিতে লাগিল স্নেহাভিষিঞ্চিত সেই প্রথম সম্ভাষণটি—"তুমি আমার কাছে কি চাও যুবক ?"

কালীপ্রসাদের শয্যাকণ্টক না ঘটাইয়া সেই বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত হইয়া গেল। মন্দিরে প্রভাতী বাজিতে লাগিল। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান করিয়া কালীপ্রসাদ গঙ্গার শীতল সলিলে অবগাহন করিলেন। মনে হইল যেন দেহ ও মন পরিশুদ্ধ হইয়া গেল। আগেও তো তিনি কত দিন গঙ্গাস্নান করিয়াছেন, তাঁহার সবল বাহুযুগের তাড়নে গঙ্গাসলিল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া কত ইন্দ্রধনুর সৃষ্টি করিয়াছে, কিন্তু আজিকার মনের মত এই ভাব তো তখন হইত না। সহসা সাম্রাজ্য লাভের অজস্র সম্ভাবনা দেখিলে ভিখারীর মনে যে ভাব হয়, আজ কালীপ্রসাদের মনে সেইরূপই ভাবান্তর উপস্থিত হইল। চক্ষুর সম্মুখে কেবলই ভাসিতে লাগিল পরমহংসদেবের জ্যোতির্ম্ময় শ্রীমূর্ত্তিখানি।

কালীপ্রসাদ স্নানান্তে ভীতি-বিহ্বল চিত্তে নহে, পরমপ্রীতি-প্রফুল্ল হৃদয়ে ঠাকুরের সম্মুখে আসিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে শিরোলুণ্ঠন করিলেন। ঠাকুর পুনরায় তাঁহার জীবন-কথা শুনিতে লাগিলেন। সে ছিল শুধু নিরবিচ্ছিন্ন অধ্যয়নের

কাহিনী। সকল কথা শুনিয়া ঠাকুর পরমানন্দে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন—'তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হউক।'

ঠাকুরের আদেশে কালীপ্রসাদ সেই কক্ষের উত্তর দিকের বারান্দায় যাইয়া তক্তাপোষের উপর বসিলেন। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ তখন স্বকরের মধ্যমাঙ্গুলি দিয়া কালীপ্রসাদের জিহ্বার উপর সাধনার বীজমন্ত্রটি লিখিয়া দিয়া দক্ষিণ হস্তে বক্ষস্থল স্পর্শ করিলেন। তখন কেমন করিয়া যে কি হইল তাহা যে বুঝে, সে শুধু নিজের উপলব্ধির দ্বারাই বুঝে, আর বুঝে না যে, তাহাকে কেহ বলিয়া বুঝাইতে পারে না !

কালীপ্রসাদ ধীরে ধীরে বাহ্যজ্ঞান হারাইতে লাগিলেন। ক্রমে দেহখানি কাষ্ঠবৎ হইয়া পড়িল—নিশ্চল হইল—যেন নির্বাত নিষ্কম্প প্রদীপ। এই ভাব যখন গভীর হইতে গভীরতর হইতে লাগিল তখন বিশ্ব তাহার রচনা-সম্ভার লইয়া কোথায় যে অন্তর্হিত হইয়া গেল, কালীপ্রসাদ তাহা বুঝিতে পারিলেন না। 'শুধুই মনে হইতে লাগিল, যেখানে আসিলাম সে যেন আনন্দ - আনন্দ—কেবলই আনন্দ।

কালীপ্রসাদ সচ্চিদানন্দ-সাগরে নিমজ্জিত হইলেন। ঠাকুর তখন সস্মিত হাস্যে সেই নিমীলিতনেত্র সমাধিমগ্ন যুবকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

এই সমাধি অবস্থা যে কি তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিবার

জন্য স্বামী বিবেকানন্দ এক খানি গীত রচনা করিয়া গাহিতেন—

নাহি সূর্য্য নাহি জ্যোতিঃ নাহি শশাঙ্ক সুন্দর।
ভাসে ব্যোমে ছায়া সম ছবি বিশ্ব চরাচর॥
অস্ফুট মন আকাশে, জগত-সংসার ভাসে,
ওঠে ভাসে, ডোবে পুনঃ অহং স্রোতে নিরন্তর।
ধীরে ধীরে ছায়া দল, মহালয়ে প্রবেশিল,
বহে মাত্র 'আমি' 'আমি' এই ধারা অনুক্ষণ।
সে ধারাও বন্ধ হলো, শূন্যে শূন্য মিলাইল।
অবাঙ্‌মনসোগোচরম্, বোঝে প্রাণ বোঝে যার॥

কিছুক্ষণ পর ঠাকুর যখন আবার কালীপ্রসাদের বক্ষদেশ স্পর্শ করিলেন তখন ধীরে ধীরে তাঁহার জ্ঞান ফিরিতে লাগিল। তিনি নয়ন মেলিলেন এবং এতক্ষণ কি কি অনুভব করিতেছিলেন তাহা বর্ণনা করিলেন।

সকল কথা শুনিয়া ঠাকুর বলিলেন—"তোমার কি বিবাহ করিবার ইচ্ছা আছে?"

কালীপ্রসাদ কহিলেন—"না।"

ঠাকুর বলিলেন—"তবে বিবাহ করিও না।"

উত্তরকালে কালীপ্রসাদ যখন লোক-গুরু হইয়াছিলেন তখন একদিন বিবাহ ও সৃষ্টিরক্ষা এই প্রসঙ্গে শিষ্য কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিয়াছিলেন যে, যাঁহার সৃষ্টি তিনিই তাহা

দেখিবেন। সৃষ্টির কর্ত্তাকে জানিবার চেষ্টা করাই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। লক্ষ লক্ষ সৌরজগৎ যিনি প্রতি মুহূর্ত্তে সৃষ্টি করিতে পারেন, তাঁহার সৃষ্টি কখনও লুপ্ত হইতে পারে না। এই মহা অনন্ত ব্যোমে মানুষ কতটুকু, আর তার শক্তিই বা কতটুকু যে, তাঁহার সৃষ্টি রক্ষা করার স্পর্দ্ধা করে! 'একোঽহং বহুস্যাম' ভাবে তিনি যেমন সৃষ্টির প্রথমে বহু হইয়াছিলেন, সেই রকম ভাবে তিনি অনন্তকাল বহু হইয়া লীলা করিবেন।

অন্যদিন সেই শিষ্যকেই মহারাজ বলিয়াছিলেন যে, এখনকার বিবাহ যেন—মাগুর মাছ জিইয়ে রাখা! যখন ইচ্ছা হবে তখনই তাকে খাবে! এখন পুরুষেরা বিবাহ করিয়া মেয়েকে চিরকালের জন্য দাসী করিয়া রাখে, আর যখন ইচ্ছা তখন যথেচ্ছাচারী হইয়া স্ত্রীকে ভোগ করে। এই কি বিবাহের আদর্শ? পূর্ব্বে ছিল স্ত্রী সহধর্ম্মিণী, এখন সে হয়েছে সহশায়িনী!

তিনি বলিতেন, যদি কেহ বলে যে বিবাহ না হইলে নর-জীবনের পূর্ণতা হয় না, তাহা ভ্রম মাত্র। প্রত্যেকেই পূর্ণ। পূর্ণকে পরিপূর্ণ করা যায় না। আত্মায় আত্মায় যে মিলন—যেমন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ও সারদামাতার হইয়াছিল, তাহারই নাম বিবাহ। উহা দেহ-সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া ভোগের জন্য মিলন নহে।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ মন্ত্রদানপূর্ব্বক কালীপ্রসাদকে বিবাহ করিতে নিষেধ করিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে সেইদিন হইতেই তাঁহার সন্ন্যাস আরম্ভ হইয়াছিল। মনে তিনি পূর্ব্ব হইতেই সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন বলিয়া যোগীগুরুর সন্ধান করিতেছিলেন। আজ সেই পরমগুরুর শ্রীচরণে তিনি সর্ব্বস্ব বিকাইলেন—পিতা-মাতা, সংসার-ধর্ম্ম, বিবাহ-বন্ধন, অর্থ উপার্জ্জন প্রভৃতি যাহা-কিছু সবই যোগী-গুরুর চরণে অর্পণ করিয়া তিনি শেষে নিজেকেই পূর্ণাহুতি দিলেন।

সমাধির আনন্দে তাঁহার চিত্ত তখন কানায় কানায় পরিপূর্ণ হইয়াছে। তিনি তো তখন জানিতেন না যে, ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য কি। কিন্তু উহা যে নূতন একটা কিছু, উহা যে বর্ণনাতীত মনোহর একটা কিছু—উহা যে সাংসারিক সুখ, সুখের পরিতৃপ্তি—লোকে যে বস্তুকে সংসারে পরমানন্দ বলিয়া তাহারই চরণে প্রাণ বলি দেয়—আজ তিনি যাহার আস্বাদ পাইলেন তাহা যে সে সকল অপেক্ষা কত শত গুণে বেশী কাম্য, বেশী আনন্দদায়ক তাহা বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না। যে পরমগুরুর অহেতুক কৃপায়, তিনি আজ সেই অপূর্ব্ব অনুভূতিটি লাভ করিলেন, তাঁহার অন্তরের সকল ভক্তি ও শ্রদ্ধা যেন দণ্ডেকের মধ্যেই গলিয়া জল হইয়া সেই গুরুর পাদপদ্ম ধোয়াইতে লাগিল। শুধু এই কথাই তাঁহার বার বার মনে হইতে লাগিল—আজ আমি এ-কি পাইলাম, এ-কি

উপভোগ করিলাম—হৃদয়ের রুদ্ধদ্বার সবলে মুক্ত করিয়া কিসের এই অনির্ব্বচনীয়, মধু হইতেও মধুর, গঙ্গাবারি হইতেও পবিত্র, ইন্দ্রধনু অপেক্ষাও বিচিত্র—কেমন করিয়া বলিব কেমন সেই অনুভূতি, হিল্লোলে হিল্লোলে শারদচন্দ্রিমার তরঙ্গে তরঙ্গে অন্তরে প্রবেশ করিল! কি করিলে আবার উহা পাইব? একবার যদি পাইলাম তবে উহা হারাইলাম কেন?

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ করুণাপ্লুত নয়নে যুবক শিষ্যের মুখের দিকে চাহিয়াছিলেন; তাহার অন্তরের পরতে পরতে কোথায় কি লুক্কায়িত আছে, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহাই দেখিতেছিলেন, তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া যাচাই করিয়া বাজাইয়া লইতেছিলেন। মুহূর্ত্তে তিনি দেখিতে পাইলেন শিষ্যটি যোগীশ্রেষ্ঠ —একটি অনাঘ্রাত সুরভিত শুভ্র পবিত্র কুসুম—দেবতার পূজাবেদীতে স্থান পাইবার যোগ্য অধিকারী।

শ্রীপ্রভু তখন একান্ত কোমল ও মধুর কণ্ঠে ধ্যানের নিয়মাদি এবং সমাধি সম্পর্কে নানা গূঢ় তত্ত্ব বুঝাইয়া দিয়া তিনি কহিলেন—

শুচি অশুচিরে লয়ে দিব্য ঘরে কবে শুবি।
দুই সতীনে পিরিত হ'লে তবে শ্যামা মাকে পাবি।

যাও বৎস, এই অভেদ মন্ত্র হৃদয়ে রাখিয়া কালীঘরে যাইয়া কিছুক্ষণ ধ্যান কর।

আদিষ্টবৎ ধ্যানান্তে যখন তাঁহার কলিকাতায় ফিরিবার

সময় হইল তখন তিনি ভক্তিবিনম্র হৃদয়ে আসিয়া ঠাকুরের নিকট দাঁড়াইলেন। ঠাকুর কহিলেন—"তুমি আবার এসো। শেয়ারের নৌকা কিম্বা গাড়ী করিয়া এখানে আসিবার সুবিধা আছে।"

কালীপ্রসাদের আর ফিরিয়া যাইবার ইচ্ছা হইতেছিল না। কিন্তু না যাইয়াও তো উপায় ছিল না—কালীমন্দিরে কি আর কেহ তাঁহাকে থাকিতে দিবে? তাঁহার মুখে বাক্য সরিতে ছিল না। বহু পুণ্যফলে অমৃতসিন্ধুর তটে আসিয়া কি কেহ আবার মরু-প্রান্তরে ফিরিয়া যাইতে চাহে? কালীপ্রসাদ কহিলেন—"ভাড়া যদি যোগাড় করিতে না পারি?"

সকল সমস্যার সমাধান করিয়া উত্তরে ঠাকুর বলিলেন—"তার জন্য কি! এখান হইতে তোমার যাতায়াতের ভাড়া দেওয়া হইবে।"

কালীপ্রসাদের উদ্বেলিত চিত্ত তখন যেন শুধু এই কথাই বলিয়া উঠিল—চমৎকার! মানুষের দয়ার শেষ আছে—দেবতার দয়া অশেষ।

কালীপ্রসাদ ক্ষুণ্ণ মনে কলিকাতায় ফিরিলেন।

তিনি বাড়ীতে কাহাকেও না বলিয়া দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া রাত্রিবাস করিয়া গেলেন। যখন আসিয়াছিলেন, তখন জানিতেন যোগশিক্ষা করিবার দুই একটি উপদেশ মাত্র লইয়াই সেদিনের মত ফিরিয়া যাইবেন, যেমন প্রত্যহই ফিরিতেন

কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের আবাস-গৃহ হইতে। কিন্তু আসিয়াই দেখিলেন, সিংহ জালে বদ্ধ হইয়াছে! মন বুঝিল, কলিকাতায় ফিরিয়া যাওয়াই উচিত—নহিলে পিতা-মাতার উদ্বেগের পরিসীমা থাকিবে না, কিন্তু প্রাণ তাহা বুঝিল না। প্রাণ বুঝিল—পিতা-মাতা যদি উদ্বিগ্ন হন, হউন। যোগীগুরুর পদধূলি না লইয়া যাওয়া হইবে না। কালীপ্রসাদ জীবনে এই প্রথমবার গৃহ হইতে পলাতক হইয়াছিলেন, এই প্রথম রাত্রি গৃহ হইতে বহুদূরে স্থানান্তরে অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

সেদিন মধ্যাহ্ন গেল, অপরাহ্ণ কাটিল, সন্ধ্যা অতিক্রান্ত হইয়া রাত্রি আসিল, রাত্রিরও প্রহর যাইতে লাগিল। তাঁহাকে না দেখিয়া মাতা নয়নতারা অধীরা হইলেন, ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া তাঁহার মাতৃহৃদয় ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ও রক্তাক্ত হইয়া উঠিল। রসিক মাষ্টার মহাশয় আকুলচিত্তে পল্লীতে পল্লীতে, গঙ্গার তীরে তীরে কালীপ্রসাদের সন্ধান করিয়া তাঁহাকে না পাইয়া শেষে দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া শুনিলেন, কিছুক্ষণ পূর্ব্বেই কালীপ্রসাদ একজন ভক্তের গাড়ীতে উঠিয়া কলিকাতায় গিয়াছেন।

সংবাদ শুনিয়া তিনি নিরুদ্বিগ্ন হইলেন এবং যাহাতে ভবিষ্যতে আর এরূপ না ঘটে সেই জন্য ঠাকুরকে কহিলেন—'মহাশয়, কালীপ্রসাদ যাহাতে শীঘ্রই বিবাহ করে আপনি তাহাকে সেইরূপ আদেশ দিবেন।

ঠাকুর গম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন—"দেখিলাম, আপনার পুত্র একজন যোগীশ্রেষ্ঠ। বিবাহ করিতে তাহার আদৌ ইচ্ছা নাই। বলপূর্ব্বক বিবাহ দিলে কি তাহার ফল ভাল হইবে ?"

মাষ্টার মহাশয় বলিলেন—"পিতা মাতার সেবা করাই তো পুত্রের প্রধান ধর্ম্ম।"

ঠাকুর মৃদুমন্দ হাসিলেন, বলিলেন—"হাঁ সে কথা তো ঠিক।"

রসিক মাষ্টার মহাশয়, তখন নিশ্চিন্তে গৃহে ফিরিলেন। ভাবিলেন যাক্, কালীপ্রসাদ যে আবার গৃহত্যাগ করিবে সে আশঙ্কা আর নাই! পরমহংস দেব নিশ্চয়ই তাহাকে পিতা-মাতার সেবা করিতেই আদেশ দিবেন।

ঠাকুর কালীপ্রসাদকে সেই আদেশই দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে-ত ছিলনা পার্থিব পিতা-মাতার সেবা করিবার আদেশ। সে ছিল জগৎপিতার ও জগৎমাতার সেবা করিবার অনুজ্ঞা। কালীপ্রসাদ জীবনান্ত কাল পর্য্যন্ত ঠাকুরের সেই অনুজ্ঞাটি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া গিয়াছেন।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের লীলা কাহিনী যে গ্রন্থে সর্ব্বপ্রথমে পদ্যে প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার নাম শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি। ১৩৩১ সালে এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। উহাতে কালীপ্রসাদ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে—(২)

---

(২) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি—শ্রীঅক্ষয় কুমার সেন। ২য় সংস্করণ (উদ্বোধন)—১৩৩১। ৫০০—৫০১ পৃষ্ঠা।

প্রথম বণিক-সুত বহুবিধ গুণ যুত
স্বভাবতঃ বৈরাগ্য প্রবল।
বিত্তার্জ্জনে পাঠ-প্রিয় কুমার বালক বয়ঃ
শিশু সম অন্তর সরল॥
নবীনে প্রবীণ বুদ্ধি জন্মাবধি চিত্ত-শুদ্ধি
সাংসারিক ভাব নাই মনে।
ঋষি-বালকের ধারা যেন তু'দিনের পারা
বাস করে সংসার-আশ্রমে॥
কালী চন্দ্র তাঁর নাম পিতা-মাতা বর্ত্তমান
জন্ম স্থান আহিরিটোলায়।
সময় আগত দেখি বিম্বাধর বাকা আঁখি
প্রভু-দেব আকর্ষিলা তাঁয়॥
এবা কিবা আকর্ষণ বলিবার নহে মন
প্রণিধান কর নিজ মনে।
দেখ কেবা পায় টের বারি রাশি সাগরের
শূন্যে চলে বিমানে বিমানে॥
আকর্ষিত যেই জনা তাহারও নাহিক জানা
অন্যে কে জানিবে সমাচার।
কারণ ক্ষণিক চলে বিচার-বুদ্ধির বলে
তার পরে অবোধ্য ব্যাপার॥

* * * *

মহাত্যাগী ভক্তবর কালী চন্দ্র গুণধর
সম্মিলন শ্রীভুর সনে।
পিতা মাতা ঘর বাড়ী ইহ সুখ পরিহরি
মজিলেন প্রভুর চরণে॥

কালীপ্রসাদ যে বয়সে ঠাকুরের কৃপা লাভ করিয়াছিলেন, সমসাময়িক ভক্ত অক্ষয়কুমার বলিয়াছেন তখনই তাঁহার "নবীনে প্রবীণ বুদ্ধি," মনে তখন সন্ন্যাস আরম্ভ হইয়াছে—তিনি তখনই "মহাত্যাগী" এবং "ভক্ত" এবং সেই সময়েই "পিতা-মাতা ঘর-বাড়ী ইহ-সুখ" তাঁহার মন হইতে দূর হইয়া গিয়াছে। বলিতে গেলে, তাঁহার সন্ন্যাস তখনই আরম্ভ হইয়াছিল। সেই কথা মনে মনে উপলব্ধি করিয়া ঠাকুর তাঁহাকে আর বেশী দিন গৃহে থাকিতে দেন নাই, প্রবল আকর্ষণে নিজের নিকটে টানিয়া আনিয়াছিলেন, কারণ কালীপ্রসাদ ছিলেন তাঁহার একজন পূর্ব্বচিহ্নিত পার্ষদ। তিনি ছিলেন "ঋষিবালকের" মত শান্ত, শুদ্ধ ও সত্ত্বপ্রধান, শিশুবৎ সরল, মনে "সাংসারিক ভাব" হীন অর্থাৎ অনাসক্ত এবং স্বভাবতঃ বৈরাগ্যপ্রবল।" ঠাকুরের কৃপা পাইবার পর কর্ম্মবন্ধন তাঁহাকে যে কয়েকটি দিন পিতা-মাতার নিকটে থাকিতে বাধ্য করিয়াছিল, তিনি সেই স্বল্প মাত্র কয়েকটি দিনই পিতৃগৃহে রহিলেন। ঠাকুরকে যেদিন চিকিৎসার জন্য শ্যামপুকুরে আনা হয় (১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ) সেই দিন হইতে

মহাসমাধি পর্য্যন্ত কালীপ্রসাদ গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীরূপেই ঠাকুরের সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন। সে সময় তাঁহার বয়স ছিল ন্যূনাধিক ঊনবিংশ বর্ষ মাত্র। ঠাকুরের নিকটে কালীপ্রসাদের দক্ষিণেশ্বরে আগমনকালে, অক্ষয় কুমার বলিয়াছেন, তখন তাঁহার "কুমার বালক বয়ঃ।" সুতরাং প্রকৃত প্রস্তাবে কালীপ্রসাদ ছিলেন কৌমারেই সন্ন্যাসী এবং বুদ্ধিতে প্রবীণ!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

আত্ম-প্রস্তুতি

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপায় সেকালে দক্ষিণেশ্বর মহাপুরুষ-গঠনের আশ্রম হইয়াছিল। ইঁহাদিগের মধ্যে কেহ বা হইয়াছিলেন গৃহত্যাগী সংন্যাসী এবং ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ভক্ত, আর কেহ বা হইয়াছিলেন ত্যাগী গৃহস্থ ভক্ত। ইঁহারা প্রত্যেকেই আপন আপন কর্ম্মক্ষেত্রে বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালীরও যে একটি যুগ আসিয়াছে এবং সেই যুগের বাণীকেও যে অবহিত হইয়া শ্রবণ এবং গ্রহণ করিতে হইবে, প্রাচ্যের এই ঘোষণা-বাণী যাঁহারা প্রথমে পাশ্চাত্যে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন এবং বেদান্তের পাঞ্চজন্য মুখে অকুতোভয়ে ও সগৌরবে তাহা প্রচার করিয়াছিলেন, তাঁহারা ছিলেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের সন্তান—স্বামী বিবেকানন্দ (নরেন্দ্রনাথ), স্বামী সারদানন্দ (শরৎ মহারাজ) এবং স্বামী অভেদানন্দ (কালীপ্রসাদ)। স্বামী বিবেকানন্দ যেমন শুধু "স্বামীজি" নামেই সর্ব্বদা পরিচিত, স্বামী অভেদানন্দও তেমনি তাঁহার ভক্ত-সন্তানগণের মধ্যে শুধু "স্বামীজি-মহারাজ" নামেই অভিহিত হইয়া থাকেন। তবে এই গ্রন্থের নানা স্থানে আমরা তাঁহাকে শুধু "মহারাজ" নামেই অভিহিত করিয়াছি।

ধ্যান সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণ মুমুক্ষুদিগকে সর্ব্বদা উপদেশ দিতেন যে, "ধ্যান এমন করবে যে, তাতে একেবারে তন্ময় হ'য়ে যাবে—Dilute হ'য়ে যাবে। ধ্যানের অবস্থা কি রকম জানো ? তৈলধারার ন্যায় মনটা হ'য়ে যায়। এক ঈশ্বর চিন্তা ছাড়া আর কোনও চিন্তা তার ভিতরে আস্‌বে না। ধ্যান করিবার সময় তাঁতে মগ্ন হ'তে হয়।" ধ্যান সম্বন্ধে এইরূপ কোনও উপদেশ-বাণী সম্বল করিয়া মহারাজ দক্ষিণেশ্বর হইতে গৃহে ফিরিলেন। ধ্যান ধ্যান—কেবলই ধ্যান—তখন ইহাই হইল তাঁহার একমাত্র চিন্তা একমাত্র কর্ম্ম।

গৃহে আসিয়া তিনি শ্রীগুরুর আদেশানুবর্ত্তী হইয়া রাত্রি-কালে শয়নকক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিতেন এবং শয্যাতেই ধ্যানে বসিয়া অল্পকালের মধ্যেই তন্ময় হইয়া যাইতেন। কোন্ ফাঁক দিয়া যে রাত্রি পলায়ন করিয়াছে এবং কক্ষমধ্যে উষা প্রবেশ করিয়াছে, এক এক দিন তিনি তাহাও জানিতে পাইতেন না! ধ্যানে মগ্ন থাকিতে থাকিতে কোন কোন দিন দেখিতেন, তাঁহার নয়ন সমক্ষে নানা দেব-দেবীর জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তিগুলি ভাসিয়া উঠিতেছে। কয়েক দিন যাইতে না যাইতেই তিনি দেখিতে লাগিলেন, দেব-দেবীর মূর্ত্তিগুলি যেন জীবন্ত, যেন গতিশীল—কেহ কেহ বা একটু হাসিতেছেন, কেহ বা স্থির নেত্রে চাহিয়া আছেন, বদনে ফুটিয়া উঠিয়াছে এক মধুর স্নিগ্ধ প্রশান্তি। কখনও তাঁহার মনে হইত, ঈষৎ নীলাভ

অথচ শুভ্র একটি জ্যোতি—ঠিক জ্যোতিও নহে, তরল জ্যোতির একটি আকাশ যেন চক্ষুর সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। ইহাকেই যোগশাস্ত্রে "বিশোকা বা জ্যোতিষ্মতী" বলা হইয়াছে। চিত্ত যখন স্থৈর্য্যতা প্রাপ্ত হইতেছে তখনই এই শুভ্র স্বচ্ছ তরঙ্গহীন আকাশকল্প প্রকাশ-সত্ত্বার প্রত্যক্ষ দর্শন হইতে থাকে। তন্ত্র শাস্ত্রে কুলকুণ্ডলিনীর জাগরণের বা সুষুম্না নাড়ীর মুখ মুক্ত হইবার প্রসঙ্গ আছে। এই জ্যোতিষ্মতীর প্রত্যক্ষতা তাহারও পূর্ব্ব লক্ষণ। সেই তরল জ্যোতির আকাশ ছিন্ন করিয়া তখন একের পর এক ফুটিয়া উঠিতে লাগিলেন শিঙ্গা-ডমরু করে বৃষভাসনে মহাদেব, কখনও বা শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী শ্রীবিষ্ণু, কখনও বা চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা, কখনও আবার দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের কক্ষমধ্যে উপবিষ্ট সহাস্যবদন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ—এইরূপ নানা শ্রীমূর্ত্তি।

মহারাজের মন কয়েকদিনের মধ্যেই অত্যন্ত উতলা হইয়া উঠিল। সেই আবাল্য পরিচিত ক্রীড়াসঙ্গীদিগকে আর তখন ভাল লাগে না, গৃহে আর মন বসে না, পিতা-মাতা আত্মীয়গণ নিকটে আসিলে মনে হয় অদর্শনই ছিল ভাল! 'সেমিনরি' তখন কারাগৃহ হইয়া উঠিল—পাঠ্যপুস্তকের অক্ষরগুলি মনে হইতে লাগিল যেন এক একটি বিষোদগারী ভৃঙ্গরোল—তাহাদের দর্শনে জ্বালা, পাঠে তিক্ততা, চিন্তনে বিদ্বেষ! প্রবেশিকা-পরীক্ষার গৃহে অল্পকালের মধ্যেই প্রবেশ করিতে

হইবে, যদিও মহারাজ ইহা জানিতেন বটে, কিন্তু পরীক্ষা, অধ্যয়ন ও 'সেমিনরি' তখন তাঁহার মন হইতে উঠিয়া গিয়াছিল। সে মনের সমস্তটাতেই তখন সিংহাসনারূঢ় হইয়া বসিয়াছিলেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ। মহারাজ তখন মনে মনে প্রতি দণ্ডে বুঝিতেছিলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে প্রবল বেগে দক্ষিণেশ্বরে টানিতেছেন !

শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজকে দক্ষিণেশ্বরে যে মন্ত্র দান করিয়াছিলেন তাহা তো ছিল না প্রাণহীন বাক্য মাত্র। তাহা ছিল চেতন মন্ত্র। মহারাজ সেই মহা-মন্ত্রের জপ করিতে করিতে মন্ত্র, গুরু এবং দেবতার ঐক্য সাধন করিতেছিলেন। এইরূপ চৈতন্যময় মন্ত্রজপের ফলে অন্তরে প্রত্যক্-চেতনার অধিগম হইতেছিল এবং তিনি সে বিষয়ে পরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তিনি যোগী হইবার জন্যই ব্যাকুল হইয়াছিলেন এবং এই ভাবে নিজের অজ্ঞাতে দিনে দিনে যোগীই হইয়া উঠিতেছিলেন।

মহারাজ শেষে বাড়ী হইতে পলায়ন করিয়া দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া উপস্থিত হইতেন এবং শ্রীপ্রভুর পবিত্র সঙ্গ লাভ করিয়া বিদায়ের বেদনায় অশ্রুসিক্ত নয়নে গৃহে ফিরিয়া আসিতেন।

ঠাকুর এক একদিন বলিতেন—"তুই না এলে, তোকে না দেখ্‌লে আমার প্রাণ ব্যাকুল হয়। তোকে রোজ রোজই দেখ্‌তে ইচ্ছা হয়।"

এই কথা শুনিয়া মহারাজ গদ্‌গদকণ্ঠে উত্তর দিতেন যে, তিনি তো দক্ষিণেশ্বরে আসিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত, কিন্তু তাঁহার পিতা-মাতা আসিতে দেন না।

মৃদু হাস্য করিয়া ঠাকুর বলিতেন—"কাহাকেও না বলিয়া পলাইয়া আসিস্। নৌকার যদি পয়সা না থাকে এখান থেকে নিবি।"

কিছুকাল এই ভাবে প্রতি সপ্তাহে দুই তিন বার, বিশেষতঃ প্রতি রবিবারে দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত হইতে লাগিল। কখনও বা আহেরিটোলার ঘাটে নৌকায় এবং কখনও বা পদব্রজে বরাহনগরের পথে—যে দিন যেমন সুবিধা হইত, সেদিন সেই ভাবে তিনি দক্ষিণেশ্বরে আসিতেন। বিদায়ের কালে তাঁহার নয়ন পল্লব সিক্ত হইয়া উঠিত। গৃহে ফিরিলেই মনে হইত—স্বর্গ হইতে নরকে আসিলাম! পিতা-মাতাও ভালবাসেন বটে—খুবই ভালবাসেন, কিন্তু ঠাকুরের সে স্নেহ মমতার সঙ্গে কি পিতৃ-মাতৃ স্নেহ মমতার তুলনা হয়? পিতা-মাতা চাহেন, আমি উত্তরোত্তর সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া শেষে অর্থ উপার্জ্জনের একটি জীবন্ত যন্ত্র হই। আর ঠাকুর চাহেন আমি সকল বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া শ্রীভগবানকে লাভ করি। ঠাকুরের ভালবাসাই তো নিঃস্বার্থ ভালবাসা। একটি কাচ—আর একটি কাঞ্চন। মহারাজের মন তখন অস্থির হইয়া এই ভাবেই চিন্তা করিত। যখন সুযোগ মিলিত, যেমন

সুযোগ মিলিত অমনি তিনি দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হইতেন। ধ্যানের সময় তাঁহার কবে কোন্ অনুভূতি হইয়াছে, সে সকল কথা বর্ণনা করিয়া যখন তিনি ঠাকুরকে শুনাইতেন, তখন আনন্দে ঠাকুরের মুখে হাসি দেখা দিত। তিনি ত ছিলেন অন্তর্য্যামী। তিনি তখন বুঝিতেই পারিতেন যে, ঈশ্বর-মহত্ত্বের আভাস প্রিয় শিষ্যের চিত্তক্ষেত্রে দর্পণে প্রতিবিম্ববৎ নিপতিত হইতেছে—যোগসাধনের অন্তরায়গুলি সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হইবার পূর্ব্ব-লক্ষণ দেখা দিয়াছে। মহারাজকে উৎসাহিত করিয়া ঠাকুর বলিতেন—"ঠিক্ হইতেছে। এই ভাবেই ধ্যান করবি। খুব লেগে থাকিস্।"

পিতা মাতা, আত্মীয় স্বজনদিগকে মহারাজ এই সময়ে দেখিতেন যেন সাধন-পথের বিঘ্ন। এক এক দিন দুঃখে তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া যাইত। কিন্তু গুরুর কৃপা ও নিজের সুদৃঢ় সঙ্কল্পের বলে তিনি সাধন-পথের সকল অন্তরায়কে দূর করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পরিণত বয়সে তিনি সেই কথা বিস্মৃত হন নাই, তাই ভক্তদিগের মঙ্গলের জন্য বলিতেন—তোমরা সত্য-প্রতিষ্ঠার জন্য জীবন পণ কর, বীরের মত অগ্রসর হইয়া সকল বাধা অতিক্রম কর। দেশের কি দুর্ভাগ্য যে বাল্যকাল হইতেই পিতা-মাতা পুত্রদিগকে বি-এ, এম-এ পাশ করিয়া দাস হইবার জন্যই প্রবুদ্ধ করে! ছেলেরাও শেষে দাসত্বকেই জীবন-ব্রত রূপে গ্রহণ করিয়া আত্মাকে পর্য্যন্ত

বিক্রয় করিয়া ফেলে, আর তাহাতেই আনন্দ পায়! এই ভাবে যে জাতি গড়িয়া উঠিতেছে, সে জাতি কি কখনও স্বাধীনতার অমৃতরসের স্বাদ পাইতে পারে? আগে মনকে স্বাধীন কর। দেশের স্বাধীনতা আপনা হইতেই আসিবে।

একজন ভক্ত একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, কি কারণে দেশের এইরূপ দুর্দ্দশা ঘটিতেছে। মহারাজ উত্তরে বলিয়াছিলেন যে, দুর্দ্দশার কারণ আমরা নিজেরা। যেমন চিন্তা করিতেছি, যেমন কর্ম্ম করিতেছি তাহারই ফল এই দুর্দ্দশা! সৎ চিন্তা নাই, ধর্ম্মে মতি নাই—কেবল ফাঁকি দিয়া মহৎ হইবার আকাঙ্ক্ষা! বড়-ছোট সকলের মধ্যেই দেখিতেছি ভাণ ও ভণ্ডামী, আর কাজের বেলায় আলস্য এবং এবং জড়তা! সত্যের পথে না গেলে সত্যকে পাওয়া যায় না। পুত্র কন্যাদিগকে বালক-বয়স হইতেই শিক্ষা দাও যে, সত্যের জয় হইবেই হইবে। ঠাকুর বলিতেন—পাখীর গলায় কাঁঠি উঠিলে সে আর রাম নাম পড়ে না। কাঁঠি উঠিবার পূর্ব্ব হইতেই পুত্র কন্যাদিগের হৃদয়ে ভগবানে বিশ্বাস, ধর্ম্মে মতি, সত্যে নিষ্ঠা প্রভৃতি মহৎ ভাবগুলি জাগ্রত করিয়া দিতে হইবে, তবে না তাহারা মাতৃভূমির এক একটি বীর সাধক-সেনা হইতে পারিবে। মনের অসীম শক্তি। সেই মনকে বাহিরে ছড়াইয়া দিয়া, রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শের মধ্যে নিরন্তর নিমজ্জিত রাখিয়া দণ্ডে দণ্ডে তাহার শ্বাসরোধ করিতেছ!

একবার মনকে অন্তর্মুখী কর—মনের মোড় ফিরাইয়া দাও—দেখিবে সেই মন কি না অঘটনই ঘটাইতে পারে। মাটী নরম থাকিতেই মূর্ত্তি গড়া যায়—পোড়া মাটী জোড়া লাগে না!

ঠাকুরের নিকটে সর্ব্বদা আসিবার জন্য মহারাজের মন যখন বিশেষ উতলা হইয়া উঠিল, তখন তাঁহাকে লেখা-পড়ায় শিথিল-প্রযত্ন দেখিয়া পিতা রুষ্ট হইলেন এবং মাতাও তিরস্কার করিলেন। রসিক মাষ্টার মহাশয় একদিন ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন—'লেখা-পড়া ছেড়ে রোজ-রোজই পালিয়ে যাওয়া দক্ষিণেশ্বরে—তা' আর হচ্ছে না! এই দুয়োরে চাবি দিলুম্।' মহারাজের চক্ষের উপর বাটীর সদর-দ্বারে তালা পড়িল। তিনি নীরব হইয়া রহিলেন, এদিকে মনটি পুড়িয়া ছাই হইতে লাগিল! মনে হইতে লাগিল ওই বুঝি ঠাকুর তাঁহাকে ডাকিতেছিলেন—

'খাইতে শুইতে আন নাহি চিতে—
বধির করিল বাঁশী।'

মহারাজ অত্যন্ত অসহায়ভাবে ঠাকুরকেই স্মরণ করিতে লাগিলেন। সেই দিন অপরাহ্নে এমন একটি সাংসারিক কার্য্য উপস্থিত হইল যে সদর-দ্বার খুলিতে হইল! ফাঁক পাইয়াই মহারাজ নগ্নপদে ছুটিয়া বাহির হইলেন এবং ক্ষিপ্র-চরণে ঠাকুরের নিকটে আসিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলেন।

তাঁহাকে দেখিয়া প্রীতি-প্রফুল্ল বদনে ঠাকুর কহিলেন—"কি রে?"

সেই একটি ছোট কথা 'কি রে' কালীপ্রসাদের হৃদয়-বীণায় নানা সুরের ঝঙ্কার তুলিল। তাঁহার মনে হইতে লাগিল ঠাকুর যেন জানেন যে, কি ভাবে তিনি গৃহে অবরুদ্ধ হইয়াছিলেন এবং কৌশলে পলায়ন করিয়া তাঁহার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। ঠাকুর যে তাঁহাকে দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন, সেই ক্ষুদ্র বাক্য 'কিরে'-র মধ্যে তাহারও পরিচয় বর্ত্তমান ছিল। এ কয়েক দিন মহারাজের যে সকল দিব্যানুভূতি হইয়াছিল সেগুলি বর্ণনা করিয়া তিনি কহিলেন—"ধ্যানে দেখিলাম, উজ্জ্বল দুইটি বিরাট চক্ষু যেন সমস্ত আকাশ জুড়িয়া বিস্তৃত রহিয়াছে—চক্ষু যেন আমার দিকেই চাহিয়া আছে!"

ঠাকুর শুনিয়া খুসি হইয়া বলিলেন—"ভগবানের তত্ত্বদর্শী চক্ষু দু'টি তুই দেখেছিস্। এ খুবই ভাগ্যের কথা।"

এই ভাবে যতই দিন যাইতে লাগিল, নিত্য নবীন দিব্য-দর্শনে উৎসাহিত ও বিস্ময়াবিষ্ট মহারাজের দক্ষিণেশ্বরে গমনা-গমন ততই বেশী ঘন ঘন হইতে লাগিল। তাঁহার পিতা-মাতা দেখিলেন, পুত্রকে গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার চেষ্টা বৃথা! তাঁহারা হতাশ হইলেন! এতদিন তাঁহারা মনে মনে কতই না আকাশ-কুসুম রচনা করিয়াছিলেন যে, পুত্র—আবার

যেমন তেমন পুত্র নহে, মেধাবী, প্রতিভাবান্, বুদ্ধিমান্, 'সেমিনরির' একজন উৎকৃষ্ট ছাত্র—সেই পুত্র অনায়াসে বড়-বড় পরীক্ষায় 'পাশ' দিয়া 'মানুষ' হইয়া উঠিবে—তাঁহারা দেখিয়া নয়ন সার্থক করিবেন! দক্ষিণেশ্বরের পূজারী ঠাকুর এ কি গুণ করিলেন যে, এখন সেই পুত্রকে ফিরাইয়া গৃহে পাওয়াই দুষ্কর হইয়া উঠিল! তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইলেন, তিরস্কার করিলেন —কোন দিন বা অত্যন্ত কাতরতা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না!

মহারাজ তখন কোন কোন দিন দিবাভাগে আসিয়া রাত্রিতেও দক্ষিণেশ্বরেই থাকিতেছিলেন। যুগগুরুর চরণ সেবা করিবার অবাধ অধিকার পাইয়া তিনি তখন নিজেকে অতিশয় ভাগ্যবান বলিয়া মনে করিতেছিলেন। সে সৌভাগ্যের কাছে একজন বড়-চাকুরিয়ার সৌভাগ্য! মহারাজের মনে হইত উহা যেন পূর্ণচন্দ্রের নিকটে বনস্পতির পত্রলগ্ন খদ্যোতিকা!

কি সুন্দরই না ছিল সেই সব দিনের চিত্র! দেব-চরিত্র একটি দেব-বালক যুগদেবতার চরণপ্রান্তে বসিয়া নীরবে তাঁহার সেবা করিতেছেন—সে তো সাধারণ সেবা নহে, সে ছিল পুষ্প-চন্দন-হীন ভক্তিরসসিঞ্চিত মানসপূজা। আর সেই পূজার কালে শ্রীমুখ হইতে নিঃসৃত আধ্যাত্মিক স্বর্গের অমৃত-রসধারা আকণ্ঠ পূরিয়া পান করিয়া বালক দণ্ডে দণ্ডে দেবতা হইয়া উঠিতেছিলেন—অমর হইতেছিলেন। সেই

তপস্যার বিঘ্ন ঘটাইতে তখন কেহ নিকটে থাকিত না, কারণ সে ছিল ঠাকুরের বিশ্রামের সময়। মহারাজের গৃহ—মহারাজের পিতা-মাতা, 'ওরিএণ্টাল্ সেমিনরি'-র কোলাহলপূর্ণ কক্ষগুলি, চিৎপুর রোডের চঞ্চলতা, রাজপথে অসংখ্য লোকযাত্রা তখন যেন মহারাজের মন হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইত ; তখন থাকিতেন শুধু সেই বিমুগ্ধ বিহ্বল ভাবগ্রাহী শিষ্য, আর থাকিতেন সেই শিষ্যের হৃদয়-মন-প্রাণের তলদর্শী, করুণার মূর্ত্তি, বালকবৎ সরল, অহেতুক দয়াল গুরু—যাঁহার দেহ হইতে তখন অশরীরী ভাবতরঙ্গ প্রবাহিত হইয়া অলক্ষ্যে আসিয়া শিষ্যের দেহকে পবিত্র করিত, মনকে শুদ্ধ করিত, বোধিকে প্রবুদ্ধ করিত, চিত্তকে ভগবৎমুখী করিত এবং প্রাণকে আরও প্রাণবন্ত করিয়া কোথায় কোন্ অমরলোকের অমৃতসাগরের তীরাভিমুখে লইয়া যাইত, তাহা কে বলিতে পারে! এই কারণেই ভক্ত কবি বলিয়াছেন—"লব মাত্র সাধু সঙ্গে সর্ব্ব-সিদ্ধি হয়"। ঠাকুরও তাই তাঁহার অন্তরঙ্গ শিষ্যদিগকে তাঁহার নিকটে শুধু বসিয়া থাকিতেই আদেশ করিতেন। ঠাকুর জানিতেন যে, তাঁহার নিকটে বসিয়া থাকিলেই শিষ্যগণ তাঁহার অন্তরের ভাব ধারায় সিক্ত হইয়া উঠিবে—স্ফুটনোন্মুখ কলিকার পেলব কুসুমপর্ণে বদ্ধ হৃদয়খানি, স্বর্গের শিশির-সম্পাতে যেরূপে সিক্ত হইয়া উঠে, সেইরূপ।

ঠাকুর ছিলেন যুগ-দেবতা। তিনি জানিতেন যে, সাধুর

নিকটে শুধু বসিয়া থাকিলেই বহু জ্ঞান লাভ হইতে পারে—বাক্যের প্রয়োজন হয় না। সাধুর ভাবতরঙ্গ বিদ্যুৎতরঙ্গের মত ছুটিয়া আসিয়া সাধকের অন্তরে প্রবেশ করে। ঠাকুর তাই বলিতেন—"নূতন নূতন এখানে আসা-যাওয়াটা বেশী রাখিতে হয়।"

দক্ষিণেশ্বরের সেই অপূর্ব্ব বিদ্যাপীঠে অধ্যাপনার জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট প্রকোষ্ঠ ছিল না, ছিল না কোনও নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য পুস্তক বা অধ্যাপনার জন্য সুনিয়ন্ত্রিত কালাকাল। মানবের আচার্য্য সেখানে অহর্নিশি নিজের অনুভূতির বিরাট গ্রন্থখানি উন্মুক্ত করিয়া রাখিতেন এবং শিষ্যগণ 'যখন-তখনই' সেই মহাগ্রন্থ হইতে পাঠ গ্রহণ করিতেন। একজনে কি পাঠ লইলেন, সব সময়ে অপরের তাহা জানিবার সম্ভাবনা ছিল না। সেখানে অধিকারী ভেদে তড়িৎ-শক্তি সংক্রমিত হইত। যিনি উহা-দ্বারা স্পৃষ্ট হইতেন তিনি বুঝিতেন উহার শক্তি কত, অপরে তাহা কিরূপে বুঝিবে? যোগশাস্ত্র ইহাকেই পর-শরীরাবেশ-রূপ বিভূতি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন—"বন্ধকারণশৈথিল্যাৎ প্রচারসংবেদনাচ্চ চিত্তস্য পরশরীরাবেশঃ।" ইহা একালের হিপ্‌নটিজম্ বা মেস্‌মেরিজম্ নহে—উহা তো সম্মোহন বিদ্যা মাত্র, যোগজ বিভূতি নহে। পরশরীরাবেশ যোগজ বিভূতি। চলিত কথায় ইহাকেই 'শক্তি-সংক্রমণ' বলা হয়।

মহারাজ কোনও একদিন একটি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়—

তুমি যে কৃপা করেছ প্রভো,
তাহা কি আমি ভুলিতে পারি,
তুমি যেমন খেয়েছ আমায়,
আমি তেমনি খেয়েছি তোমায় ;
এ রহস্য বুঝিবে কেবা
তাহা আমি বলিতে নারি।
তোমার আদেশে এ রহস্য
প্রকাশ আমি করিতে নারি।
(It will die with me)
তুমি আমি এক হয়েছি
তুমি আমি ভিন্ন নহি।
তুমি আধেয় আমি আধার—
এ দেহ-মন-প্রাণ সকলি তোমার !
সমর্পিনু দেব, তোমার চরণে
যাহা খুসি কর জীবনে মরণে।(১)

যন্ত্রী শ্রীরামকৃষ্ণ জানিতেন, কোন্ বীণা-যন্ত্রের তার কোন্ গ্রামে বাঁধিতে হইবে। তাই দেখি বিবেকানন্দ, অভেদানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, সারদানন্দ প্রভৃতির হৃদয়-বীণার তার ভিন্ন ভিন্ন

(১) বিশ্ববাণী—পৌষ, ১৩৪৬—৬৯৩ পৃষ্ঠা

গ্রামে বাঁধা। আপন আপন কর্ম্মক্ষেত্রে প্রত্যেকেই নিজের নিজের সুর বাজাইয়া বিশ্বকে বিমোহিত করিয়াছেন—আবার যখন কার্য্যগতিকে সবগুলি যন্ত্র একসঙ্গে বাজিয়াছে, তখনই সুরগুলি সমন্বিত হইয়া ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে। ইঁহাদিগের সকলেরই ভাব বিভিন্ন, কর্ম্মশক্তি বিভিন্ন, কর্ম্মপন্থা বিভিন্ন। ইঁহারা কেহ কাহারও প্রতিচ্ছবি নহেন। সেই এক ঠাকুরের শক্তিই সকলের মধ্যে খেলা করিয়াছে।

মহারাজের যে কবিতাটি উদ্ধৃত করা হইয়াছে তাহা পাঠ করিলেই প্রতীতি হয় যে, এমন অনেক. বিষয় বা ঘটনা ছিল, যাহা এই নিবিড় সম্বন্ধকে মধুর করিয়াছিল এবং আরও ঘন ও সুনিবিড় করিয়াছিল। কবিতা পাঠে মনে হয় যে মহারাজ ঠাকুরের নিকট হইতে এমন-কিছু একটা অপার্থিব শক্তি লাভ করিয়াছিলেন, যাহার প্রভাবে উত্তরকালে তিনি' বিশ্ববিজয়ী ধর্ম্মাচার্য্যরূপে এতই সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন যে কি এদেশে, কি বিদেশে তাঁহার প্রশস্তিকারের অভাব নাই।

মহারাজ ঠাকুরের নিকট হইতে যে অপূর্ব্ব শক্তি লাভ করিয়াছিলেন, ঠাকুরের আদেশে সেই গুপ্ত কাহিনী ব্যক্ত হইতে পারিল না—

"তোমার আদেশে এ রহস্য
প্রকাশ আমি করিতে নারি।
(It will die with me)"

সে কাহিনী সত্য সত্যই মহারাজের সঙ্গে সঙ্গে দেহ রক্ষা করিয়াছে! কিন্তু সূর্য্য নাই, পশ্চিম গগনে রক্তরঞ্জিত আলোকচ্ছটা আছে—গান নাই, ঝঙ্কারের প্রতিধ্বনি আছে—বজ্র নাই, দহন-চিহ্ন আছে—সুতরাং কতকটা নির্ভুলরূপেই সূর্য্যকে, গানকে ও বজ্রকে বুঝিয়া লইতে পারা যায়। কবিতায় গোপন-বৃত্তান্তের ক্ষীণ ইঙ্গিতটুকু আছে, সুতরাং আসল কথাটি আমরা জানিতে অধিকারী নহি। কিন্তু যখনই আমরা মহারাজের নিকটে লিখিত স্বামী প্রেমানন্দজির একখানি পত্রে (২) দেখিতে পাই তিনি লিখিতেছেন—"ভাই কালী, তুমি শ্রীশ্রীপ্রভুর পরম প্রিয় ও বুদ্ধিমান শিষ্য"—তুমি "তাঁহারই হাতে ও ছাঁচে গড়া", তখনই আর বুঝিতে বাকি থাকে না যে, মহারাজের সহিত ঠাকুরের সম্বন্ধ, সাধারণ গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ ছিল না। উহা ছিল অলৌকিক ও অসাধারণ!

শুধু দক্ষিণেশ্বরে নহে, দক্ষিণেশ্বরের বাহিরে কলিকাতায় নানা উৎসবক্ষেত্রে, পাণিহাটির দণ্ড-মহোৎসবে, শ্যামপুকুরে এবং কাশীপুরে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই আগষ্ট পর্য্যন্ত প্রায় সর্ব্বদাই ঠাকুরের সঙ্গ করিবার সৌভাগ্য যে মহারাজের ঘটিয়াছিল, উহা তাঁহার নিকট হইতে অনেক দিন শুনিতে পাওয়া গিয়াছে। 'লীলাপ্রসঙ্গে' দেখিতে পাই যে, ঠাকুর কলিকাতায় আসিলেই অল্প সময়ের মধ্যেই সে সংবাদ

(২) বিশ্ববাণী—শ্রাবণ, ১৩৪৭, ২২৪ পৃষ্ঠা।

ভক্তদিগের মধ্যে প্রচারিত হইয়া যাইত এবং ভক্তগণও যিনি যাঁহার মত উৎসবক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইতেন—কেহ যে কাহাকেও ডাকিয়া আনিতেন তাহা নহে; ঠাকুরই যেন সকলকে আকর্ষণ করিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনকাহিনী ও 'কথামৃত' পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, দক্ষিণেশ্বর, শ্যামপুকুর, কাশীপুর এবং কলিকাতার নানা উৎসবক্ষেত্র ছিল তাঁহার লোক-গঠন করিবার শিল্পশালা।

তাঁহার ছিল—"আপনি আচরি ধর্ম্ম অপরে শিখায়।" ইহা ছাড়াও ছিল তাঁহার অমৃতনিস্যন্দিনী বাণী এবং ভাবে তন্ময় হইয়া অপরকে শ্রীঅঙ্গের স্পর্শ প্রদান ও পরশরীরাবেশ এবং আরও কত কি! নিয়ত এইরূপ দুর্জ্জয় দেবশক্তির আবেষ্টনের মধ্যে মহারাজের শিষ্যজীবন গঠিত হইয়াছিল বলিয়াই তিনি উত্তরকালে অমিত শক্তিধর-রূপে স্বদেশে এবং বিদেশে পূজা পাইয়া গিয়াছেন। চরিত্র, জ্ঞান, প্রতিভা, বাগ্মীতা, সংগঠন-কৌশল ও প্রভু-দত্ত অন্যান্য শক্তির বলে তিনি ভারতের যে গৌরব-পতাকা মার্কিনে ও অন্যান্য স্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, আজিও তাহা সেই পূর্ব্ব গৌরবেই উড্ডীন আছে। শ্রীরামকৃষ্ণ-গোষ্ঠীর এ-কালের প্রচারকগণ এখন মার্কিনে যাইয়া স্বামী বিবেকানন্দ এবং স্বামী অভেদানন্দ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত সেই পতাকাতলেই দণ্ডায়মান হইতেছেন।

ভারতের বৈয়াকরণশ্রেষ্ঠ অশেষ শাস্ত্রবিৎ মহামহোপাধ্যায় স্বর্গত আচার্য্য হারাণ চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় এক সময়ে "বিশ্ববাণী" পত্রিকায় (৩) লিখিয়াছিলেন—

"স্বামী বিবেকানন্দ প্রতীচীতে ভারতের অপূর্ব্ব জ্ঞান-ভাণ্ডারের অমৃতরাশি জ্ঞান-পিপাসুগণের মধ্যে পরিবেশনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। স্বামীজি নানা কারণে দীর্ঘকাল প্রতীচীতে অবস্থান করিতে পারেন নাই। তিনি তাঁহার সেই জ্ঞান-সত্রের অধ্যক্ষতার ভার স্বামী অভেদানন্দের প্রতি ন্যস্ত করিয়াছিলেন।......স্বামী বিবেকানন্দ এবং স্বামী অভেদানন্দ উভয়েই অতিশয় বিচারশীল ছিলেন; তাঁহাদের ভিতরে গঠনমূলক কার্য্য করার অপূর্ব্ব শক্তি ছিল। যদি তাঁহারা পরমহংসদেবের শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে প্রবেশ না করিতেন, তাহা হইলে, আজ আমরা 'শ্রীরামকৃষ্ণ-সম্প্রদায়কে' যে অবস্থায় জগতে দেখিতে পাইতেছি, ইহার এরূপ উন্নত অবস্থা কতদিনে কি ভাবে হইত, তাহা বলা যায় না। স্বামী বিবেকানন্দ সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্য পাত্র মনে করিয়া স্বামী অভেদানন্দের উপরই প্রতীচীর জ্ঞান-সত্রের অধ্যক্ষতার ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। স্বামী অভেদানন্দ সুদীর্ঘকাল প্রতীচীতে অবস্থান করিয়া প্রাচীন ভারতের জ্ঞানের বাণী সেই দেশের জ্ঞানপিপাসুগণের মধ্যে এমন সুন্দর ভাবে বিতরণ

(৩) বিশ্ববাণী—১৩৪৮, কার্ত্তিক। ২৭২ পৃষ্ঠা।

করিয়াছেন যে, তাহার ফলে সে দেশের বহু ব্যক্তি আধ্যাত্মিক ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া ভারতের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন।

"প্রতীচীর জ্ঞানদৃপ্ত বহির্মুখ সভ্যতাভিমানী জন-সমাজে তাঁহার প্রদত্ত শিক্ষা যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।...... এই পদদলিত দাস-ভারতের পুরাতন বাণী নূতন যুগের নূতন সমাজে প্রচার করিয়া যিনি বা যাঁহারা প্রাচীন ভারতের গৌরবময় জ্ঞান-ভাণ্ডারের দ্বার নূতন জগতের নিকট উন্মুক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহারা যে অত্যন্ত কৃতজ্ঞতার পাত্র, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।......যাঁহারা এই সম্পত্তিকে তাহার যথার্থ অধিকারী সেই বিশ্বমানব সমাজে বণ্টন করিবার জন্য নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহারা সাধারণ মনুষ্য হইতে অনেক উচ্চ স্তরে অবস্থিত।.. ...স্বামী অভেদানন্দ ছিলেন এই রকমেরই একজন মহাপুরুষ।"

অন্য একজন প্রথিতযশা আচার্য্য বলিয়াছেন—"ইদানীন্তন কালে যখন আমরা পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া আমাদের সংস্কৃতির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া ইউরোপীয় বিজ্ঞানকে, ইউরোপীয় জীবন-যাত্রা-প্রণালীকে আমাদের আদর্শ বলিয়া মনে করিয়া আসিতেছিলাম, তখন স্বামী বিবেকানন্দ, ঠাকুর রামকৃষ্ণের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া আমেরিকায় ভারতবর্ষের এই অমোঘবাণী প্রথম উচ্চারণ করিয়া ভারতবর্ষীয় সংস্কৃতির মহাগৌরবের বোধিবৃক্ষের বীজ আমেরিকা-ভূমিতে প্রোথিত

করেন। স্বামী অভেদানন্দ আপ্রাণ সাধনার বারি সঞ্চারে এই বীজটিকে পত্র-পুষ্পে শোভিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। আমেরিকার নানা স্থানে তাঁহার এই দেদীপ্যমান কীর্ত্তি আমি প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছি।" (৪)

এই ছিলেন স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ—শ্রীশ্রীপ্রভুর "আপন হাতে ও ছাঁচে গড়া" দেব-মানব। তিনি "পাশ্চাত্য জগতে ভারতের ধর্ম্ম ও দর্শনের সূক্ষ্ম তত্ত্ব প্রচার করিয়া এবং দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত খৃষ্টধর্ম্মযাজকদের প্রতিকূলতা ব্যর্থ করিয়া যে অসামান্য মনীষা ও শৌর্য্যের প্রমাণ দিয়াছেন তাহা এতদ্দেশ-বাসী সকলেই কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে স্মরণ করিতে বাধ্য। সর্ব্ববিধ দুঃখ ও দারিদ্র্যের পেষণে হতবীর্য্য জাতির মধ্যে কেমন করিয়া এরূপ অকুতোভয় মহামনীষী পুরুষসিংহের আবির্ভাব সম্ভব হইয়াছে তাহা চিন্তার বিষয়।(৫)

বহু সুকৃতির ফলে স্বামী অভেদানন্দ জন্মজন্মান্তর-সঞ্চিত একটি বিরাট বিস্ফোরকের স্তূপকে হৃদয়ে লইয়া এবার জন্মলাভ করিয়াছিলেন। প্রয়োজন ছিল শুধু একটি অগ্নি-শিখার স্পর্শের। স্তূপটি যে মুহূর্ত্তে সেই স্পর্শলাভ করিল সেই মুহূর্ত্তেই তাহার প্রদীপ্ত প্রভায় জগৎ উদ্ভাসিত হইয়া

---

(৪) আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠায় ভূষিত সর্ব্বজন প্রশংসিত দর্শনের আচার্য্য ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত—বিশ্ববাণী, ১৩৪৮। কার্ত্তিক। ২৭৪ পৃষ্ঠা।

(৫) আচার্য্য সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় এম্-এ, পি-এইচ ডি।

উঠিল। কিরূপে ইহা সম্ভব হইয়াছিল তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইবে বর্ত্তমান ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে মায়াবতী, অদ্বৈতাশ্রম হইতে প্রকাশিত Disciples of Ramakrishna ('রামকৃষ্ণের শিষ্যমণ্ডলী') নামক গ্রন্থে। সেই গ্রন্থে স্বামী অভেদানন্দের জীবন-কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনকালে ইতিবৃত্তকার লিখিয়াছেন—(৬)

"আপন গৃহের শ্বাসরোধকারী পরিবেষ্টন হইতে পলায়ন করিয়া দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের উদ্যান-বাটিকার শান্ত এবং চিত্তোন্নতকারী আবেষ্টনের মধ্যে আসিয়া শ্রীপ্রভুর চরণপ্রান্তে বসিয়া থাকিবার জন্য সুযোগ ঘটা মাত্রই কালীপ্রসাদ গৃহ হইতে ছুটিয়া বাহির হইতেন। ব্যাকুল মুমুক্ষুদিগের আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্য তখন শ্রীমুখ হইতে স্বর্গীয় সুধার যে অক্ষয়-ধারা বর্ষিত হইত, তৃষিতহৃদয় কালীপ্রসাদ তাহা আকণ্ঠপূর্ণ করিয়া পান করিতেন। যত দিন যাইতে লাগিল, কালীপ্রসাদ ততই অধিক তীব্রভাবে উপলব্ধি করিতে লাগিলেন যে, বিশ্বের অতিশয় উচ্চাঙ্গের দর্শনশাস্ত্রগুলি পরম ও চরম সত্যের যে বার্ত্তা শুনাইতেছে এবং খণ্ডে খণ্ডে বহুধা বিভক্ত পৃথিবীর নানা ধর্ম্মমতের অন্তরালে যে অখণ্ড সার্ব্বজনীন ধর্ম্মের বিগ্রহ বিরাজিত আছেন—শ্রীপ্রভুই সে সকলের সুসমন্বিত জীবন্ত

---

(৬) The Disciples of Ramakrishna (Mayaboti Adwaita Ashramed ; 1943), Page 35.

প্রতীক। শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট হইতেই কালীপ্রসাদ শিখিয়াছিলেন যে, ধর্ম্মতত্ত্বের দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত এবং অদ্বৈত—এই তিনটি ভাব সেই পরম সত্যে পৌঁছিবার তিনটি সোপান মাত্র। উহারা পরস্পর বিরুদ্ধ তো নহেই, পরন্তু অত্যন্ত সুসমঞ্জস। নানা শ্রেণীর আত্মিক-উপলব্ধিগুলি, যাহাদের চরম পরিণতি সেই অমূর্ত্ত অদ্বিতীয় ব্রহ্মে—তাহারাও যে আবার বিভিন্ন স্তরে সুবিন্যস্ত হইয়া একে অন্যের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে ঐক্যবদ্ধরূপে অনুস্যূত এবং এই স্তরবিভাগই যে উত্তমরূপে ফলপ্রসূ—মানব-জ্ঞানের অতীত নিগূঢ় রহস্যময় শ্রীরামকৃষ্ণের চরণমূলে বসিয়া কালীপ্রসাদ তাহা অসংশয়েই জানিতে পাইয়াছিলেন।”

ধর্ম্মজীবনে পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ করিবার জন্য অন্তরঙ্গ-শিষ্যদিগের মধ্যে কাহার কি ভাবে এবং কতখানি প্রস্তুতির প্রয়োজন ছিল, অনন্ত ভাবময় ঠাকুর তাহা প্রত্যক্ষবৎ দর্শন করিতেন এবং সেই জন্যই এক এক জনকে এক এক ভাবে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। সে গঠনের কালে নির্ব্বিচারে তাঁহার আদেশ ও উপদেশ পালন করা ব্যতিরেকে অন্তরঙ্গ ভক্তদিগের অন্য কিছু করিবার ছিল না! আবার সে আদেশ-পালনও যে তাঁহাদিগের আত্মাভিরুচির উপর নির্ভর করিত, তাহাও নহে! উহা বিশেষভাবে নির্ভর করিত ঠাকুরেরই ইচ্ছার উপর। তিনি যাঁহাকে দিয়া জপ করাইয়া লইতেন, ধ্যান করাইয়া লইতেন, জ্ঞান-সঞ্চয়ের জন্য যাঁহাকে দিয়া বহু

অধ্যয়ন করাইয়া লইতেন—সেই শিষ্যই শুধু তদ্রূপ করিতে পারিতেন, অন্যে নহে! এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে সাধু নানকের বাণী—'আপি জপায়, নানক জপে।' সকলের সকল রকম ভাব ধরিবার এবং তাহাদিগকে নিজ নিজ পথে পরিচালিত করিবার বিচিত্র শক্তি ছিল ঠাকুরের।

নিজের সুকৃতিবলে ও ভগবানের কৃপায় মহারাজ এমন একজন গুরু পাইয়াছিলেন, যিনি ছিলেন পূর্ণাঙ্গ যুগাবতার—বলিতে গেলে যিনি ছিলেন পূর্ব্বগ সকল অবতারের সুসমন্বিত ভাবঘন মূর্ত্তি। কর্ম্মের বিষাণ নিনাদ করিতে করিতে কুরুক্ষেত্রে আসিলেন শ্রীকৃষ্ণ, মহাভারত লইয়া আসিলেন ব্যাস; শুকদেব শুনাইলেন ভক্তির গান, যাহা ঝঙ্কৃত হইতে লাগিল নারদের বীণায়; শ্রীবুদ্ধ মানবকে শুনাইলেন জীবসেবায় আত্মাহুতি, ঈশা পরের জন্য হাস্যমুখে ক্রুশে উঠিলেন, শ্রীশঙ্করের জ্ঞান-অসি দশ দিক্ ঝলসাইয়া দিল, শ্রীচৈতন্যের নাম ও প্রেমের গান দিকে দিকে বাজিয়া উঠিল। এইরূপে যুগ যুগ ধরিয়া বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, ঠাকুরের পূর্ব্বগ অবতারগণ এক একটি বিশেষ বিশেষ ভাব—যাহা তাঁহাদিগের কালে সবিশেষ প্রয়োজন ছিল—তাহাই প্রচার করিবার জন্য ধরায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণে দেখিতে পাই—সকল ভাবের সমাবেশ ও সমাধান—সকল মন্ত্রের সিদ্ধি। সমগ্র বিশ্বের জন্য লোকগুরু সৃজন করিয়া তাঁহা-

দিগের মুখ দিয়া মহাসমন্বয়ের বাণী প্রচার করিবার জন্যই তাঁহার এবার আগমন হইয়াছিল। সেই জন্য তাঁহার অন্তরঙ্গ-দিগকে তিনি বিশেষ বিশেষ ভাবের পথে পরিচালিত করিতেন—কারণ তিনি দিব্যচক্ষু দ্বারা অনুক্ষণ দেখিতেন কাহার দ্বারায় কি ভাবে এবং কোথায় তাঁহার কোন্ কার্য্য সাধিত হইবে! তাই একটু প্রণিধান করিলেই দেখা যায় যে, দক্ষিণেশ্বর, শ্যামপুকুর ও কাশীপুর এবং নানা স্থানের উৎসব-ক্ষেত্র ছিল বহু জনহিতায় একটি শ্রেষ্ঠ মানবগঠনের অপূর্ব্ব বিদ্যাপীঠ, যেখানে তৎকালে সমুপস্থিত অন্তরঙ্গদিগের হৃদয়ে নূতন ভাব, নূতন শক্তি, নূতন জ্ঞান তিনি তাঁহাদিগের অলক্ষ্যে প্রবেশ করাইয়া দিতেন! যাঁহার যেমন মন, তিনি তেমনি তাহা গ্রহণ করিতেন। তাই ঠাকুরের আদেশ ছিল—"তোরা আমার নিকটে আসিয়া বসিয়া থাকিস্—নূতন নূতন এখানে আসা-যাওয়াটা বেশী করিতে হয়।"

অনুরূপ প্রসঙ্গে স্বামী সারদানন্দ মহারাজ লিখিয়াছেন(৭)—"যাঁহারা কখনও বাটীর বাহির হন নাই (ঠাকুর) তাঁহাদের দিয়া বাজার করাইয়া আনিয়াছেন, অভিমান অহঙ্কার দূরে যাইবে বলিয়া সাধারণ ভিখারীর ন্যায় লোকের বাড়ী বাড়ী ভিক্ষা করাইয়াছেন, সঙ্গে লইয়া পেনেটির মহোৎসব ইত্যাদি দেখাইয়া আনিয়াছেন—আর তাঁহারাও (শিষ্যবর্গ)

(৭) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ—স্বামী সারদানন্দ। গুরুভাব—পূর্ব্বার্দ্ধ। ৩৯ পৃষ্ঠা।

মনে মনে কোন দ্বিধা না করিয়া মহানন্দে যাহা ঠাকুর বলিয়াছেন তাহাই করিয়াছেন। ভাবিয়া দেখিলে ইহা একটি কম ব্যাপার বলিয়া মনে হয় না। সে প্রবল জ্ঞান-তরঙ্গের সম্মুখে সকলেরই ভেদজ্ঞান প্রসূত দ্বিধা ভাব তখনকার মত ভাসিয়া গিয়াছে।"

সাধুসঙ্গই সংসার-মুক্তির অন্যতম প্রধান উপায়। ঠাকুর বলিতেন—"সাধুসঙ্গে ঈশ্বরে অনুরাগ হয়। তাঁর উপর ভাল-বাসা হয়। সাধুসঙ্গ কর্‌তে কর্‌তে ঈশ্বরের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়। সাধুসঙ্গ কর্‌লে আর একটি উপকার হয়—সদসৎ বিচার করিবার শক্তি লাভ। কিন্তু সেই "সাধুসঙ্গ একদিন কর্‌লে হয় না। সর্ব্বদাই দরকার—সকলেরই দরকার।" ইহাও ঠাকুরেরই বাণী। মহারাজ যেদিন হইতে সুযোগ পাইয়া-ছিলেন, সেই দিন হইতে নিয়তই এই পরম সাধুর সঙ্গ করিতেন। ইহারই নাম ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য প্রস্তুতি। সে প্রস্তুতির পথে সহায় ছিলেন ঠাকুর স্বয়ং। তিনি বলিতেন—"ষোল আনা মন না দিলে ঈশ্বরের পূর্ণ দর্শন কখনও লাভ হয় না। বালকদিগের সম্পূর্ণ মন তাহাদের নিকটে আছে,—স্ত্রী পুত্র, ধন সম্পত্তি, মান যশ প্রভৃতি পার্থিব বিষয়সকলে ছড়াইয়া পড়ে নাই। এখন হইতে চেষ্টা করিলে উহারা ষোল আনা মন ঈশ্বরে অর্পণ পূর্ব্বক তাঁহার দর্শন লাভে কৃতার্থ হইতে পারিবে,—এই জন্যই ইহাদিগকে ধর্ম্মপথে পরিচালিত

করিতে আমার অধিক আগ্রহ।" এইরূপ কাঁচা বয়সেই মহারাজ শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপা লাভ করিয়াছিলেন।

একদিন রাত্রে মহারাজ ঠাকুরের সেবা করিতেছেন এমন সময় তাঁহার উপলব্ধি হইল যে, ঠাকুর যেন জগন্মাতার রূপে তাঁহাকে স্তন্য পান করাইতেছেন! মহারাজ বিস্মিত হইলেন, কিয়ৎক্ষণের জন্য বাহ্য জ্ঞান হারাইলেন। ঠাকুর যেন ইঙ্গিতে ইহাই বুঝাইয়া দিলেন—এই বিশ্ব মা-ময়—মা'ই সব। প্রত্যেক কর্ম্মের ভিতর দিয়া চৈতন্যরূপে, বোধরূপে, জ্ঞানরূপে, অনুভূতিরূপে মা'ই আপনাকে প্রকাশ করিতেছেন। এই জগৎ তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তিনিই ইহাকে স্তন্যপানে পরিপুষ্ট করিতেছেন—আবার তিনিই একদিন ইহার লয় করিবেন। এই মা-ই আত্মা, মা-ই ব্রহ্ম, মা-ই আমাদের 'আমি'। মহারাজের হৃদয়-বীণায় তখন ঝঙ্কৃত হইতে লাগিল দেবগণের সেই অমর উপাসনা-গীতি—

বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ, স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।
ত্বয়ৈকয়া পুরিতমম্বয়ৈতৎ কা তে স্তুতিঃ স্তব্যপরাপরোক্তিঃ॥

মহারাজের শ্রীচণ্ডীপাঠ—সেই দিন, সেই এক দণ্ডে সার্থক হইয়া গেল! চণ্ডী হৃদয়মধ্যে আবির্ভূতা হইলেন, মহারাজের প্রাণের পূজা লইলেন, বরাভয় কর উত্তোলিত করিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ধ্যানকালে মহারাজ নানা দেব-

দেবীর দর্শন পাইতেন। দেব-দেবী সেই এক ভগবানেরই বিভিন্ন রূপ প্রতিবিম্ব মাত্র এবং ধারণা করিতে করিতে যখন গভীর ধ্যানাবস্থা উপস্থিত হয়, অর্থাৎ ধারণার পরিপক্ক অবস্থায় যখন ধ্যান আসে, চিত্ত তখনই প্রশান্ত হইয়া যায়, বিভিন্নরূপ স্পন্দনে চিত্ত আর উদ্বেলিত হইয়া পড়ে না; ধ্যান গভীর হইলেই সমজাতীয় প্রত্যয় ধারা চিত্তে উপস্থিত হইয়া চিত্তের সকল অশান্তি ও ভ্রান্তি দূর করিয়া দেয়। সেইরূপ প্রশান্ত চিত্ত-মুকুরেই ভগবানের প্রতিবিম্ব পড়ে। সুতরাং দেব-দেবীর দর্শন ঘটিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, সাধকের চিত্ত ভগবৎ রসধারার আস্বাদ পাইতে আরম্ভ করিয়াছে এবং চিদাকাশ প্রকাশিত হইতেছে। পরবৈরাগ্য লাভের ইহাই পূর্ব্ব সূচনা। ইহার পরই মহত্ত্বমণ্ডিত আত্মভাবস্থ মূর্ত্তির প্রকাশ অবশ্যম্ভাবী। সাধকের এইরূপ অবস্থা হইলেই বুঝিতে হয় যে, তিনি তখন সতত ভগবানে চিত্তার্পণ করিতে যত্নবান হইয়াছেন এবং "প্রীতিপূর্ব্বক" তাঁহার ভজনায় নিযুক্ত হইয়াছেন, ভগবানও তাঁহাকে অচিরেই "বুদ্ধিযোগ" দান করিবেন। শুধু তাহাই নহে, বুঝিতে হয় যে, সেই সাধকের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া তাঁহার অন্তরে ভগবানের অবস্থিতির আর বেশী বিলম্ব নাই; ভক্তের অন্তরে অবস্থিত হইয়া তিনি অচিরেই সমুজ্জ্বল জ্ঞান-দীপের প্রভায় ভক্তহৃদয়ের অজ্ঞান-অন্ধকার দূর করিবেন।

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥
তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা॥

—(গীতা, ১০।১০,১১)

এই কারণেই ঠাকুর যখনই মহারাজের নিকট তাঁহার নানা রূপ-দর্শনের কথা শুনিতেন তখনই বুঝিতে পারিতেন যে, তিনি যাহাকে নিজের হাতে ও নিজের ছাঁচে গঠন করিতেছেন, যোগদর্শনের সাধনপাদগুলি তাহার যথাযথই আয়ত্ত হইতেছে। ঠাকুর এই জন্যই আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিতেন 'হাঁ ঠিকই হইতেছে, লাগিয়া থাক্।' কোন বালককে বিদ্যাদান কালে কুশলী আচার্য্য যেমন বালকের অধিকারানুযায়ী তাহাকে সোপানের পর সোপান ক্রমে ক্রমে অতিক্রম করাইয়া থাকেন, ঠাকুরও মহারাজকে তখন তদ্রূপই করিতেছিলেন।

যেদিন ঠাকুর শুনিলেন যে মহারাজের 'বৈকুণ্ঠ-দর্শন' হইয়াছে, সেদিন আর তাঁহার আনন্দের সীমা ছিল না তিনি বলিয়াছিলেন—'দর্শনের থাক্ পার হ'য়ে এখন হ'তে তুই অখণ্ডের ঘরে গেলি।'

সেই বিচিত্র 'বৈকুণ্ঠ-দর্শন' ছিল এইরূপ—একদিন ধ্যান-কালে মহারাজ দেখিতে পাইলেন, তিনি যেন তাঁহার দেহ-রূপ আবরণের ভিতর হইতে বাহির হইয়া বিরাট শূন্যের ভিতর

দিয়া চলিতেছেন—ঊর্দ্ধে অধে পার্শ্বে অনন্তের পর অনন্ত আকাশ বিস্তৃত রহিয়াছে। এই ভাবে যাইতে যাইতে তিনি দেখিলেন, সম্মুখেই একটি অতিশয় জ্যোতির্ম্ময় অপূর্ব্ব প্রাসাদ। প্রাসাদে প্রবেশ করিতেই মহারাজের চক্ষে পড়িল মীন, কূর্ম্ম, বরাহাদি দশাবতারগণের প্রভাসমুজ্জ্বল অতুলনীয় মূর্ত্তিগুলি—সকলেই যেন প্রাণবন্ত, প্রশান্ত ও পরম রমণীয়। সেই সঙ্গে মহারাজ প্রত্যক্ষ করিলেন বলরাম, শঙ্কর, ঈশা, চৈতন্য প্রভৃতি অবতার-পুরুষদিগের সমুজ্জ্বল মূর্ত্তি। ইঁহারা সকলেই মণ্ডলাকারে আপন আপন আসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন এবং মণ্ডলের মধ্য-স্থলে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং দণ্ডায়মান রহিয়াছেন! তাঁহার দেহ হইতে স্নিগ্ধোজ্জ্বল আলোকধারা বিকীরিত হইয়া প্রাসাদের সেই দেবকক্ষটিকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিতে দেখিতে মহারাজ আত্মহারা হইয়া গেলেন। পরমুহূর্ত্তেই মূর্ত্তিগুলি একে একে আপন আপন আসন ত্যাগ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন—আর তাঁহা-দিগকে দেখা গেল না! মহারাজের ধ্যান ভাঙ্গিয়া গেল।

যাহা হউক, মহারাজের এইরূপ দেবদর্শনাদি হইত বলিয়াই মনে করা সঙ্গত হইবে না যে, 'আত্মা' তখনই তাঁহাকে বরণ করিয়াছিলেন—তাঁহাকে স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন এবং তাঁহার নিকট স্বরূপে প্রকাশিত হইয়াছিলেন। আত্ম-স্বরূপের প্রকাশ হইলেই অবিদ্যার নিবৃত্তি হয়। আত্মা

সাধককে স্বয়ং বরণ না করিলে যেমন তাঁহার নিকট আত্ম-স্বরূপে প্রকাশিত হন না, তেমনি সাধকও যতক্ষণ আত্মাকে বরণ না করিতে পারেন, আত্মার চরণে যতক্ষণ সম্পূর্ণরূপে আত্মদান করিতে না পারেন, ততক্ষণ তাঁহার প্রতি আত্মার কৃপা হয় না এবং আত্মার কৃপা না হওয়া পর্য্যন্ত কোন সাধনাই সফল হইতে পারে না। মহারাজ তখন আত্মসমর্পিত শরণাগত সেবক হইতেছিলেন, সিদ্ধিলাভে তখনও বিলম্ব ছিল। ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই তিনটিই যোগসাধনের 'অন্তরঙ্গ' বলিয়া কথিত হয়। ইহারা সংযম নামে পরিচিত এবং বুদ্ধি-ব্যাপারের সহিত সংযুক্ত বলিয়াই 'বুদ্ধিযোগ' নামে ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে। এই রূপই মনে হয় যে, মহারাজের তখন এই বুদ্ধিযোগের অনুশীলন হইতেছিল, সমত্ববুদ্ধিযুক্ত হইবার সাধনা তখন চলিতেছিল, বুদ্ধির মলিনতা তখন বিদূরিত হইতেছিল—এবং জড়পদার্থকেও চৈতন্যময়রূপে দর্শন করিবার প্রযত্ন হইতেছিল। বুদ্ধি নির্ম্মল বা 'ব্যবসায়াত্মিকা' হইলে তবে সেই বুদ্ধির দ্বারা ভগবানের সহিত যুক্ত হইতে পারা যায়।

যাহা হউক, 'বৈকুণ্ঠ-দর্শনের' ভাব লইয়া পরে মহারাজ যে অপূর্ব্ব স্তোত্র রচনা করিয়াছিলেন তাহাতেই প্রকাশ করিয়া-ছিলেন যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব সকল অবতারগণ সমষ্টিভূত হইয়া এই যুগে পূর্ণ যুগাবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি ছিলেন সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়াচার্য্য এবং শিষ্য-

দিগকে তাঁহার নিজের চিত্র দেখাইয়া বলিয়াছিলেন যে 'এক-দিন এই ছবি ঘরে ঘরে পূজা হইবে।' দেখিতে পাওয়া যায় যে, এখন তাহাই হইতে আরম্ভ হইয়াছে এবং লোকে বিশ্বাস করিতেছে—

যং ব্রহ্মবিষ্ণুগিরিশশ্চদেবাঃ
ধ্যায়ন্তি গায়ন্তি নমন্তি নিত্যম্।
তৈঃ প্রার্থিতস্তস্য পরাবতারো
দ্বিবাহুধারী ভুবি রামকৃষ্ণঃ॥

—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর যাঁহার ধ্যান করেন, যাঁহার স্তুতি-গান করেন এবং যাঁহাকে সর্ব্বদা নমস্কার দ্বারা নন্দিত করেন, বিশ্বজনের প্রার্থনা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত তিনিই এ যুগে পূর্ণাবতার দ্বিভুজধারী শ্রীরামকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

মহারাজ তাই বিশ্বজনকে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন—

দুর্ব্বারঘোরভবদাববিদহ্যমানো,
জঙ্গম্যসে মলিনবাসনয়াঽসুখাপ্ত্যৈ।
নীচাশ্রয়ং কথমহো যদি শান্তিকামঃ,
সন্তাপসংসৃতিহরং ভজ রামকৃষ্ণম্॥

—অহো! কি পরিতাপের বিষয়, ক্ষণিক সাংসারিক সুখ-লাভের আশায় এই সংসারের দুর্ব্বার ঘোর দাবানলে নিরন্তর দগ্ধ হইতেছ এবং সুখ পাইবে বলিয়া নিরন্তর বাসনাবর্ত্মে ভ্রমণ করিতেছ! তুমি এমন নীচাশ্রয় হইলে কেন? দেহেন্দ্রিয়াদি

দ্বারা লভ্য যে অনিত্য সুখ হায়, তুমি শেষে তাহাকেই আশ্রয় করিলে ? যদি সত্য সত্যই শান্তি চাও, সন্তাপ-সংসৃতি-হর সেই শ্রীরামকৃষ্ণের ভজনা কর।

"বৈকুণ্ঠ-দর্শনের" পর হইতেই মহারাজ শুধু ঠাকুরকেই ধ্যান করিতেন, কারণ তাঁহার উপর তখন সেইরূপই আদেশ হইয়াছিল। ঠাকুর তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে তাঁহার (ঠাকুরের) নিজ দেহেই সকল দেব-দেবী বিরাজ করিয়া থাকেন, সুতরাং তাঁহাকে ধ্যান করিলে সকলেরই ধ্যান করা হইবে।

শাস্ত্রও বলেন—

ধ্যান মূলং গুরোর্মূর্ত্তিং
পূজা মূলং গুরোঃপদম্।
মন্ত্র মূলং গুরোর্বাক্যং
মোক্ষ মূলং গুরোঃ কৃপা॥
ন গুরোরধিকং তত্ত্বং
ন গুরোরধিকং তপঃ।
তত্ত্বজ্ঞানাৎ পরং নাস্তি
ওঁ তৎসৎ গুরবে নমঃ॥
গুরুরাদরনাদিশ্চ
গুরুঃ পরম দৈবতম্।
গুরোঃ পরতরং নাস্তি
ওঁ তৎসৎ গুরুবে নমঃ॥

একদিন মহারাজ ঠাকুরের চরণসেবায় নিযুক্ত থাকিয়া তাঁহার নিকটে ব্রহ্মজ্ঞান প্রার্থনা করিলে ঠাকুর বলিলেন—'ব্রহ্মজ্ঞান কি সহজে লাভ করা যায়।' বাস্তবিকই তৎপূর্ব্ব হইতে মহারাজের ইহাই মনে হইত যে, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতেই হইবে। আত্মাকে চিনিল না, জানিল না যে, সে-ত মৃতকল্প। ঠাকুর বোধ হয় কালীপ্রসাদের মনের ভাব বুঝিয়াছিলেন, তাই তদ্বিষয়ে তাঁহার জ্ঞানের মাপ করিতে চাহিলেন। ঠাকুর বলিতেন—'তুই ছেলেদের মধ্যে বুদ্ধিমান। নরেন যেমন একটা মত চালাতে পারে, তুইও তা' পারবি।' আজ ঠাকুর যেন তাঁহার সেই বুদ্ধিমান পুত্রটির জ্ঞানের পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা করিলেন।

ঠাকুরের মুখে এইরূপ নৈরাশ্যজনক বাক্য শুনিয়াও মহারাজ দমিলেন না। স্বাভাবিক তেজের সহিত বলিলেন—পাতঞ্জল দর্শনে বলিয়াছে,—'তীব্র সম্বেগানামাসন্নঃ'—যাহাদের শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রভৃতি (সম্বেগ) সুতীব্র হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে ব্রহ্মজ্ঞান তো আসন্ন। এইরূপ তেজস্বী উত্তর শুনিয়া ঠাকুর খুবই প্রীত হইয়া বলিলেন—'তোর ঠিক ঠিক ব্রহ্মজ্ঞান হ'বে।' মহারাজ মনে মনে আশ্বস্ত হইলেন, কারণ তিনি জানিতেন, গুরুবাক্য বিফল হইবার নহে। সত্য সত্যই অল্পদিনের মধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুরের বাক্য সফল হইল। মহারাজ "ধ্যান যোগে নির্ব্বিকল্প অবস্থায় উপনীত হইয়া অত্যদ্ভুত তত্ত্বসমূহ উপলব্ধি

করিলেন।" ঠাকুর শুনিয়া বলিলেন যে, উহাই ঠিক ঠিক ব্রহ্মজ্ঞান। শুধু যে এই এক দিনই মহারাজ সমাধিমগ্ন হইয়াছিলেন তাহা নহে। তিনি বলিতেন যে, ঠাকুর পার্থিব দেহে থাকা কালে ধ্যান করিতে করিতে বহু দিনই তিনি সমাধিমগ্ন হইতেন। যিনি ছিলেন জন্ম-যোগী তাঁহার পক্ষে ইহা আর বিচিত্র কি?

মহারাজ বলিতেন যে, ঠাকুর একদিন তাঁহার আজ্ঞাচক্রে চিম্‌টী কাটিয়া বলিয়াছিলেন "এই আজ্ঞা চক্রে মন স্থির করবি। ন্যাংটা (সন্ন্যাসী তোতাপুরী) আমার কপালে এক টুকরা কাঁচ ফুটিয়ে দিয়ে ওইখানে মন স্থির করতে বলেছিল। যা' পঞ্চবটীতে ব'সে ধ্যান ক'রে আয়।" মহারাজ নির্জ্জনে ধ্যানে বসিবার জন্য পঞ্চবটীর দিকে অগ্রসর হইলেন। এই ভাবে ঠাকুরের নির্দ্দেশে ধ্যান অভ্যাস করিতে করিতে মহারাজের ধ্যান এতই গভীর হইত যে, মস্তকের উপর বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠের তপ্ত সূর্য্য এবং দেহতলে ততোধিক তপ্ত ধূলি-বালিও তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ করিতে পারে নাই! বরাহনগরে যখন প্রথম মঠ স্থাপিত হয়, তাই তখন মহারাজের বিশেষ নাম হইয়াছিল—কালী তপস্বী! যাহা হউক, মহারাজের মনঃসংযমের শক্তি ছিল এইরূপ অসাধারণ যে, প্রয়াগের সন্নিকটে ঝুসিতে যখন তিনি ধ্যানমগ্ন হইতেন, তখন কেল্লার বজ্রনাদী তোপধ্বনিও তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিত না!

তিনি এমনি করিয়াই মনকে অন্তর্মুখী করিতেন যে, লণ্ডনে একদিন মনঃসংযম সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবার কালে বক্তৃতা-কক্ষের পার্শ্ব দিয়া রাজপথে উচ্চরবে ব্যাণ্ড বাজাইতে বাজাইতে সৈন্যগণ কুচ্-কাওয়াজ করিয়া চলিয়া গেল, মহারাজ সে শব্দ শুনিতেই পাইলেন না! এইরূপই ছিল তাঁহার একাগ্রতা। মহারাজের জীবন যে আত্মপ্রস্তুতির ফলে সর্ব্বদা গীতাময় হইয়াই থাকিত এগুলি তাহারই সামান্য উদাহরণ মাত্র। ইহারা স্মরণ করাইয়া দেয় যে, ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন—

যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ॥

অতএব

তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত॥

—(গীতা—২।৬০,৬১)

হে কৌন্তেয়! ইন্দ্রিয়গণ অত্যন্ত চিত্তবিক্ষেপকারী। যত্নশীল বিবেকী পুরুষের চিত্তও উহারা বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া লয় অর্থাৎ বিষয়াসক্ত করে। আবার অনন্য ভক্ত যিনি, তিনি ইন্দ্রিয়কে সংযত করিয়া আমাতেই সমাহিত-চিত্ত হন। এইরূপ সমাহিত-চিত্ত ব্যক্তিই ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিতে পারেন এবং স্থিতপ্রজ্ঞ হইয়া থাকেন।

সে আজ অনেক দিনের কথা। মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, মনের একাগ্রতা কিরূপে হয়? তিনি বলিলেন—'মোকর্দ্দমার রায় লেখ কেমন করিয়া?' বলিলাম, 'তখন মোকর্দ্দমার নথি-পত্র ছাড়া আর কিছু মনে থাকে না।' মহারাজ বলিলেন—'ঐ ভাবেই ঠাকুরের ধ্যান করবে। ওরই নাম একাগ্রতা।' পরে শুনিয়াছি, ভগবানের সম্মুখে উপবেশন করাই উপাসনা। আসন শুদ্ধি করিয়া উপাসনা করিবার নিয়ম আছে। সেই আসন হইতেছে নিজের হৃদয়। হৃদয়দেশে চিত্তকে স্থির করিতে পারিলেই চিত্ত প্রশান্ত হয় এবং ঐ হৃদয়দেশেই ভগবানের বিশেষ প্রকাশও হয়। ঠাকুরও বলিতেন—"হৃদয় ডঙ্কা পেটা জায়গা। হৃদয়ে অথবা সহস্রারে ধ্যান হ'তে পারে। এগুলি শাস্ত্রে আছে। কোথায় তিনি নাই! তবে যখন সব স্থানই ব্রহ্মময়, তখন তোমার যেখানে ইচ্ছা ধ্যান করতে পার!" চিত্তকে আত্মার সমীপস্থ করাই 'আসন' এবং এই আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলেই শীত উষ্ণ, সুখ দুঃখ প্রভৃতি নানা দ্বন্দ্ব আর চিত্তকে উৎপীড়িত করিতে পারে না। যোগশাস্ত্রও তাই বলিতেছেন —"ততো দ্বন্দ্বানভিঘাতঃ।" মহারাজ এইরূপ 'আসনে' সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন বলিয়াই তুষারমণ্ডিত কেদারনাথ, বদরিকা, যমুনোত্রী ও গঙ্গোত্রীর দুঃসহ শীত তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। দুর্গম তীর্থাদির অসহ্য ক্লেশ তাঁহার

নিকট পরাজয় মানিয়াছিল! তাঁহার শেষ রোগের তীব্রতা দেখিয়া আমরা শিহরিয়া উঠিতাম, ভাবিতাম না জানি কত ক্লেশই হইতেছে; অথচ তাঁহাকে দেখিতাম প্রফুল্ল বদনে হাসিতে! আমরা বিস্ময়বিমূঢ় চিত্তে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতাম, অন্তরালে থাকিয়া চিকিৎসকগণও আমাদেরই মত বিস্ময় প্রকাশ করিতেন!

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মহারাজের শিক্ষার আদর্শ ও কর্ম্মনীতি

ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ লোকের ধর্ম্মহীনতাজনিত দুর্দ্দশায় ব্যথিত হইয়া দক্ষিণেশ্বর মাতৃমন্দিরে মহামানব গঠনের যে শিল্পশালা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন সেখানে মনের ক্ষুধায় প্রপীড়িত নর-নারী, যুবক-বৃদ্ধ, পণ্ডিত-মূর্খ, ধনী-নির্ধন, হিন্দু, মুসলমান খৃষ্টান—শাক্ত-বৈষ্ণব-কর্ত্তাভজা এবং তৎকালে নব-গঠিত ব্রাহ্মধর্ম্মের নেতৃস্থানীয়গণ সকলেই শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত পাঠ গ্রহণ করিতে আসিতেন। যিনি যেরূপ ভাব লইয়া সেখানে উপস্থিত হইতেন, তাঁহার লাভ সেইরূপই হইত। সে শিল্পশালার ধর্ম্ম-বাণিজ্য ছিল না, সেখানে ধর্ম্মই ধার্ম্মিক গঠন করিতেন। সেই ধর্ম্মপীঠে বেদ-বেদান্ত, গীতা-উপনিষদ্ ভাগবৎ বা পুরাণের প্রতিদিন যে ভাষ্য হইত তাহা ছিল প্রাণবন্ত। বিস্মৃত অতীত নবীন বেশে সেখানে আসিয়া নিত্য নিত্য উপস্থিত হইত। সেই মহাভাষ্যের প্রতিমূর্ত্তি ছিলেন ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁহাকে দেখিয়া, তাঁহার চরণপ্রান্তে নীরবে বসিয়া থাকিয়া, তাঁহার অমৃতময়ী বাণীর

ঝঙ্কার কর্ণের পথে হৃদয়ে প্রবেশ করাইয়া মুমুক্ষুগণ আপন আপন জীবন-গ্রন্থ অধ্যয়ন করিত, সুসংস্কৃত করিত—অধ্যায়ের পর নবীন অধ্যায় যোজনা করিয়া লইত। মহারাজ তাঁহার নিকট হইতেই শিক্ষার আদর্শ ও কর্ম্মনীতির মূল তত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়া উত্তরকালে একজন অভিনব আচার্য্য এবং বিরাট কর্ম্মবীর রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

কলিকাতার বিদ্যাপীঠ শিক্ষা দেয় অর্থ ও কাম লাভের পন্থা, আর দক্ষিণেশ্বর শিখাইল অর্থ ও কাম হইতে বহুদূরে থাক, মোক্ষের পথে হৃদয় বাঁধিয়া অগ্রসর হও। সর্ব্বত্র ভগবান্ বিরাজিত ইহাই প্রত্যক্ষ করিবার জন্য পণবদ্ধ হইয়া প্রস্তুত হও। যদি আত্মসংযম করিতে পার, আত্মজ্ঞান তখনই পাইবে। কলিকাতার বিদ্যাপীঠ সেদিনও যেমন, এখনও তেমনি নিত্যই শিখাইতেছে—বিচার করো। যদি সিদ্ধ হইতে পার। হয় একজন শ্রেষ্ঠ উকীল বা হাকিম হইবে —না হয় হইবে একজন শ্রেষ্ঠ দার্শনিক, বা শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক। অথবা ঐরূপ আর-একটা কিছু। দক্ষিণেশ্বর শিখাইল— দিবারাত্র বিচার করো, বিচার করিয়া সত্য লাভ করো— সত্য লাভই জীবনের উদ্দেশ্য, আর যাহা-কিছু সে সবই ফাঁকি, সবই অনিত্য, সবই দুঃখের কারণ। সত্যই শুধু ঈশ্বর, সত্যই শুধু আত্মা, সত্যই শুধু সেই অবাঙ্‌মনসো গোচর পরম ব্রহ্ম। বিচার করিয়া সত্যকে প্রতিষ্ঠা করো—সত্যে প্রতিষ্ঠিত হও।

আত্মসংযম, একাগ্রতা, ধ্যান, অধ্যবসায়, নিষ্ঠা ও আত্মত্যাগে অভ্যস্ত হইলেই সত্যের সন্ধান পাইবে ; এই সত্য বা ব্রহ্ম-জ্ঞানই ভয়ের পারে লইয়া যাইতে সমর্থ ; অন্য কিছুতে তাহা হয় না—'আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্, ন বিভেতি কুতশ্চন।'

সকল ভয়ের অধিক ভয় মৃত্যু ভয়। যে ব্যক্তি এই মৃত্যু-ভয়কে অতিক্রম করিতে পারে, তাহার পক্ষে অসম্ভব বলিয়া কোন কিছু নাই। অপরিসীম মনোবলে সে বলীয়ান্। ঠাকুরের শিক্ষার প্রভাবে আমরা মহারাজকেও ঠিক এইরূপই দেখিয়াছি। তিনি বলিতেন, মৃত্যু একটি সাধারণ পরিবর্ত্তন মাত্র—উহা ধ্বংস নহে। দেহ একটি যন্ত্র। সেই যন্ত্রের সাহায্যে দেহাবস্থিত আত্মা নানা ভাবে নিজেকে বিকাশ করিতেছেন। সেই যন্ত্র যখন কোন কারণে আত্মার উদ্দেশ্য সাধনের অযোগ্য হইয়া পড়ে, আত্মা তখনই সেই দেহ ছাড়িয়া অন্য দেহে প্রস্থান করেন। আমরা বলি দেহের ধ্বংস হয় ; কিন্তু সত্যই কি তা-ই ? যে অণু, পরমাণু, তন্মাত্রা প্রভৃতির দ্বারা দেহ গঠিত হইয়াছে সেগুলির ধ্বংস নাই। সেগুলিও নানাভাবে দেহ হইতে দেহান্তরে প্রবেশ করে। প্রতিদিনই ত দেহের মৃত্যু হইতেছে, আমার গতকল্যকার দেহ, আজিকার দেহ নহে ; শৈশবে যে দেহ ছিল, যৌবনে সে দেহ আর থাকে না। সুতরাং দেহের মৃত্যু চিন্তা করিয়া ভীত হইলে, জীবনের কোন্ সঙ্কল্পই কার্য্যে পরিণত করা সম্ভব নহে। তৃণ

খণ্ডের ন্যায় দেহকে পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত থাকাই বীরের ধর্ম্ম। মহারাজ বলিতেন—তোমরা সেই বীর্য্য লাভ করিয়া বীর হও। এই বীর্য্য লাভ করিতে হইলে কর্ম্মনীতিতে অভিজ্ঞান প্রয়োজন। তৎপূর্ব্বে জানা প্রয়োজন প্রকৃত শিক্ষার আদর্শ কি, কারণ শিক্ষায় যদি গলদ থাকে, কর্ত্তব্যপথ নির্দ্ধারণেও গলদ অবশ্যম্ভাবী হয়।

সে দিন ছিল কলিকাতা বিশ্ববিত্থালয়ের সমাবর্ত্তনের দিন। মহারাজের দর্শন পাইলে পর কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলিলেন—'আজ যাহারা 'ডিগ্রি' পাইবে, তাহাদিগের একজনও কি আত্মস্বাধীনতা লাভের শিক্ষা পাইয়াছে? কিন্তু উহাই মোক্ষাভিলাষ। বিশ্ববিত্থালয় দেশের যুবকদিগের জীবন ও শক্তি উভয়ই বৃথা ক্ষয় করিতেছে এবং তাহাদিগকে এক একটি "পাশ করা মূর্খ" করিয়া বিশ্বের সভায় উপস্থিত করিতেছে! আজ যে 'ডিপ্লোমা' দেওয়া হইবে, তাহার একখানিও জ্ঞানের পুরস্কার নহে—সবগুলিই অজ্ঞানের টীকা! বুদ্ধির মার্জ্জন মাত্র করিলেই জ্ঞান লাভ হয় না—আধ্যাত্মিক চেতনা জাগ্রত করিবার নামই প্রকৃত শিক্ষা লাভ। সেই চেতনা, সেই জ্ঞান বাহিরে নাই। আছে প্রত্যেকেরই ভিতরে। যে শিক্ষা আত্মাকে সুষ্ঠুভাবে তাহার বাল্য, কৈশোর, যৌবন ও বার্দ্ধক্যের সীমা অতিক্রম করাইয়া দিতে না পারে সে শিক্ষানীতি আদর্শহীন।

প্রত্যেক জাতিরই এক একটি আদর্শ আছে ; সে জাতি সেই আদর্শকে কিছুতেই ছাড়ে না—সেই আদর্শের সেবায় সে জীবন পণ করে। ভারতেরও একদিন একটি মহৎ আদর্শ ছিল। ঐতিহাসিক কালেরও বহুপূর্ব্ব হইতে ভারতের আদর্শ, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক জাগরণ। সেই জন্যই এ দেশে কপিল মুনির আগমন, কণাদের জন্ম ; শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবুদ্ধ. শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভৃতির অবতারের দেহ ধারণ--শ্রীশঙ্করের গৌরব-বিভব। আজ জাতির মনের মরণ আরম্ভ হইয়াছে! দেহের মৃত্যু অপেক্ষা মনের মৃত্যু শত গুণে বেশী সর্ব্বনাশা। উপযুক্ত শিক্ষা বিস্তার করিয়া মনকে মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করিতে হইবে—নাস্তি গতিরন্যথা।

হার্বার্ট স্পেন্সার বলিয়াছেন—জীবনকে পরিপূর্ণ করাই শিক্ষার আদর্শ। আজকাল সেই পরিপূর্ণতার দিকে দৃষ্টি কই ? এখন শিক্ষার উদ্দেশ্য হইয়াছে শুধুই টাকা-আনা-পাই – শুধু দোকানদারী—শুধু আত্মবিক্রয়! তাই 'পাশকরা মূর্খের' দলে দেশ ভরিয়া উঠিল! ইহার জন্য আমরাই দায়ী—অন্যে নহে। সার মনিয়ার মনিয়ার উইলিয়াম্‌স্ কি বলিয়াছিলেন জান ? বলিয়াছিলেন—স্পাইনোজার জন্মের দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্ব হইতেই হিন্দুরা স্পাইনোজাইট্—ডারউইনের জন্মের বহু শতাব্দী পূর্ব্ব হইতেই তাহারা ডারউইনিয়ান্। একালের বৈজ্ঞানিক এই সে-দিন মাত্র বিবর্ত্তনবাদকে

স্বীকার করিয়াছে। কিন্তু হিন্দুরা বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই বিবর্ত্তনবাদী।

হিন্দুদিগের সে গৌরব, সে প্রতিষ্ঠা, সে সম্মান আজ গেল কেন, কেহ কি এ বিষয়ে একটুও ভাবে? আমি পঁচিশ বৎসর ধরিয়া আমেরিকার নগরে নগরে ঠাকুরের কথা শুনাইয়াছি, ভারতের এই কীর্ত্তির গান গাহিয়াছি, ইউরোপের কত সভামণ্ডপে এই কথাই কহিয়াছি। খৃষ্টান মিসনরিরা যে স্বার্থসিদ্ধির জন্যই সে সকল দেশে ভারতের হিন্দুকে বর্ব্বর বলিয়া পরিচিত করিয়াছিল, তাহা দেখাইয়া দিয়াছি। আমেরিকার যুক্তরাজ্যে এবং কানাডার বহু শিক্ষা-সংসদে ভারত-সংস্কৃতির গৌরব ঘোষণা করিবার সুযোগ আমার হইয়াছিল। আমি দেখাইয়া দিয়াছি যে, ধর্ম্মতত্ত্ব ছাড়াও জ্যামিতি, বীজগণিত, ক্ষেত্রতত্ত্ব, কিমিতি, চিকিৎসাশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, ফলিত জ্যোতিষ, দেহ-বিজ্ঞান, সঙ্গীতশাস্ত্র প্রভৃতি সমস্তই পৃথিবীর মানবের দ্বারে—ভারতের অযাচিত দান। ভারত রাজপুত্র। আজ সে হৃতসর্ব্বস্ব হইয়াছে। তাহারই প্রাচীন 'হিতোপদেশ'কে আজ সে নিজেই পাঠ করিতেছে সমুদ্রপারের ঈসপের ও পিল্‌পাইএর গল্প-লহরীতে। একদিন আমাদের আর্য্যভট্ট ছিলেন পাশ্চাত্যের নিউটন এবং ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, পৃথিবীই সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে আবর্ত্তিত হইতেছে। তিনিই মাধ্যাকর্ষণের

আবিষ্কর্তা। তখন ও-দেশের কোপারণিকস্ কোথায় ছিলেন? এই বিশ্ব যে অণুদ্বারা গঠিত এবং সেই অণুও যে আবার অবিভাজ্য এবং অক্ষয় এ-কথা কণাদের পূর্ব্বে কি পৃথিবী কখনও শুনিয়াছিল? কপিল আবিষ্কার করিলেন তন্মাত্রা—আজ যাহা এ যুগের বৈজ্ঞানিকের মুখে ইলেক্‌ট্রন্ ও প্রোটন্ নামে প্রচারিত হইতেছে!

হিন্দুর ষড়্‌দর্শনের তুলনা পৃথিবীতে কই? উহাই ছিল ভারতের সভ্যতার পাদপীঠ। 'জ্ঞানান্মুক্তি' ইহাই হইল ভারতের মন্ত্র। দেহাভিমান বিনষ্ট হইলেই শুদ্ধ আত্মবোধ জন্মে। যাহার আত্মবোধ হইল, তাহার দুঃখানুভূতি দূর হইয়া গেল। জ্ঞানের দ্বারাই দেহাভিমান দূর হয়। বিষয়ের প্রতি আসক্তি জ্ঞানলাভের অন্তরায়। তাই ঋষি বলিয়াছেন—'বৈরাগ্যাদভ্যাসাচ্চ' এবং ধ্যানের দ্বারা বিষয়াসক্তি নষ্ট করিতে হয়। 'ধ্যানং নির্ব্বিষয়ং মনঃ'—যিনি ধ্যানসিদ্ধ তাঁহার মন আর বিষয় গ্রহণে উন্মুখ হয় না। ধ্যানপ্রবাহই রাগ, দ্বেষাদি দোষকে ধুইয়া দিয়া বিষয়-বৈরাগ্য আনয়ন করে। এই ছিল সেকালের শিক্ষার আদর্শ, আর একালে দেখিতেছি বিষয়-অনুরাগই শিক্ষার আদর্শ! সুতরাং আমাদের এই জাতি বীর্য্যহীন ও মৃতকল্প হইবে না ত কি? সেকালের শিক্ষানীতি ছিল ইহারই পাদপীঠের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই তাঁহারা হইয়াছিলেন এক একটি 'দাতা

কর্ণ?—আর এ-কালের বি-এ, এম্-এ-রা পুস্তকের স্তূপ কণ্ঠস্থ করিয়া শেষে মাসিক পঞ্চাশ মুদ্রায় নিজেকে বিক্রয় করে—রাজাধিরাজের পুত্র ভিখারী! সেকালের নালন্দা বা তক্ষশীলা এমন বিদ্যা দান করিত না।

এখন আমেরিকা তাহার শিক্ষার আদর্শকে নূতন ভাব দিতে আরম্ভ করিয়াছে; তাহারা দেশের বালক, কিশোর ও যুবকদিগের মনের প্রসার বৃদ্ধি করিতেছে। যে স্বাধীন চিন্তার জন্য ভারতবর্ষ একদিন পৃথিবীর পূজা পাইয়াছিল—আজ তাহার সে চিন্তার দ্বারে হিমালয় পর্ব্বত খসিয়া পড়িয়াছে! আজ আমরা উৎসব করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন করিতেছি—কিন্তু একটিবারও কি ভাবিয়া দেখি যে, তাহা দাসমনোবৃত্তিরই পূজা ভিন্ন আর কিছুই নহে!

ভগবানই সর্ব্ব জ্ঞানের আকর। আমরা এখন তাঁহাকে ছাড়িয়া জড়বাদের পশ্চাতে ধাবমান হইয়াছি। আমরা এখন ভুলিয়া গিয়াছি—

অয়ং নিজঃ পরো বেতি গণনা লঘুচেতসাম্।
উদার চরিতানান্তু বসুধৈব কুটুম্বকম্॥

আজ আমরা বর্ত্তমান শিক্ষার গুণে বসুধাকে কুটুম্বরূপে দেখিবার চক্ষু হারাইয়াছি। এখনকার নীতি—যার-যার, তার-তার! পরার্থে কর্ম্ম করিবার যে উপদেশ আমরা পৃথিবীর মহাপুরুষদিগের মুখে এতদিন শুনিয়া আসিয়াছি,

বর্ত্তমান শিক্ষার গুণে আমরা সেই লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া যেমন বীর্য্য হারাইয়াছি, তেমনি হারাইয়াছি ঔদার্য্য। আমিত্বের তো বিসর্জ্জন হয় নাই, বরং উহা দিনে দিনে আরও বেশী বীর্য্যবান্ হইয়া উঠিতেছে! সে জন্য কর্ম্মদেবীর নিকট হইতে গুরু দণ্ড লইতেই হইবে। এই দণ্ডের হস্ত হইতে কিছুতেই নিষ্কৃতি নাই। ভারতের অবনতির কারণই হইতেছে বিলাসপ্রবণতা, আত্মসুখপরায়ণতা, বিষয়ের প্রতি দুর্দ্দম লোভ এবং ব্রহ্মচর্য্যের অভাব!

চণ্ডালের কুলে জন্মিয়াছে যে, তাহার জন্ম দৈবায়ত্ত। সে কথা বিস্মৃত হইয়া আমরা তাহাকে কুসংস্কার ও স্বার্থ-সিদ্ধির কারণে চণ্ডাল করিয়াই রাখিলাম! তাহার মধ্যেও যে ভগবান্ আছেন এবং সেই চণ্ডালকে উপযুক্ত সুযোগ দিলে সে-ও যে সেই অনন্তশক্তিময় ভগবানকে প্রকাশ করিতে সমর্থ, একথা ভুলিয়া গিয়া আমরা নিজেরাই আমাদিগের বন্ধন শৃঙ্খলকে সুদৃঢ় ও সুদীর্ঘ করিতেছি!

মহারাজ তাই বলিতেন যে, নিখিল মানবের ধর্ম্ম যে বেদান্ত তাহাই আবার আমাদিগের আদর্শ হউক। আমিত্বে ধর্ম্ম নাই—উহার বিসর্জ্জনেই ধর্ম্ম। অনুষ্ঠান ধর্ম্ম নহে, মতবাদ ধর্ম্ম নহে, সমাজের বা সঙ্ঘের বা কোন ধর্ম্মমতের অনুশাসনও সত্যকার ধর্ম্ম নহে; মূর্ত্তি ধর্ম্ম নহে—প্রতিমা-বিনাশী-নীতিও ধর্ম্ম নহে! মানুষের প্রয়োজনে এই সকল

বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়া থাকিলেও, সত্য ধর্ম্ম যাহা, তাহা আছে এই সকল বিধানের অন্তরালে। তাহা মানবমাত্রেরই এক ও সনাতন ধর্ম্ম। সেই ধর্ম্মনীতিকে আদর্শ করিয়া দেশের শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত,—সে ধর্ম্মের নাম হিন্দু হউক, বৌদ্ধ হউক, ইস্‌লাম হউক বা ঈশাহী হউক, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না।

মহারাজ নানা স্থানে এইরূপ কথাই ঘোষণা করিয়াছেন। সেই ধর্ম্মকে বাদ দিয়া বিদ্যায়তন গঠন করিলে, মঙ্গলময় দেবতার আসন সেই বিদ্যামন্দিরে কখনই স্থাপিত হইতে পারিবে না। আমরা অপরা বিদ্যাও শিখিব—কিন্তু তাহা পরা বিদ্যা লাভ করিবার জন্য, অন্য উদ্দেশ্যে নহে। শুধু অপরা বিদ্যা লইয়াই আমরা বসিয়া থাকিব না—পরিতৃপ্ত হইব না। ঐ বিদ্যালাভ প্রকৃত শিক্ষার আরম্ভ মাত্র।

মহারাজ বলিতেন যে, জাতিকে গঠন করিতে হইলে আমাদিগের আর একটি প্রধান কর্ত্তব্য দেহকে বলিষ্ঠ করা। এই দেহই দেবতার মন্দির। সেই মন্দিরই যদি যথাযোগ্য সেবার অভাবে ভাঙ্গিয়া পড়ে তবে দেবতাকে কোথায় আনিয়া বসাইবে! আমাদের মাংসপেশীকে করিতে হইবে লোহায় গড়া এবং শিরা-উপশিরা হইবে ইস্পাতের! তাহার সঙ্গে সঙ্গে মনকে করিতে হইবে উদার, বৃহৎ, মহৎ ও সর্ব্বপ্রকার দোষবিবর্জ্জিত। মহারাজের উপদেশই এই যে, যে-শিক্ষায়

এই সকল পাইব, তাহাই আদর্শ শিক্ষা। সেই শিক্ষাই মনুষ্যত্ব দান করিবে—মনুষ্যের কঙ্কাল গঠন করিয়া সমাবর্ত্তন-সভায় তাহার জয় ঘোষণা পূর্ব্বক আমরা যেন আত্মপ্রসাদ লাভ না করি! মনে পড়ে একদিন স্বামীজিও বলিয়াছিলেন—"এ দেশের এই যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা এতে শতকরা বড় জোর একজন কি দুই জন দেশের লোক শিক্ষা পাচ্ছে।"

মহারাজের নিকট হইতে যে প্রাণাগ্নি লইয়া সে দিন বিদায় হইয়াছিলাম, তাহা এখনও জ্বলিতেছে বটে, কিন্তু দেখিতেছি এই জড়বাদের দিনে তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিবার লোক নাই। দেখিতেছি কল্যাণের পথে কাঁটা পড়িয়াছে এবং জীবনের পথ ক্রমেই অন্ধকারাচ্ছন্ন হইতেছে।

যে শিক্ষাব্যবস্থায় মনকেই হারাইতে হয় তাহা, আর যাহা হউক, শিক্ষার আদর্শ নহে এবং মহারাজেরও শিক্ষার আদর্শ ছিল না তাহা। শিক্ষার আদর্শ যে কি হওয়া উচিত, মহারাজ ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে পাটনার এক সভায় সবিস্তরে তাহা বলিয়াছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছিলেন যে, এক্ষণে ছেলেদের বিদ্যা 'ধোবা ভাঁড়ারের' মত—নিজের কিছুই নাই। সবই পরের নিকটে ধার করা।

আমাদের এই দুর্ভাগা দেশে ধর্ম্মশিক্ষার অভাবে আজিকার এই জীবন-মরণ-সমস্যাকে সম্মুখীন করিয়া অনেকের মন ভগবানের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করিতে উদ্যত হইয়াছে। তাহারা

ভাবিতেছে, বিনাপরাধে আজ কেন এই দণ্ড ভোগ! হয়ত ঐতিহাসিক এবং দার্শনিকগণ নানা গবেষণা করিয়া বলিবেন, এই দণ্ড, ব্যষ্টির অতীত পাপের জন্য সমষ্টির প্রায়শ্চিত্ত! লোকের মন এই কথায় শান্ত হইতে পারিবে না, কারণ ধর্ম্মহীন শিক্ষার জন্য সে মন দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। এই ভাল-মন্দ ইষ্টানিষ্টের জন্য সে ভগবানকেই দায়ী করিতে চাহিবে—কারণ তাহা না করিতে পারিলে নিজের দায়িত্ব এড়াইতে পারা যায় না!

মহারাজ যেমন বুঝাইয়াছিলেন, আজ তেমনি সহজ, সরল ও মর্ম্মস্পর্শী করিয়া সকলকে বুঝাইবার প্রয়োজন আসিয়াছে যে, ভাল এবং মন্দ শুধু মনে, বাহিরে নহে। যাহা আমাকে আঘাত করে, যাহা আমাদের বর্ত্তমান স্বার্থের পরিপন্থী—হউক না কেন তাহা অন্য কোন দিকে ভাল—আমরা তাহাকেই বলিব মন্দ। নদীর ভাঙ্গন-তীরে দাঁড়াইয়া যে নদীকে বলি রাক্ষসী, সেই নদী যেখানে অপর পারে পলি-মাটী ঢালিতেছে, সেখানে দাঁড়াইয়া সেই নদীকেই বলিব মঙ্গলদায়িনী লক্ষ্মী!

অল্প লইয়া থাকি মোরা
তাই যাহা যায়—তাহা যায়!

আমরা এখন ভুলিয়া গিয়াছি—'যো বৈ ভূমা তৎ সুখম্—নাল্পে সুখমস্তি'—আমরা স্বার্থপর হইয়াছি। স্বার্থপরতাই পাপ; নতুবা 'পাপ' বলিয়া আর কিছু নাই!

যে মহর্ষির হোমকুণ্ড হইতে মহারাজ বা স্বামীজি বা তাঁহাদিগের গুরুভ্রাতৃগণ অমৃতভাণ্ড করে সমুত্থিত হইয়া বিশ্বে প্রাণ পরিবেশন করিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রাণ পাইয়াছিলেন সেই মহর্ষিরই শ্রীকর হইতে। শিক্ষার আদর্শ যে কি, তাহা তাঁহারই শ্রীমুখ হইতে তাঁহারা শুনিয়াছিলেন; শুনিয়াছিলেন, 'যত্র জীব তত্র শিব'—শিব জ্ঞানে জীবের সেবা এবং ভগবানের উদ্দেশে অর্থাৎ পরার্থে সর্ব্ব কর্ম্ম সম্পাদন। এই শিক্ষা-নীতি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সেবাকার্য্যে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে।

ইষ্টানিষ্ট তত্ত্ববিষয়ক একটি মনোজ্ঞ ভাষণে মহারাজ বলিয়াছেন যে, কার্য্য ও কারণ—ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার মানদণ্ডে তুলিয়াই দণ্ড ও পুরস্কারের বিচার হয়। আজ যে কর্ম্ম করিলাম, তাহার ফল আজিও পাইতে পারি—সুদূর অনাগত ভবিষ্যতেও পাইতে পারি। কিন্তু উহা পাইতেই হইবে। ভগবান সর্ব্বদা সম—কৃপণও নহেন, অকৃপণও নহেন, দণ্ডদাতাও নহেন, পুরস্কর্ত্তাও নহেন। আমরাই আমাদের দণ্ডদাতা ও পুরস্কর্ত্তা।

But we shall see the expression of one law of causation everywhere. Thus we......shall understand that our misery is but the result of our own acts which we did in this life or in the past incarnation (১)

---

(১) The Philosophy of Good and Evil—Swami Abhedananda.

আজিকার এই দুর্য্যোগের প্রথম মেঘ কবে এবং কিভাবে আকাশে দেখা দিয়াছিল, ঐতিহাসিক এবং দার্শনিকগণ সেই তত্ত্বের আবিষ্কার করুন, কিন্তু আমরা যেন না ভুলি কর্ম্ম-ধর্ম্মের এই অখণ্ডনীয় বিধি—যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল।

বিধিলিপি বা 'কিস্‌মৎ' বা অদৃষ্টের কোন স্থান জগতে নাই। যে কারণে যে ফল ভুগিতেছি, সেই কারণটি যতদিন অনাবিষ্কৃত আছে ততদিনই অদৃষ্টের উপর সকল বোঝা চাপাইয়া দিই! মহারাজ তাই বলিয়াছেন—our present is the resultant of our past, and our future will be the resultant of our present thoughts and deeds. (২) —আমাদিগের অতীত কর্ম্ম ও চিন্তার দ্বারা আমরা আমাদিগের বর্ত্তমানকে রূপ দিয়াছি এবং বর্ত্তমানের কর্ম্ম ও চিন্তার দ্বারা ভবিষ্যৎকে গঠন করিতেছি।

কর্ম্মকাণ্ডের তৃতীয় অমোঘ বিধান—উহার প্রতিশোধ-নীতি। যে আজ আমাকে বা দেশকে বঞ্চনা করিল—সে আজ নিজেকেই বঞ্চনা করিল। ইহাই কর্ম্মদেবীর দণ্ডনীতি। কুকর্ম্ম এবং তাহার যোগ্য দণ্ড—একই বৃন্তে প্রস্ফুটিত দুইটি ফুল। একটি লইলেই অপরটিকেও লইতে হইবে। সেন্ট্ বার্ণার্ড বলিয়াছেন—'আমি নিজে ভিন্ন আর কেহ আমার অনিষ্ট করিতে পারে না। যে দুর্ভোগ আমি আজ ভোগ

(২) Doctrine of Karma—Swami Abhedananda.

করিতেছি, আমিই তাহাকে এতদিন বহন করিয়া আসিয়াছি।' মহারাজ তাই বলিয়াছেন—

The Doctrine of Karma alone can explain the mysterious problem of good and evil and reconcile man to the terrible and apparent injustice of life. (৩) এই মহৎ বাণীটি সর্ব্বদা স্মরণপথে রাখিতে পারিলে অতি বড় দুঃখকেও সহ্য করিতে পারা যায়।

একদিন—

পঞ্চনদের তীরে
বেণী পাকাইয়া শিরে
দেখিতে দেখিতে গুরুর মন্ত্রে
জাগিয়া উঠিল শিখ্
নির্ম্মম নির্ভিক্। (৪)

আর একদিন বাঙ্গালার ভাগীরথী তীরে কয়েকজন 'বাঙ্গালী-শিখ' গুরুর মন্ত্রে জাগ্রত হইয়া উঠিলেন, পঞ্চনদের শিখের মতই নির্ভীক—মৃত্যুকেও তাঁহারা তুচ্ছ জ্ঞান করিলেন এবং 'বহুজন-হিতায় নিজ নিজ স্বার্থকে বলি দিয়া তাঁহারা হইলেন 'নির্ম্মম' এবং 'নিরাশী'। সাধনশক্তির প্রভাবে তাঁহারা হইলেন 'সম সুখ-দুঃখী' এবং 'রাগ-দ্বেষবিমুক্ত'। 'লোকসংগ্রহচিকীর্ষাই'

---

(৩) Doctrine of Karma—Swami Abhedananda.
(৪) বন্দীবীর—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ছিল তাঁহাদিগের সকল কর্ম্মপ্রেরণার মূল উৎস। সর্ব্বারম্ভ-পরিত্যাগী, বিতরাগভয়ক্রোধী এই 'আত্মরতি' 'নিরহঙ্কার' ও 'নিস্পৃহ' নবযুগের নবীন সন্ন্যাসীর দল 'যত মত তত পথের' জয় ঘোষণা করিলেন—দেখাইয়া গেলেন যে, তেমন শক্তিমান্ হইলে পৃথিবীর ভাবধারার গতিমুখ ফিরাইতে একজনই যথেষ্ট! ঠাকুর তাঁহাদিগকে বার বার বলিয়া গেলেন—ওরে আমি যে ষোল টাং করেছি, সে তোদেরই নজিরের জন্য। তোরা অন্ততঃ এক টাং করিস্। অদ্বৈত জ্ঞান আঁচলে বেঁধে, যা' ইচ্ছা তা' করিস্। কেবল সকল সময়ে মনে মনে জানিস্ যে এই 'আমি'—সেই 'বড়'-আমি, সেই 'পাকা' আমি।

তাঁহাদিগের গুরু-শিষ্য-সম্পর্ক একালের গুরু-শিষ্য-সম্পর্ক ছিল না। তাহা ছিল এতই নিবিড় ও সুমিষ্ট যে কি পড়া-শুনায়, কি শয়নে স্বপনে, কি আহারে বিহারে শিষ্যের মনে শুধু গুরুর মূর্ত্তিই উদিত হইত— পিতামাতার স্নেহ তাঁহাদিগের নিকট তিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এই কারণেই মহারাজ বিদ্যালয়ের একজন প্রতিভাবান ছাত্র হইয়াও 'সেমিনরি' কামাই করিয়া মাতা-পিতাকে না জানাইয়া এক বস্ত্রে ছুটিয়া আসিতেন গুরু-মন্দিরে। গুরু যে তাঁহার সকল ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং নিজেরই অনুরূপ করিয়া স্বহস্তে তাঁহাকে গঠন করিতেছিলেন। যে ভাবে প্রবুদ্ধ করিয়া শ্রীগুরু তাঁহাকে লালিত, বর্দ্ধিত, প্রকাশিত ও পরিচালিত করিয়া-

ছিলেন, কাহারও সাধ্য ছিল না যে, তাঁহাকে সেই ভাবমুখ হইতে ভিন্ন পথে চালনা করেন

শ্রীপ্রভুর উপদেশ দিবার প্রণালী ছিল অদ্ভুত। 'যাহার যা' পেটে সয় তিনি তাহাকে সেইটুকু মাত্রই দিতেন, তাহার অধিক নহে! কখনও বা একত্রে সমবেত ভক্তবৃন্দকে—কখনও বা কোন উৎসবক্ষেত্রে নিজে নাচিয়া গাহিয়া, বাণীর পরে বাণী দিয়া, সঙ্গে সঙ্গে শক্তি সংক্রমণ করিয়া তিনি একসঙ্গে বহু-লোকের হৃদয়ে ধর্ম্মভাব জাগ্রত করিয়া দিতেন। এইরূপ উৎসবে যোগ দিয়া শ্রদ্ধান্বিত ভক্ত এক দিনে যাহা লাভ করিতেন, সেরূপ সুযোগ না ঘটিলে সমস্ত জীবনকালেও তাহা হয়ত আর পাওয়া ঘটিত না! নিজ অন্তরঙ্গ ভক্তদিগের সম্বন্ধে তাঁহার ঐ সকল ব্যবস্থা তো ছিলই, আর ছিল প্রত্যেককে একাকী নিকটে রাখিয়া উপদেশ দান। এই প্রসঙ্গে "রামকৃষ্ণ পুঁথি"তেও কিছু বিবৃতি আছে। ভক্ত কবি লিখিয়াছেন—

অন্তরঙ্গদের মধ্যে দ্বিবিধ প্রকৃতি।
কেহ কেহ ত্যাগী, কেহ গৃহস্থের জাতি ॥
ভাব ভেদে উভয়েই ভিন্ন উপদেশ।
যাহে হবে উভয়ের মঙ্গল অশেষ ॥
প্রভুর কৌশল এক ইহার ভিতরে।
জানিতে না দেন কিবা উপদেশ কারে ॥

* * *

তাঁরে দেন সেই রস লীলার ঈশ্বর।
যে রস যাহার পক্ষে পরিপুষ্টিকর ॥(৫)

মহারাজের জীবনী আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, তিনি প্রথম হইতেই ছিলেন "ত্যাগী", "গৃহস্থের জাতি" ছিলেন না এবং নানা সময়ে নিভৃতে উপদেশ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার যে কবিতাটি স্থানান্তরে উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা হইতেও ইহাই বুঝিতে পারা যায়।

নানা সময়ে নানা ভাবে উপদিষ্ট হইয়া উত্তরকালে মহারাজের বুদ্ধি হইয়াছিল "জ্ঞানে প্রদীপ্ত, সাধনায় বোধি হইয়াছিল প্রস্ফুট, হৃদয় হইয়াছিল আত্মপ্রসাদে পূর্ণ। তাঁহার ইচ্ছা ছিল বিশ্বমানবের সেবায় তৎপর, কার্য্য ছিল বেদান্তবাণী প্রচার।" দেশে-বিদেশে সুবিখ্যাত দর্শন শাস্ত্রের আচার্য্য মহেন্দ্র নাথ বলিয়াছেন—

"স্বামীজির (স্বামী অভেদানন্দ) জীবনের দুইটি দিক—একটি জ্ঞানের এবং অপরটি ধর্ম্মের। তাঁহার জীবন এই দুইটি দিকই সুসমন্বিত হইয়াছিল। বেদান্তদর্শনে তাঁহার মনীষা ছিল অপূর্ব্ব; সমগ্র ভারতে ঐ বিষয়ে তাঁহার সমকক্ষ বেদান্তবিৎ আর বোধ হয় কেহ ছিলেন না। যে বিরাট সত্যটি যাজ্ঞবল্ক্য, গৌতম, শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরামকৃষ্ণের হৃদয়ে

৫। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি—শ্রীঅক্ষয়কুমার সেন। (উদ্বোধন) দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৩১। ৬১৩ পৃষ্ঠা।

বিকশিত হইয়াছিল, সেই সত্য লাভের জন্য তাঁহার হৃদয়ও তৃষাকুল থাকিত। সেই বিরাট পুরুষ এবং মানবাত্মার সম্বন্ধ যে অভিন্ন এবং মানবাত্মার সহিত নিখিল বিশ্বের সম্বন্ধও যে তদ্রূপ; আত্মা অমর ও অবিনশ্বর—মৃত্যু একটি ক্ষণিক ছায়া মাত্র যাহা জীবনের পটভূমিকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে—"মৃত্যুর পরেও জীবন প্রবাহ অক্ষুণ্ণ থাকে"—যে জ্ঞানের দ্বারা এই সকল বিষয় উপলব্ধি করিয়া আনন্দ লাভ করিতে পারা যায়—সেই জ্ঞানসমুদ্ভব পরমানন্দ লাভের জন্য স্বামী অভেদানন্দের হৃদয় সর্ব্বদাই আকৃষ্ট হইত। বহু অক্লান্ত সাধনার দ্বারায় তিনি এই সত্যকে উপলব্ধি করিয়াছিলেন।" (৬)

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে একজন ভক্ত ঠাকুরের ভোগের জন্য কতকগুলি কুল্‌পি বরফ আনিলে ঠাকুর সরল বালকের মত অনেকগুলি খাইয়া ফেলিলেন। তাহার ফলে কয়েক-দিনের মধ্যেই তাঁহার গলায় বেদনা উপস্থিত হইল। যে দিন বেশী কথা কহিতেন কিম্বা সমাধিস্থ হইতেন, সেই দিন সেই বেদনা বৃদ্ধি পাইত। কেহ তখন স্বপ্নেও ভাবে নাই যে, এই ব্যথা কালরূপে আসিয়া দেখা দিয়াছে! মহাশক্তি কালের মধ্যেই বেদনা হ্রাস না হইয়া ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মহারাজের নিকট শুনা গিয়াছে যে, রোগ উপশমের

(৬) আচার্য্য মহেন্দ্রনাথ সরকার, এম্-এ, পি-এইচ-ডি।

জন্য যে সকল প্রলেপাদি ব্যবহার করা হইতেছিল তাহাতে বিশেষ-কিছু ফল হইতেছে না দেখিয়া ঠাকুরকে কলিকাতায় লইয়া তৎকালপ্রসিদ্ধ দুর্গাচরণ ডাক্তার মহাশয়ের দ্বারায় চিকিৎসা করান স্থির হইল। গোলাপ-মা, ঠাকুরের ভৃত্য লাটু মহারাজ ও কালী মহারাজ পরদিন প্রাতে ঠাকুরকে লইয়া কলিকাতায় যাইবেন এইরূপ স্থির হওয়ায় কালী মহারাজ সে রাত্রি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সেবাতেই অতিবাহিত করিলেন—গৃহে গেলেন না।

পরদিন প্রভাতে ঠাকুর, গোলাপ-মা ও লাটু-মহারাজকে লইয়া মহারাজ নৌকাযোগে কলিকাতায় আসিলেন। ডাক্তারের দ্বারা পরীক্ষিত হইয়া দক্ষিণেশ্বরে ফিরিবার পথে ঠাকুরের ইচ্ছা হইল যে, বিডন-বাগান দেখিয়া যান, কারণ তিনি শুনিয়াছিলেন যে, সেই উদ্যানে ফুলের কেয়ারি করিয়া তাহার মধ্যে নানা বর্ণের সিমেণ্ট সহযোগে Freemason দিগের অনেকগুলি মুদ্রা প্রস্তুত করা হইয়াছিল। ফুলের মধ্যে নানা বর্ণের সিমেণ্টের কাজ দেখিতে খুবই সুন্দর ছিল। ঠাকুর সেই মুদ্রাগুলি ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতে লাগিলেন।

দর্শন শেষ হইলে পর যখন সকলে আসিয়া আহিরি-টোলার ঘাটে নৌকায় উঠিলেন তখন মধ্যাহ্ন অতিক্রান্ত হইয়াছে। এতক্ষণ অনাহারে থাকায় সকলেই ক্ষুধিত হইয়া-ছিলেন। পরামাণিকের ঘাটের নিকট নৌকা আসিলে ঠাকুরের

আদেশে ঘাটে নৌকা ভিড়ানো হইল এবং কালীমহারাজ চারি পয়সার ছানার মুড়কি আনিয়া ঠাকুরের সম্মুখে রাখিলেন। ইহার বেশী কিনিবার পয়সা তখন কাহারও সঙ্গে ছিল না।

গলরোগক্লিষ্ট ঠাকুর ধীরে ধীরে সমস্ত মুড়কিগুলি খাইয়া ঠোঙ্গাটি গঙ্গায় নিক্ষেপ করিলেন এবং অঞ্জলি অঞ্জলি জল পান পূর্ব্বক পরিতৃপ্তির কয়েকটি উদ্গার তুলিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গী তিনটিরও ক্ষুন্নিবৃত্তি হইয়া গেল; তাঁহারা মনে করিতে লাগিলেন, কতই না গুরুভোজন করিয়াছেন! ঠাকুর তাঁহাদিগের দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

পুরাকালে বনবাসিনী দ্রৌপদীপ্রদত্ত এক কণিকা শাকান্ন আহার করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যখন পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন তখনই রুদ্রসম প্রদীপ্ত দুর্ব্বাসা ঋষির ও তাঁহার বহু শিষ্যের ক্ষুৎ-পিপাসা মুহূর্ত্তে বিদূরিত হইয়াছিল এবং হতদর্প দুর্ব্বাসা বিমূঢ়চিত্তে নিজাশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। বহুকাল পর সেদিন ভাগীরথীবক্ষে সেই লীলার পুনরাভিনয় দর্শনে মহারাজের বিস্ময়াবিষ্ট মনে বারংবার এই কথাই উদিত হইতে লাগিল যে, "তস্মিংস্তুষ্টে জগৎ তুষ্টং, প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ"—পরমাত্মার তুষ্টি হইলে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডই পরিতুষ্ট হয় এবং শ্রীশ্রীঠাকুরই সেই পরমাত্মা, যাঁহার ক্ষুন্নিবৃত্তি হইল বলিয়া আজ তাঁহাদিগেরও ক্ষুধা দূর হইল! মহারাজ নির্ব্বাক হইয়া

ঠাকুরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। দেখিলেন সে মুখকমল ঈষৎ হাস্যে বিকশিত হইয়া আছে।

নৌকা ধীরে ধীরে আসিয়া দক্ষিণেশ্বরের ঘাটে লাগিল। মহারাজ বুঝিলেন যে, আজ একটি নূতন শিক্ষা লাভ করিলেন; বুঝিলেন যে জীবাত্মা ও পরমাত্মার সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য ও অভিন্ন। এতদিন গ্রন্থে যাহা পাঠ করিয়াছিলেন আজ তাহার প্রত্যক্ষ অনুভূতি হইল। শাস্ত্রে যাহা লিখিত আছে তাহার কোনও কিছুই যে মিথ্যা নহে, সেই দিন হইতে এই জ্ঞান লাভ করিয়া মহারাজ চরিতার্থ হইলেন। পরবর্ত্তীকালে তিনি বলিতেন—গীতা, ভাগবত, পুরাণাদি সবই ঋষিবাক্য। কিছুই মিথ্যা নহে—সবই সত্য, ঠিক ঠিক অর্থ বুঝিতে হইলে ভিতরে প্রবেশ করিতে হয়।

উদাহরণ স্বরূপ মহারাজ বলিয়াছিলেন শ্রীকৃষ্ণের ঝুলন-যাত্রার কথা। রাধা-কৃষ্ণ অনন্তকাল ধরিয়া সৃষ্টির কেন্দ্রে ঘড়ীর পরিদোলকের মত অবস্থিত। তাঁহারা কেন্দ্র হইতে নিরন্তর দুলিতেছেন; যখন দক্ষিণে যাইতেছেন তখন রচনার পর নবীন রচনা হইতেছে—সৃষ্টির পর সৃষ্টি। আবার যখন দুলিতে দুলিতে বামে যাইতেছেন তখনই সৃজনশক্তি সংহত হইতেছে, প্রলয় ঘটিতেছে। প্রকাশ এবং লয়, প্রকাশ এবং লয় এই ভাবে অনাদিকাল হইতে সৃষ্টিলীলা চলিয়া আসিতেছে। সৃষ্টির মূলীভূত এই জগৎকেন্দ্র নারায়ণের নাভিপদ্ম। অস্তু

লোককে সৃষ্টির তত্ত্ব বুঝাইবার জন্যই ঝুলন যাত্রার একটি কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। ইহা রূপক মাত্র।

সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য করিবার জন্য হিন্দুধর্ম্ম ও দর্শনাদির নানা তত্ত্ব রূপকে প্রকাশিত হইয়াছে। ঠিক অর্থ বুঝিতে হইলে ভিতরে প্রবেশ করিতে হয়। শাস্ত্রের কৃপা এবং গুরুর কৃপা না হইলে এই সকল তত্ত্ব ঠিক ঠিক বুঝিতে পারে কাহার সাধ্য। মহারাজ এই উভয় কৃপাই প্রচুর পরিমাণে পাইয়াছিলেন।

আরতির কথা তুলিয়া মহারাজ একদিন বলিয়াছিলেন যে, ভগবানের পাদপদ্মে দেহ মন সমর্পণ করার নাম আরতি বা ত্যাগ। আরতি করিবার সময় সেই ত্যাগের ভাবই মনে মনে আনিতে হয়। শুধু শুধু ঘণ্টা নাড়িয়া, ধূনো উড়াইয়া, দীপ নাচাইয়া আরতি হয় না! আমাদিগের পঞ্চেন্দ্রিয় বা দশেন্দ্রিয়ের প্রতীক হইতেছে আরতির পঞ্চ প্রদীপ বা দশ প্রদীপ। পঞ্চভূতে এই দেহ গঠিত। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ সেই পঞ্চভূতের গুণ। ক্ষিতি তত্ত্বের গুণ হইতেছে গন্ধ। সেই জন্য ধূপধুনা পুষ্পাদি দিয়া আরতি করা হয়। অপ্ তত্ত্বের গুণ রস, তাই অর্ঘ্যজল আরতির একটি উপচার। মরুৎ তত্ত্ব স্পর্শ-গুণ প্রকাশ করে বলিয়া চামর দ্বারা আরতি করা হয়। আরতি করিতে করিতে আমরা পঞ্চভূতকে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে সমর্পণ করিয়া থাকি।

যদি তাহাই না করিলাম, আরতি তবে বৃথা হইয়া গেল।

আরাত্রিক সম্বন্ধে মহারাজের ব্যাখ্যা শুনিলে মনে পড়ে ভক্তকবি বিদ্যাপতির বিরহবিধুরা শ্রীশ্রীরাধা প্রাণবন্ধুর আরতির কথা। তিনি আরতি করিতে ইচ্ছা করিয়া বলিয়াছিলেন—

হরি যব আওব গোকুলপুর।
ঘরে ঘরে নগরে বাজব জয়তুর॥
ধূপ দীপ নৈবেদ্য করব পিয়া আগে।
লোচন নীরে করব অভিষেক॥

* * *

পিয়া যব আওব ই মঝু গেহে।
মঙ্গল যতহুঁ করব নিজ দেহে॥
বেদি বনাওব হম অপন অঙ্গমে।
ঝাড়ু করব তাহে চিকুর বিদানে॥
কদলী রোপব হম গরুয়া নিতম্ব।
আম্র পল্লব তাহে কিঙ্কিনি সুঝম্প॥

ইত্যাদি।

মহারাজের শাস্ত্রজ্ঞান ছিল সাগরের ন্যায় অতলস্পর্শ। সেই জ্ঞানের কণিকাগুলি রসাল হইয়া তাঁহার রচনা, ভাষণ ও কথোপকথনের ভিতর দিয়া এমন ভাবেই প্রকাশিত হইয়াছে

যে, অতি জটিল ও কঠিন বিষয়ও যাহার-তাহার অন্তর স্পর্শ করে ও তাহাকে এককালে বিমুগ্ধ করিয়া দেয়। ঠাকুর সর্ব্বদা এই ভাবেই তাঁহার ভিতর খেলা করিতেন! ১৯২২ খৃষ্টাব্দে জামসেদ্‌পুরের "L" Town-এ তিনি একটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন; তাহার বিষয়বস্তু ছিল—Message of Vedanta—বেদান্তের বাণী।

সেই বক্তৃতার একাংশে কর্ম্মযোগের ন্যায় বহু বিতর্কিত জটিল বিষয়টিকে অতি অল্প কথায় তিনি কিরূপ সুললিত ভাষায় বর্ণনা করিয়াছিলেন উদাহরণ স্বরূপ তাহাই বলিতেছি। মহারাজ যে ভাবে কর্ম্মযোগের ব্যাখ্যা করিতেন তাহার সামান্য একটু আভাস পূর্ব্বেও দেওয়া হইয়াছে। জামসেদ্‌পুরে মহারাজ বলিয়াছিলেন—"আপনারা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, আমরা কিরূপে কার্য্য করিব? প্রতিনিয়ত যে সমস্ত দৈহিক কর্ম্ম করেন সেগুলি কেবল নিজের লাভের জন্য নহে—সে সবই ভগবানের পূজা স্বরূপ, এই আদর্শ লইয়া কার্য্য করিতে হইবে। যদি একটি কারখানায় হাতুড়ী ও ইস্পাত লইয়া কোন কার্য্য করেন তাহা হইলে জানিতে হইবে যে, হাতুড়ীর দ্বারা যে সকল আঘাত করিতেছেন, তাহার প্রত্যেকটি দেহ, মন ও নিখিল বিশ্বের নিয়ন্তা সেই জগদীশ্বরের পূজা স্বরূপ। ঐ আঘাতই আপনাদের উপাসনা। এই ভাবে প্রভুর সেবা-রূপে যেন আপনাদের দৈহিক ও মানসিক কর্ম্ম সাধিত হয়।

ইহাই বেদান্ত-প্রচারিত কর্ম্মযোগ। প্রত্যেক কর্ম্মটি পূজায় পরিণত করুন। ......আহার করিবার সময় ভাবিবেন...... খাদ্য ভগবানকে নৈবেদ্য রূপে অর্পণ করিতেছেন। ......ভ্রমণ করিবার সময় মনে করিবেন যে, আপনারা ভগবন্মন্দিরের চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিণ করিতেছেন। ভগবানের মন্দির সর্ব্বত্র—গৃহে, পথে ও ধূলি-কণায়।"(৭)

যাঁহার চরণতলে বসিয়া মহারাজ দিনের পর দিন এইরূপ অপূর্ব্ব বোধি লাভ করিয়াছিলেন, যে বোধির প্রভায় পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য ভূখণ্ড আলোকিত হইয়াছিল এবং বৃদ্ধ ভারতবর্ষকে যে বোধি মানবের চিরন্তন ধর্ম্মাচার্য্য বলিয়া মান্য করাইয়াছিল, অপর্য্যাপ্ত কুল্‌পি বরফ আহারের ফলে তাঁহার গলায় বেদনা হইল; বলিয়াছি, সে বেদনা না কমিয়া বৃদ্ধির দিকেই অগ্রসর হইতে লাগিল, কিন্তু তাহাতেও তাঁহাকে পানিহাটির দণ্ড-মহোৎসবে যোগদান করিতে বিরত করিতে পারিল না। তিনি মনে করিয়াছিলেন, ভক্তগণকে তথায় লইয়া গিয়া হরি নামের "হাট-বাজার" দেখাইবেন, নামের যে লুট হইবে তাহা হইতে তাহারা কুড়াইয়া কুড়াইয়া প্রসাদ গ্রহণপূর্ব্বক যাহাতে চরিতার্থ হইতে পারে তাহাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তিনি ছিলেন ভক্তের ভগবান, তাই ভক্তের জন্য সেদিন প্রাণ বলি দিতে যাত্রা করিলেন! পরার্থে জীবন পণ করিয়াও কিরূপে

(৭) বেদান্ত বাণী বা Message of Vedanta—স্বামী অভেদানন্দ। ৩৫-৩৬ পৃষ্ঠা।

কর্ম্ম করিতে হয় বোধ হয় সেদিন তিনি সেই শিক্ষা দিবার জন্যই ভক্তদিগকে লইয়া পানিহাটিতে গিয়াছিলেন—গলার ব্যথা তাঁহাকে সেদিন নিরস্ত করিতে পারে নাই। ইহাকেই বলিব আমিত্বের বিসর্জ্জন, বিশ্বের মঙ্গলের জন্য ঋষি খৃষ্টের ক্রুশে আরোহণ। এই মহৎ শিক্ষাকে শুধু অন্তরঙ্গ ভক্তদিগের নহে, জনসাধারণের অন্তরে বদ্ধমূল করিয়া দিবার জন্য ঠাকুর সেদিন নিজের বেদনাকে বেদনা বলিয়াই গ্রাহ্য করিলেন না—রোগ বৃদ্ধির সম্ভাবনাকেও তাচ্ছিল্য করিলেন; কাশীপুরে তিনি একদিন মহারাজকে বলিয়াছিলেন—"আমি বিশ হাজার শরীর দিতে পারি যদি তাতে তোদের একজনেরও উপকার হয়।" কাহারও বারণ না মানিয়া ঠাকুর সেদিন কেন পানিহাটির জন-সমুদ্রে ঝম্প প্রদান করিয়া ভাবোন্মত্ত হৃদয়ে নৃত্য করিয়াছিলেন, আমরা তাহার এইরূপ অর্থ ই বুঝিয়াছি।

ভক্তকুলতিলক দাস রঘুনাথ গোস্বামী অতুল ঐশ্বর্য্য এবং পরমাসুন্দরী পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া ভগবান শ্রীচৈতন্যের শরণ লইয়াছিলেন। মহাপ্রভুর আদেশে কিছুকালের জন্য গৃহে থাকিয়া তাঁহাকে সংসার ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে হইয়াছিল। মহাপ্রভু সন্ন্যাস লইয়া নীলাচলে যাত্রা করিলে পর শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারের ভার লইয়া গঙ্গা-তীরবর্ত্তী খড়দহ গ্রামকে প্রধান কেন্দ্র করিয়া নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিতেন। "সুরধুনীর তীরে, হরি বলে কেরে—

বুঝি প্রেমদাতা নিতাই এসেছে”—এই গানে তখন ভাগীরথীর উভয় তীর সর্ব্বদা মুখরিত হইত। খড়দহ এখন বারাকপুর মহকুমার অন্তর্গত একটি সমৃদ্ধ গ্রাম। পানিহাটি খড়দহে অবস্থিত।

এক সময়ে প্রভু শ্রীনিত্যানন্দ সাঙ্গোপাঙ্গসহ পানিহাটিতে অবস্থান কালে দাস রঘুনাথ গোস্বামী চিঁড়া, দুগ্ধ, ক্ষীর, দধি, শর্করা ও কদলী প্রভৃতি মহাপ্রভুকে নিবেদন করিয়া ভক্ত-মণ্ডলীকে ভোজন করাইবার জন্য শ্রীনিত্যানন্দ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, দাস গোস্বামীর উহাই দণ্ড! জ্যৈষ্ঠের শুক্লা ত্রয়োদশীতে গঙ্গাপুলিনে বসিয়া সেদিন শত সহস্র ভক্ত দণ্ডপ্রাপ্ত দাস গোস্বামীর নিবেদিত ভোগের প্রসাদ বিপুল হরিধ্বনি সহকারে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তদবধি ঐ নির্দ্দিষ্ট দিনে পানিহাটিতে “দণ্ড-মহোৎসব” হইয়া থাকে।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের সেই মহোৎসবে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ, নরেন্দ্রনাথ, কালীপ্রসাদ, রাখাল প্রভৃতি অন্তরঙ্গ ও রাম প্রভৃতি অনেকগুলি গৃহীভক্ত নৌকাযোগে যাত্রা করিলেন। যাত্রার পূর্ব্বে ঠাকুর কহিলেন—“সেখানে আনন্দের মেলা—হরিনামের হাট-বাজার বসে,—তোরা সব ‘ইয়ং বেঙ্গল’ কখনও ঐরূপ দেখিস্ নাই। চল্ দেখে আস্‌বি।”

ঠাকুরের গলায় ব্যথা ছিল বলিয়া কোন কোন ভক্ত

ঠাকুরকে সাবধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু ভগবান যখন ভক্তের কল্যাণ করিতে অগ্রসর হন তখন সে সংকল্পে বাধা দিতে পারে কে? ঠাকুর শুধু বলিলেন—"ভাবসমাধি অধিক হইলে গলার ব্যথাটা একটু বৃদ্ধি হইতে পারে বটে, ঐ বিষয়ে একটু সামলাইয়া চলিলেই হইবে।"

বেলা দ্বিতীয় প্রহরে পানিহাটি পৌঁছিয়া যখন সকলে তীরে অবতরণ করিলেন তখন দেখা গেল, গঙ্গাতীরে সেই প্রাচীন অশ্বত্থ বৃক্ষ, যাহার ছায়ায় প্রভু নিত্যানন্দ বসিয়াছিলেন—তাহার চারিদিকে লোকের ভিড় জমিয়াছে। কীর্ত্তনীয়াগণ খোল করতাল লইয়া কীর্ত্তনে মত্ত হইয়াছে। ভক্তগণ ঠাকুরকে ঘিরিয়া ভিড় হইতে রক্ষা করিতে করিতে নাট মন্দিরে আসিলেন। সেখানেও নামকীর্ত্তন হইতেছিল। শুনিতে শুনিতে ঠাকুর উন্মত্তবৎ সেই কীর্ত্তন-সাগরে ঝম্প প্রদান করিলেন এবং ভাবাবেশে তাঁহার সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইয়া গেল! ভক্তগণ মহাব্যস্ত হইয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু ঠাকুর তখন মধ্যে মধ্যে অর্দ্ধ বাহ্যদশা লাভ করিয়া সিংহবিক্রমে নৃত্য করিতে লাগিলেন—কখনও বা আবার সংজ্ঞা হারাইয়া প্রস্তর পুত্তলীবৎ দাঁড়াইতে লাগিলেন। তাঁহার নয়নে-বদনে—সর্ব্ব দেহে এক স্বর্গীয় আভা ফুটিয়া উঠিল—সে আভা ছিল যেন "রুদ্র-মধুর"। সেদিন আবার মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি হইতেছিল। কিন্তু হরিনামে প্রমত্ত ঠাকুর উহা গ্রাহ্য

করিলেন না—খোলের তালে তালে, গানের ভাবে ভাবে, কর-তাল নিক্বণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মনোহর নৃত্য চলিতে লাগিল।

সে নৃত্য যে দেখিল সে-ই আত্মহারা হইল—সেদিনের সে কীর্ত্তন যে শুনিল সে-ই আসিয়া উহাতে যোগ দিল—শত শত কণ্ঠে ধ্বনিত হইতে লাগিল—হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল। পানিহাটি নব বৃন্দাবন হইয়া উঠিল। ঠাকুরের উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ তখন আরও উজ্জ্বল হইয়া গৌরবর্ণ ধারণ করিল, মুখমণ্ডল অপূর্ব্ব জ্যোতি বিকীরণ করিতে লাগিল—মনে হইল যেন একটি স্নিগ্ধ মধুর প্রভাময় অগ্নিশিখা হেলিয়া দুলিয়া নাচিয়া বেড়াইতেছে! এ দৃশ্য দেখিলে কে আর স্থির থাকিতে পারে? যেখানে যে কীর্ত্তনের দল ছিল, সবই আসিয়া সেইখানে উপস্থিত হইল এবং ঠাকুরকে ঘিরিয়া নাচিয়া নাচিয়া গাহিতে লাগিল—

সুরধুনীর তীরে হরি'বলে কে রে?
বুঝি প্রেমদাতা নিতাই এসেছে।
ওরে হরি বলে কে রে
জয় রাধে বলে কে রে—
বুঝি প্রেমদাতা নিতাই এসেছে
(আমাদের) প্রেমদাতা নিতাই এসেছে!
নিতাই নইলে প্রাণ জুড়াবে কিসে—
(এই আমাদের) প্রেমদাতা নিতাই এসেছে।

তাহারা ঠাকুরের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে এবং গায় —(এই আমাদের) প্রেমদাতা নিতাই এসেছে, (এই আমাদের) প্রেমদাতা নিতাই এসেছে!

চতুর্দ্দিকে যখন ছিল এত আনন্দ, এত উৎসব, এমন নর্ত্তন ও কীর্ত্তন এবং সর্ব্বোপরি ঠাকুরের এমন অপূর্ব্ব নৃত্য-লীলা, তখন এই ভাবোন্মত্ততা মুহূর্ত্তে সংক্রামক হইয়া যাহাকে-তাহাকে আবিষ্ট করিয়া ফেলিল; যাহারা সেখানে ছিল উহা সকলকেই উন্মত্ত করিল—যে নাচে নাই সে নাচিতে লাগিল—যে গাহে নাই সে গাহিয়া উঠিল। এই ভাবোন্মত্ত-তার ঘূর্ণীপাকে পড়িয়া ঠাকুরের "ইয়ং বেঙ্গল" ভক্তগণ—সেই কালীপ্রসাদ, নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতিও যে সেদিনের মহাসমারোহে যোগ না দিয়া অচল শৈলের মত তথায় দণ্ডায়মান ছিলেন তাহা মনে হয় না।

যাহা হউক, পানিহাটি হইতে দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাবর্ত্তনের পরই ঠাকুরের গলার ব্যথা আরও বৃদ্ধি পাইল এবং একদিন কণ্ঠতালু হইতে রুধিরপাত হইল। শেষের আরম্ভ সেদিন দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া দেখা দিল। ভক্তগণ আর তাঁহাকে তথায় রাখিতে পারিলেন না, চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় বাটী ভাড়া করিয়া সেইখানে লইয়া আসিলেন। সেবা করিবার জন্য সঙ্গে আসিলেন কালী মহারাজ এবং লাটু মহারাজ। এই বাড়ীটি ছিল বাগবাজারে দুর্গাচরণ মুখার্জ্জির

ষ্ট্রীটে। দক্ষিণেশ্বরের মত মুক্ত স্থানে বাস করিবার পর এই ক্ষুদ্র বদ্ধপ্রায় গৃহে ঠাকুরের বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল। এ দিকে পরীক্ষায় জানা গেল—কণ্ঠে যে রোগ হইয়াছে তাহা 'রোহিণী' বা ক্যান্‌সার। ভক্তদিগের মস্তকে যেন বজ্রপাত হইল। কিছুদিন পরই শ্যামপুকুর ষ্ট্রীটের উপর গোকুল চন্দ্র ভট্টাচার্য্যের ৫৫ নম্বর দ্বিতল বাটীটি ঠাকুরের জন্য ভাড়া করা হইল।

শ্যামপুকুরের বাটীতে যাইবার পূর্ব্বে ঠাকুর সপ্তাহ কাল বাগবাজারে বলরাম-ভবনে ছিলেন। লোকে যেই জানিতে পাইল যে, পরমহংসদেব কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতেছেন, অমনি বলরাম-ভবনে দর্শনার্থীর এমন ভিড় লাগিল যে, তাহা বর্ণনাতীত। এতদিন যাহারা কলিকাতা হইতে দক্ষিণেশ্বর পর্য্যন্তও যাইতে পারে নাই, তাহারা মনে করিল যে, এইবার তাহাদের দিন আসিয়াছে—অতি অল্প পরিশ্রমেই সাধুদর্শন ও সাধুসঙ্গ হইবে। ঠাকুর চিকিৎসকের আদেশ মানিলেন না, ভক্তদিগের প্রার্থনা শুনিলেন না। যে আসিল সে-ই তাঁহার দর্শন পাইল, বাণী শুনিল এবং লাভবান হইয়া আপন আপন গৃহে গেল। এদিকে অধিক কথা বলায় ঠাকুরের অসুখ বাড়িয়া চলিল। ঠাকুর কেন এই ভাবে দিনের পর দিন নিজেকে বিলয়ের দিকে লইয়া গিয়াছিলেন? এই প্রশ্নের উত্তর তিনিই দিয়াছেন; সে কথা আজ মনে

পড়ে—"(শ্রীশ্রীজগদম্বা) দেখাচ্চে কি; যেন কল্‌কাতাটা সাম্‌নে, আর লোকগুলো সব কাম-কাঞ্চনে দিন-রাত ডুবে রয়েছে ও যন্ত্রণা ভোগ কচ্চে। দেখে দয়া এলো। মনে হ'লো লক্ষগুণ কষ্ট পেয়েও যদি এদের মঙ্গল হয়, উদ্ধার হয় তো তা কর্‌বো।"

পরার্থে কর্ম্মানুষ্ঠানের বীজমন্ত্র শ্রীশ্রীঠাকুরের এই বাণীর মধ্যে বর্ত্তমান আছে। মহারাজ দিনের পর দিন সেই মন্ত্র কর্ণে শুনিয়া, হৃদয়ে ধরিয়া, ধ্যান করিয়া নিজের কর্ম্মপথ নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইয়াছিলেন—সেই 'যাত্রা-পথের' একমাত্র আলোক ছিল—'জগদ্ধিতায়।' জীবনান্ত কাল পর্য্যন্ত মহারাজ সেই আলোকে উজ্জ্বল ছিলেন। বলিতেন, কর্ত্তব্যজ্ঞানে পরহিতায় কাজ ক'রে যাও। মান যশের জন্য হানাহানি করিয়া নিজেও মরিও না, দেশকেও হত্যা করিও না!

অষ্টম পরিচ্ছেদ

শ্যামপুকুরে

দক্ষিণেশ্বর চিরদিনের মত ত্যাগ করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর শ্যামপুকুরে আসিলেন, মহারাজও সেই দিন হইতে গৃহত্যাগ করিয়া ঠাকুরের সেবকরূপে সঙ্গে সঙ্গে আসিলেন। সেকালে শ্যামপুকুরে উপস্থিত অন্তরঙ্গ ভক্তদিগের মধ্যে তিনিই ছিলেন সর্ব্বকনিষ্ঠ। শ্রীগুরুর সেবাই যে ভগবানের পূজা, মহারাজ তাহা ভালরূপেই জানিতেন এবং সেই জন্যই মুহূর্ত্তের জন্য দ্বিধা না করিয়া তিনি গৃহত্যাগী হইলেন! তখন তাঁহার বয়স ছিল উনবিংশ বর্ষ মাত্র।

ঠাকুর তখন তরল খাদ্য ভিন্ন কিছুই গলাধঃকরণ করিতে পারিতেন না। সাধারণ একজন মানবের মত যাহাকে-তাহাকে গলা দেখাইয়া বলিতেন—ওগো বড় ব্যথা! স্বয়ং ভগবান যিনি, সাধারণ মনুষ্যের মত তাঁহাকে রোগে বিচলিত হইতে দেখিলে কেহ হয় তো বিস্মিত হইতে পারেন! কিন্তু ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। তিনি নরদেহ ধারণ করিয়া এবার লীলা করিতেছিলেন—সুতরাং তাঁহার সমস্ত কর্ম্ম বাহিরে আমাদের মতই হইতে হইবে—কেবল

বিশেষত্ব থাকিবে তাঁহার আধ্যাত্মিক চেতনার। এরূপ না হইলে আমরা তাঁহাকে নিজেদেরই একজন বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিব কেন—ঐশ্বর্য্য দেখিয়াই যে ভয়ে পলায়ন করিব! অর্জ্জুনের মত শিষ্যও দিব্যচক্ষু লাভ করিবার পর বেশীক্ষণ ভগবানের ঐশ্বর্য্য সহ্য করিতে পারেন নাই! বলিয়াছিলেন—

অদৃষ্টপূর্ব্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা
ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।
তদেব মে দর্শয় দেব রূপং
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস।

তাহার পর শ্রীভগবানের মানুষরূপ দর্শনে যখন তাঁহার বুদ্ধি স্থির হইল—তিনি প্রকৃতিস্থ হইলেন, তখন পরম স্বস্তির সঙ্গে বলিলেন—

দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দ্দন।
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ॥

হে ভগবান! তোমার সৌম্য মূর্ত্তি দেখিয়া বাঁচিলাম!

আমরা ঠাকুরে দিব্যভাবের পূর্ণ প্রকাশ দেখিয়াছি। আবার পূর্ণ মানুষীভাবও পাইয়াছি। মেঘের মধ্যে যেমন বিজলী খেলে সেইরূপ তাঁহার মানবীয় ভাবের মধ্যেও এক একবার অতি সুস্পষ্ট ও মানববুদ্ধির অগম্য দিব্যভাবের দীপ্তি ফুটিয়া বাহির হইয়া তাঁহাকে একান্ত দুর্ব্বোধ্য ও অনন্ত

ভাবময় করিয়া তোলে। তাই স্বামী বিবেকানন্দ কোনও সময়ে বলিয়াছিলেন, ঠাকুরের এক-একটি বাণী লইয়া ঝুড়ি ঝুড়ি দর্শনের গ্রন্থ রচিত হইতে পারে!

ঠাকুর যেমন যাহাকে-তাহাকে বলিতেন—'ওগো আমার গলাটার বড় বেদনা', তেমনি আবার তাঁহাকে বলিতে শুনি—"দেখ্‌লুম্ তার (নিজের সূক্ষ্ম দেহের) পিঠময় ঘা হয়েছে! ভাব্‌চি কেন এমন হ'লো? আর মা দেখিয়ে দিচ্ছে—যা' তা' ক'রে এসে যত লোক ছোঁয়, আর তাদের দুর্দ্দশা দেখে মনে দয়া হয়,—সেইগুলো (দুষ্কর্ম্মের ফল) নিতে হয়। সেই সব নিয়ে নিয়ে ঐরূপ (গলায় ঘা) হয়েছে। সেই জন্যই তো (নিজের গলা দেখাইয়া) এ-ই হয়েছে। নইলে এ শরীরে কখনো কিছু অন্যায় করেনি—এ-ত (রোগ) ভোগ কেন?"

মহারাজ ছিলেন ঠাকুরের সেবকদিগের মধ্যে বয়সে নবীন কিন্তু বুদ্ধিতে প্রবীণ। ঠাকুর তাঁহাকে যে অতিশয় ভালবাসিতেন একথা মহারাজ নিজেই কতবার বলিয়াছেন—"তিনি যে আমায় কি ভালোবাস্‌তেন তা আর কি বল্‌বো।" শ্যামপুকুর হইতে কাশীপুর যাত্রার সমসময়ে একদিন তিনি মহারাজকে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার গলার ঘা একটা উপলক্ষ্য মাত্র! এই ঘায়ের কারণেই সেবাব্রত পালন করিবার মানসে অন্তরঙ্গ ভক্তগণ এক সঙ্গে মিলিত হইতেছেন। ঠাকুর

১৪

জানিতেন যে, দিনের পর দিন পরম যত্ন করিয়া তিনি ভবিষ্যৎ রামকৃষ্ণ-গোষ্ঠীর শির, গ্রীবা, হস্তপদ প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সবই একে একে গঠন করিয়াছেন, এখন সেই খণ্ডগুলিকে একত্র বন্ধন করিতে পারিলেই গোষ্ঠী-স্থাপনের বাকি কাজটুকু হইয়া যায়। গলার ঘাকে উপলক্ষ্য করিয়া তিনি সেই শেষ কার্য্যটি তখন করিতেছিলেন! একের ব্যক্তিগত বিপদে অপরের প্রাণ হয়ত তেমন ভাবে টানিতে না পারে, কিন্তু বিপদটি যখন সমান ভাবে সকলেরই হয় তখন সকলেই সকল খণ্ডতাকে পূর্ণ করিয়া, সকল ফাঁককে মিলাইয়া দিয়া পরস্পর পরস্পরের করধারণপূর্ব্বক সেই বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আমরণ চেষ্টিত হয়। ঠাকুরের গলার ঘা ছিল সেইরূপ একটি মহান্ বিপত্তি যাহার উপরেই ঠাকুর রামকৃষ্ণগোষ্ঠীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সে মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল, কয়েকজন অন্তরঙ্গের সম্মিলিত প্রাণ শক্তির সুদৃঢ় বেদীর উপর!

গৃহীভক্তগণ ঠাকুরের চিকিৎসার ব্যয় এবং বাড়ী-ভাড়া প্রভৃতি সমস্তই দিতে সঙ্কল্প করিলেন, কারণ তাঁহাদিগের অর্থ-সামর্থ্য ছিল। কিন্তু দিবারাত্র সেবা করিবার জন্য তো লোক চাই। "এ-দিকে স্কুল-কলেজের ছাত্র বালক ভক্তগণ ঠাকুরের সেবার নিমিত্ত এখানে (শ্যামপুকুরে) আসিয়া নিত্য রাত্র-জাগরণাদি করিলে অভিভাবকদিগের বিষম অসন্তোষ উদয়

হইবে, এ-কথা হৃদয়ঙ্গম করিতে কাহারও বিলম্ব হইল না।"(১) স্বামী সারদানন্দ মহারাজ আরও বলিয়াছেন—"আমরা তখন কলেজে পড়িতাম, সুতরাং সপ্তাহের মধ্যে দুই একদিন মাত্র ঠাকুরকে দেখিতে আসিবার অবসর পাইতাম।"(২) এই সকল কারণে, ঠাকুর যতদিন শ্যামপুকুরে ছিলেন ততদিন "শশী, শরৎ, যোগেন, নরেন, রাখাল, বাবুরাম ও গোপাল দাদা নিজ নিজ বাটীতে থাকিতেন এবং মধ্যে মধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখিতে আসিতেন।" নিত্য-নিরঞ্জন, কালী মহারাজ ও ঠাকুরের প্রিয় সেবক লাটু-মহারাজ ঠাকুরের সঙ্গে সঙ্গেই ছিলেন। নিবিড় শ্রদ্ধায় পরিষিঞ্চিত আত্মচিন্তাশূন্য গৃহত্যাগী কালী মহারাজের প্রাণপণ সেবা দেখিয়া নরেন্দ্র নাথ পরম প্রীত হইয়া একদিন মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছিলেন—Kali is the personal attache' to His Holiness Sree Ramakrishna Paramahansa"—কালীই ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের খাস ভৃত্য।

ঠাকুর দক্ষিণেশ্বর ছাড়িলেন ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে, ২রা আশ্বিন। মহারাজও তখন একরূপ গৃহ ছাড়িয়া তাঁহার খাস ভৃত্যরূপে দিবারাত্র সেবায় নিযুক্ত হইলেন। সুতরাং শ্যামপুকুরে ঠাকুরের অবস্থান কালে যে সকল প্রাণস্পর্শী ঘটনা ঘটিয়াছিল

---

(১) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ—স্বামী সারদানন্দ। (ঠাকুরের দিব্যভাব ও নরেন্দ্র নাথ), ১৩৩৪। ৩০৭ পৃষ্ঠা।

(২) ঐ ৩০৩ পৃষ্ঠা।

—আধ্যাত্মিকতার যে তরঙ্গ প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া দিবানিশি প্রবহমান হইয়াছিল, মহারাজও সে সকলের অংশ গ্রহণ করিয়া সার্থকজন্মা হইয়াছিলেন।

ঠাকুরের চিকিৎসার ভার লইয়াছিলেন সেকালের ভারত-মান্য সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার মহেন্দ্র লাল সরকার। তিনি ছিলেন কলিকাতার এলোপ্যাথিক চিকিৎসকদিগের মুকুটমণি। কিন্তু যখন তিনি নানাবিধ পরীক্ষার দ্বারা বুঝিলেন যে, হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসাই এলোপ্যাথিক চিকিৎসা হইতে বেশী বিজ্ঞান-সম্মত এবং উপকারী, তখন সেই কথা ব্রিটিশ মেডিকেল এসোসিয়েসনের বঙ্গদেশীয় শাখার চতুর্থ সাম্বৎসরিক অধি-বেশনে প্রকাশ করায় তুমুল প্রতিবাদ আরম্ভ হইল এবং এলোপ্যাথগণ তাঁহাকে ত্যাগ করিলেন। তাঁহার পসার প্রতিপত্তি সবই নষ্ট হইয়া গেল! সব যায় যাউক—তিনি সত্যকেই ধরিয়া রহিলেন। সত্যের প্রতি তীব্র নিষ্ঠার এই দৃষ্টান্ত মহারাজের কৈশোরকালে যেমন তাঁহার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তেমনি করিয়াছিল সমগ্র বঙ্গদেশের উপর।

ঠাকুর তখন ভক্তদিগের সঙ্গে শ্যামপুকুরের বাড়ীতে প্রেমানন্দে কাটাইতেছিলেন এবং যে আসিত তাহাকেই দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিতেছিলেন। তখন কয়েকদিন গোলাপ-মা ঠাকুরের পথ্যাদি প্রস্তুত করিতেন এবং অন্যান্য গৃহকর্ম্মেরও

ভার লইয়াছিলেন। বর্ষীয়ান্ গৃহীভক্তগণ দেখিলেন, বিশেষ সতর্কতার সহিত পথ্যাদি প্রস্তুত করার এবং সেবার জন্য দক্ষিণেশ্বর হইতে শ্রীমাকে তথায় না আনাইলে চলে না। তখন শ্রীমাকে আনিবার জন্য দক্ষিণেশ্বরে লোক গেল।

মাতাঠাকুরাণী কাল বিলম্ব না করিয়া দক্ষিণেশ্বর হইতে শ্যামপুকুরে আসিলেন এবং পথ্যাদি প্রস্তুত ও স্বামিসেবার ভার লইলেন। কি দক্ষিণেশ্বরে, কি শ্যামপুকুরে এবং পরে কি কাশীপুরে দিনের পর দিন তিনি সঞ্চারিণী দীপশিখার ন্যায় রোগী ও রোগশয্যাকে আবর্তন করিয়া ফিরিতেন এবং যেরূপে তাঁহার হৃদয়-নিঙ্ড়াইয়া মমতা মিশাইয়া নানাবিধ পথ্য প্রস্তুত করিয়া দিতেন তাহার তুলনা নাই। সেই সেবা ছিল একান্ত মৌন। পুষ্প যেমন নিজেকে নিঃশেষে রিক্ত করিয়া সৌরভ দান করে, ধূপ যেমন নিজেকে নিঃশেষে দগ্ধ করিয়া অকাতরে গন্ধ বিলায়—শ্রীশ্রীমার সেবাও ছিল তদ্রূপ। সেবিকাকে চক্ষে দেখিতে পায় নাই কেহ; কিন্তু দণ্ডে দণ্ডে তাঁহার সেবা-মাহাত্ম্যের স্নিগ্ধ কোমল মধুর স্পর্শে পবিত্র হইয়াছে সকলে, ধন্য হইয়াছে সকলে এবং নবীন প্রাণ-শক্তিতে সঞ্জীবিত হইয়াছে সকলে।

আশ্বিন মাসের (১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে) প্রথমেই ঠাকুর শ্যাম-পুকুরে আসিয়াছিলেন। কয়েক দিন পরই শারদীয়া দুর্গোৎ-সবের শানাই বাজিয়া উঠিল। মহাষ্টমীর পর সন্ধিপূজার

সময় ঠাকুর তাঁহার রোগ-শয্যা ত্যাগ করিয়া হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিলেন—একেবারে ভাবে বিভোর, আত্মহারা, বাহ্যজ্ঞানশূন্য! ঠাকুরের সেই ঐশ্বরিক ভাব দেখিয়া মহারাজ, নরেন্দ্র, লাটু, নিরঞ্জন এবং অন্যান্য ভক্তগণ তাঁহার শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলী প্রদান করিলেন।

অল্পক্ষণ পর বাহ্যজ্ঞান লাভ করিয়া ঠাকুর বলিলেন—"একটা জ্যোতির রাস্তা দেখলুম, সেই রাস্তা এখান থেকে সুরেন্দ্রের (সুরেশ মিত্রের) ঠাকুর-দালানে শেষ হয়েছে! সেখানে মা ছুর্গার প্রতিমার এক পার্শ্বে দেখলুম সুরেন্দ্র কাঁদ্‌ছে।" ঠাকুরের আদেশ পাইয়া মহারাজ, নরেন্দ্রনাথ এবং উপস্থিত অন্যান্য ভক্তগণ সুরেশ মিত্রের বাটীতে তৎক্ষণাৎ নিমন্ত্রণ-রক্ষা করিতে যাইয়া শুনিলেন, ঠাকুর যাহা-যাহা বলিয়াছেন সে সকল সেইরূপই ঘটিয়াছে।

পরবর্ত্তীকালে এই প্রসঙ্গে মহারাজ বলিয়াছিলেন যে, শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার নির্ম্মাণ-কায় প্রক্ষেপ করিয়া যখন-তখন দেখা দিতেন। ইহা যোগ বিভূতি। মনের বলই সত্যকার বল—দেহের বল তদপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট। অভ্যাস-যোগ বলে সেই শক্তি লাভ করিতে পারিলে যোগ-বিভূতি অনায়াসলব্ধ ঐশ্বর্য্যরূপে দেখা দেয়। 'যোগী হইবার উপায়' নামক মহারাজের একখানি গ্রন্থে তিনি বলিয়াছেন—"বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে মনের শক্তিই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, রাজযোগ তাহাই শিক্ষা দেয়। সেই

মানসিক বল যদি যথারীতি কোনও একটি বিষয়ে প্রযুক্ত হয় তাহা হইলে সেই বিষয় বা বস্তু সম্বন্ধে যাহা-কিছু জ্ঞাতব্য সে সমুদয়ই প্রকাশিত হইয়া পড়ে। সে জন্য কোন মন্ত্রের ব্যবহার নিষ্প্রয়োজনীয়।"

প্রত্যেক মানুষ কণিকাকারে ভগবান, অর্থাৎ ভগবানে যে সকল শক্তির পূর্ণ বিকাশ, মানুষে তাহার বিকাশ কণিকাকারে। সেই শক্তিকে সম্পূর্ণরূপে বিকশিত করিয়া তুলিতে পারিলেই ধরার মানব দেবত্ব লাভ করিতে পারে। মহারাজের সমগ্র জীবনের সর্ব্বপ্রকার সাধনা—সেই ভগবৎ শক্তিবিকাশের সাধনা। সেই সাধনা করিবার জন্যই তিনি ভক্তদিগকে সর্ব্বদা প্রবুদ্ধ করিতেন এবং লোকমঙ্গল সাধনের জন্য পৃথিবীর নানা স্থানে নানা ভাবে সেই তত্ত্বই প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার এমন একটি ভাষণ পাওয়া যাইবে না যাহার কোন-না-কোন স্থানে এই বিষয়ের উপদেশ নাই।

যেমন ভাব তেমনি লাভ—ঠাকুর এই কথা সর্ব্বদাই বলিতেন। তাঁহার পরম প্রিয় শিষ্যের মুখেও তাই সর্ব্বদাই শুনিতে পাই সেই একই কথা—নিজেকে যদি দীনহীন, শক্তিহীন ও সাধন-কঠোরতা অবলম্বনের অনুপযোগী বলিয়া ভাবনা কর, তবে শক্তি থাকিতেও তুমি শক্তিহীনই হইয়া পড়িবে! নিজেকে যেমন ভাবিবে, নিজেও তেমনি হইয়া যাইবে।

মহারাজ আমাদিগকে বলিতেন—আত্মনির্ভরতা না আনিতে পারিলে ঐহিক পারত্রিক কোন ব্যাপারেই শ্রেয়ো লাভের সম্ভাবনা নাই। সাধনাই বল আর সংসারই বল—দুর্ব্বলের স্থান কোথাও নাই। মনকেই পাশ্চাত্য জগৎ 'Soul' বলিয়া বর্ণনা করে। আত্মা Soul নহে। আমাদের দেহের পশ্চাতে মন অবস্থিত বটে কিন্তু মন আত্মা নহে। দেহান্তে আত্মা সেই মন সহ সূক্ষ্ম শরীরকে লইয়া অন্য দেহে গমন করে। সেই আত্মার শক্তি এতই প্রবল যে, কোন অস্ত্র তাহাকে ভেদ করিতে পারে না, কোন অগ্নি তাহাকে দহন করিতে পারে না। তাহার অদি নাই, অন্ত নাই, তাহার ক্ষয়ও নাই। স্বামীজি বলিতেন—"সেই আত্মার প্রতি বিশ্বাস সম্পন্ন হইতে পারিলেই বীর্য্য আসিবে।"

মহারাজ বলিতেন, মনের বল ইচ্ছা করিলেই বৃদ্ধি করিতে পারা যায়। আমরা যে নিয়ত জপ করি তাহার উদ্দেশ্য পুনঃ পুনঃ আবৃত্তির দ্বারা মনে একটা সংস্কার হউক এবং সেই সংস্কারের দাগ পুনঃ পুনঃ জপের জন্য গভীর হইতে গভীরতর হইয়া উঠুক। দাগ যত গভীর হইবে, মন ততই সেই দিকে প্রধাবিত হইবে। সর্ব্বদা জপ করিয়া মনের একটা অভ্যাস করিয়া দিতে পারিলেই উদ্দেশ্য সফল হয়। স্বভাব আর কি? অভ্যাস বইত নয়। যেমন অভ্যাস করিবে, স্বভাবই পরিবর্ত্তিত হইয়া সেইরূপ হইয়া যাইবে। অভ্যাস-যোগের ইহাই

ফল। বীর্য্যবন্ত হইয়া ভগবদারাধনা করিবার জন্য ইহার তুল্য সহজ পথ আর নাই। ভগবান তাই অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন—

অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্॥

—(গীতা, ৮।৮)

হে অর্জ্জুন, অভ্যাস-যোগের দ্বারা অনন্যচিত্তে আমাকে ভাবিতে ভাবিতে লোকে পরম ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হয়।

এই অভ্যাস-যোগের সাধনা করিতে হইলে সংসার ত্যাগ করিয়া বনে যাইবার প্রয়োজন নাই—তবে মনের আসক্তি ছাড়িতে হইবে। সেই আসক্তিই সংসার, সেই আসক্তিই বন্ধনের কারণ, উহাই মুক্তিপথের বিষম বিঘ্ন।

মহারাজ ছিলেন আজন্ম যোগী। তাঁহার অত্যাশ্চর্য্য মনের বলের পরিচায়ক নানারূপ ঘটনা আছে। মার্কিনের কোন স্থানে থাকা কালে একবার তাঁহার পায়ের দীর্ঘাস্থির কম্পাউণ্ড ফ্রাক্চার হয়। তিনি ভগ্নপদ লইয়া নিউইয়র্কে আসিয়া একস্-রশ্মির সাহায্যে উহা পরীক্ষা করাইলেন। চিকিৎসক কহিলেন, আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত হাসপাতালে থাকিতে হইবে ; নতুবা ভগ্নপদ আরোগ্য হইবে না—চিরদিনের মত খঞ্জ হইবার সম্ভাবনা ঘটিবে!

এই পরামর্শ মহারাজের ভাল লাগিল না। সকল কার্য্য

ফেলিয়া ভগ্নপদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে বাস করা তাঁহার কর্ম্মপ্রবণ মনের বিচারে নিতান্তই অযৌক্তিক বলিয়া মনে হইল। তিনি কাপড় দিয়া ভগ্নপদ দৃঢ়রূপে বন্ধন করিলেন এবং পদব্রজেই নিউইয়র্ক শহরে তাঁহার আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে পূর্ব্ববৎ কাজ কর্ম্মও চলিতে লাগিল। এদিকে পা যে ফুলিয়া উঠিয়াছে সে দিকে তাঁহার লক্ষ্যই রহিল না! প্রতি ঘণ্টায় চারি মাইল করিয়া ভ্রমণ করিতে অভ্যস্ত এমন একজনের সঙ্গে তাল রাখিয়া তাঁহাকেও সঙ্গে সঙ্গে হাঁটিতে হইত। সে সময় পায়ে যে বেদনা বোধ হইত না তাহাও নহে; কিন্তু বেদনার স্থান হইতে তিনি মনকে সর্ব্বদা সরাইয়া রাখিতেন! এই ভাবে কিছুকাল গেল। আবার যখন তিনি ডাক্তারের নিকটে আসিলেন তখন ডাক্তার ব্যাণ্ডেজ্ খুলিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—'আপনার পা যে সারিয়া গিয়াছে! কিরূপে সারিল?' মহারাজ কহিলেন—'কেন? মনের জোরে।' (৩)

শ্যামপুকুরের সেই ক্ষীয়মান্ পূর্ণচন্দ্র ছিলেন মহারাজের যোগ-শিক্ষক। এমন সৌভাগ্য কয়জনের ঘটে? যোগী হইবার জন্য মহারাজের আবাল্য তীব্র কামনা ছিল। যে

---

(৩) মহারাজের পায়ের হাড় ভাঙ্গিয়া যাইবার পর এবং উহা সরিয়া গেলে এক্স-রশ্মির সাহায্যে যে দুইখানি ছবি তোলা হইয়াছিল, তাহা কলিকাতার বেদান্ত মঠে এখনও সযত্নে রক্ষিত আছে।

যাহা একান্ত ভাবে চায় সে তাহাই পায়। মহারাজ সর্ব্বসম্পদ্ বিসর্জ্জন দিয়া একজন যোগাচার্য্য চাহিয়াছিলেন এবং গুরুভাবে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে পাওয়ায় তাঁহার সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইয়াছিল। মহারাজের পরিবেশ ও শ্রীশ্রীঠাকুরের উৎসাহপূর্ণ উপদেশ তাঁহাকে দিনের পর দিন আধ্যাত্মিকতার পথে অগ্রসর করিতেছিল।

দক্ষিণেশ্বরে তো সে শিক্ষার বিরতিই ছিল না; শ্যামপুকুরেও নহে, কাশীপুরেও নহে। শ্যামপুকুরে তো তখন রোহিণীরোগক্লিষ্ট ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের চিকিৎসা হইতেছিল না—দেবতার চিকিৎসা মানবে কিরূপে করিবে? তাঁহার চিকিৎসার উপলক্ষ্য করিয়া চিকিৎসা হইতেছিল ডাক্তার সরকারের এবং চিকিৎসা হইতেছিল আধি-ব্যাধি-ক্লিষ্ট মনহারানো জ্ঞান-হারানো প্রেমভক্তিশূন্য নিষ্ঠাহীন জড়বাদমাত্রসম্বল মানবের! যাহারা আত্মাকে ভুলিয়া শুধু আত্মীয়কেই জীবনের অবলম্বন করিয়া পারে যাইবার জন্য অগ্রসর হইয়াছিল, ঠাকুর তাঁহাদিগকে দিতেছিলেন সেই হারানো-আত্মার সন্ধান। ঠাকুরের সেবক কালী-মহারাজও তখন অন্যের মতই ঠাকুরের নিকট হইতে আত্মার সংবাদ লইতেছিলেন।

শ্যামপুকুরে দিনের পর দিন মহারাজের যে আত্মিক চিকিৎসা হইতেছিল তাহারই গুণে তাঁহার মন পুষ্টতর হইতেছিল, প্রাণে প্রাণ আসিতেছিল। তিনি তাই গুরুকেই

একমাত্র অবলম্বন জ্ঞানে তাঁহারই চরণাশ্রয় লইয়াছিলেন। তাঁহার ভিতর বাহির সমস্তই তখন ঠাকুরের দ্বারায় আচ্ছাদিত হইয়াছিল। ইন্দ্রিয় ও মনের দাসত্ব হইতে তিনি তখন নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিমুক্ত করিয়া ভাগবত জীবনের আস্বাদ লাভ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ভক্তি আসিয়া তখন জ্ঞানের সহিত মিলিত হইতেছিল এবং গুরুসেবারূপ কর্ম্মযোগে তিনি দেহ মন ও প্রাণে নিজেকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ভগবৎ-প্রীত্যর্থ সেই সেবাই ছিল তখন তাঁহার একমাত্র ধ্যেয় ও অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম।

এমন সময়ে শ্যামপুকুরে দীপান্বিতার শ্যামাপূজার নিশি সমাগত হইল। তখনও মহারাজের স্মরণপথে ছিল দুর্গাপূজার সন্ধিক্ষণে ঠাকুরের ভিতরে যে অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক প্রকাশ হইয়াছিল তাহার মধুময় স্মৃতি। শ্যামা পূজার পূর্ব্বদিন শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্তদিগকে বলিয়াছিলেন—'পূজার উপকরণ সংক্ষেপে সংগ্রহ করিস্। দীপান্বিতায় কালীপূজা হইবে।'

নির্দ্ধারিত দিনে পূজার আয়োজন হইল। যথা সময়ে শ্রীশ্রীঠাকুর আসিয়া আসনে বসিলেন। তখন সেবকগণ ভাবিতে লাগিলেন—তাই তো! 'ঠাকুর বলিয়াছেন, তিনি কালীপূজা করিবেন। ফুল-ফল-জল-নৈবেদ্য সবই আসিয়াছে, গৃহও দীপমালায় সাজিয়াছে কিন্তু প্রতিমা? প্রতিমা কৈ? তবে কাহার পূজা হইবে! ভক্তগণ পরস্পর মুখ চাওয়া-চায়ি

করিতে লাগিলেন। ভাবিতে লাগিলেন—এ যে বড় বিষম ভুল হইয়া গেল। এখন উপায়? কেহ কেহ মনে করিলেন, ঠাকুর যখন প্রতিমার কথা বলেন নাই তখন বোধ হয় নিজেকেই—নিজের দেহমনকেই জগন্মাতার প্রতীকরূপে অবলম্বন করিয়া জগচ্চৈতন্য শক্তির আরাধনা করিবেন! তাঁহারা ঠাকুরের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন—তিলমাত্র উদ্বেগ নাই—পূজার আয়োজনে যে কোনরূপে অঙ্গ-হানি হইয়াছে সেরূপ কোন ইঙ্গিতও সেই প্রশান্ত নয়নে বদনে দেখা যাইতেছে না!

ঠাকুর আসনে বসিয়াছেন। তাঁহার দুই পার্শ্বে দুইটি মোম-বাতি জ্বলিতেছে। ধূপ-ধুনার গন্ধে কক্ষটি সুবাসিত হইয়া উঠিয়াছে, ঠাকুর একেবারে স্থির নিস্পন্দ—নিবাতনিষ্কম্প সম প্রদীপম্।

আবেগে ও উৎকণ্ঠায় সকলে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ঠাকুর—

ভাবে মগ্ন নন বাহ্য-চেঁঠা আছে গায়।
এইরূপে বহুক্ষণ গত হ'য়ে যায়॥
তখন গিরীশে কন রাম পেয়ে টের।
প্রভুর এ পূজা নয়—পূজা আমাদের॥
আমাদের পূজা প্রভু লইবার তরে।
অপেক্ষায় উপবিষ্ট আসন উপরে॥

গিরিশ শুনিয়া সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন—বল কি!

'জয় মা, জয় মা' রবে কক্ষটি পূর্ণ করিয়া তখন তিনি মুষ্টি মুষ্টি পুষ্পাঞ্জলি ঠাকুরের শ্রীপদে অর্পণ করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে ঠাকুরের দেহে মনে মা কালীর আবেশ আসিল—দেখিতে দেখিতে বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হইল—দেখিতে দেখিতে তাঁহার দুইকর বর ও অভয় লইয়া উত্তোলিত হইল! সেই মন্দিরমধ্যে তখন জীবন্ত প্রতিমার পূজার জন্য হুড়াহুড়ি লাগিয়া গেল। অঞ্জলির পর অঞ্জলিপূর্ণ চন্দনসিক্ত পুষ্প বিল্বদল ঠাকুরের শ্রীচরণকমল আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিল! ঠাকুরের নয়ন ও বদন এক ঐশ্বরিক জ্যোতিতে তখন জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠিয়াছে। যাঁহারা একটু দূরে ছিলেন তাঁহারা দেখিতে লাগিলেন ঠাকুরের দেহাবলম্বনে অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী প্রতিমা সহসা আবির্ভূতা হইয়াছেন!

সকলের কণ্ঠে তখন ধ্বনি বাজিতে লাগিল—জয় মা ব্রহ্মময়ী! জয় মা ব্রহ্মময়ী। তখন—

কেহ হাসে কেহ নাচে উন্মত্ত হইয়া।
বীর দম্ফে লম্ফে কেহ ছাদ কাঁপাইয়া॥

* * * *

কি রঙ্গ হইল দৃশ্য কার সাধ্য কয়।
চক্ষে দেখা তবু তিল বর্ণিবার নয়॥ (৪)

---

(৪) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি—শ্রীঅক্ষয়কুমার সেন। (দ্বিতীয় সংস্করণ—উদ্বোধন—১৩৩১). ৫৯৯-৬০০ পৃষ্ঠা।

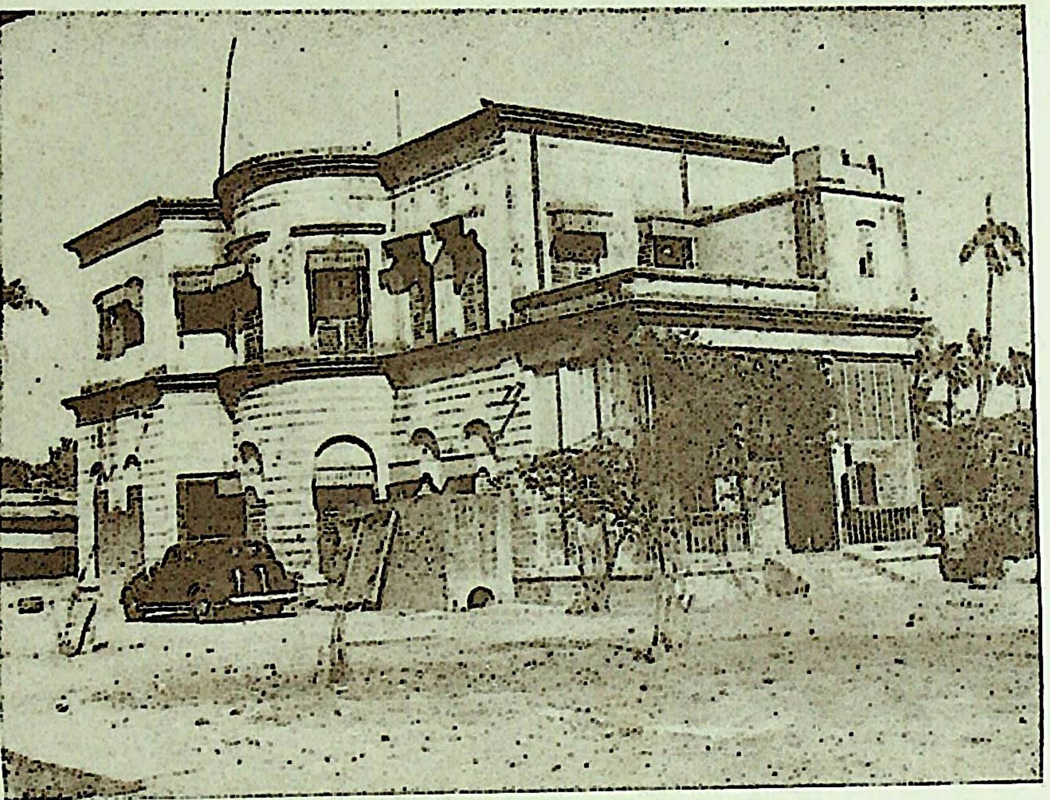
নবম পরিচ্ছেদ

তপোক্ষেত্র কাশীপুর

শ্যামপুকুরে তিনমাস চিকিৎসার পর ঠাকুরের অবস্থার বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন হইল না, বরং পীড়া বৃদ্ধির দিকেই যাইতে লাগিল দেখিয়া শ্যামপুকুর হইতেও একটি অধিক মুক্ত স্থানে তাঁহাকে আনিবার ব্যবস্থা করা হইল। পাইক-পাড়ার বাবুদিগের কাশীপুরে অবস্থিত উদ্যানবাটিকাটি সর্ব্বাংশে উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া ১৮৮৫ সালের ১১ই ডিসেম্বর (বাঙ্গালা ২৮শে অগ্রহায়ণ) ভক্তগণ শ্রীশ্রীঠাকুরকে সেই বাগানে আনিলেন। সেবা করিবার জন্য সঙ্গে আসিলেন শ্রী-মা, গোলাপ-মা, লাটুমহারাজ, নিরঞ্জনমহারাজ ও কালী মহারাজ। অসুখ যখন বৃদ্ধিই হইতে লাগিল তখন সেবক সংখ্যাও বাড়াইবার প্রয়োজন হইয়া উঠিল। ভক্তদিগের মধ্যে যাঁহারা এতদিন আপন আপন গৃহে থাকিতেন এবং মধ্যে মধ্যে ঠাকুরের সেবা করিবার জন্য আসিতেন, কাশীপুরে তাঁহারা সকলেই আসিয়া মিলিত হইলেন। নরেন্দ্র, রাখাল, যোগেন, শরৎ, শশী, বুড়ো-গোপাল, বাবুরাম, হুটকো-গোপাল প্রভৃতি গৃহত্যাগ করিয়া কাশীপুরেই ঠাকুরের সঙ্গে বাস করিতে লাগিলেন।

বাসন মাজা, ঘর ঝাঁট দেওয়া হইতে আরম্ভ করিয়া বাজার করা, ঔষধ-পত্র আনা এবং ঠাকুরের সকল প্রকার সেবা সেবকগণ এইরূপ দৃঢ় নিষ্ঠার সহিত করিতেছিলেন যে, যাঁহারা উহা দেখিয়াছিলেন তাঁহাদিগের বিস্ময়ের অবধি ছিল না। তাঁহারা ভাবিতেন, মানুষ কি কখনও সম্পূর্ণরূপে স্বার্থশূন্য হইয়া এমন-ভাবে আর একজনের সেবা করিতে পারে? ইঁহারা সকলেই ছিলেন আঢ্য গৃহস্থ-পরিবারের শিক্ষিত সন্তান, বেতনভুক্ দাসের কর্ম্ম তো তাঁহারা আপন আপন গৃহেও কখনো করেন নাই, কাশীপুরে ইঁহাদিগকে সেইরূপ ভাবে কাজ করিতে দেখিলে সংসারী লোকদিগের হৃদয় যে বিস্ময়ে পূর্ণ হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? তাঁহাদিগের গৃহবুদ্ধিতে পরিপূর্ণ সংসারী-মনের এ-কথা বুঝিবার সামর্থ্যই ছিল না যে, কাশী-পুরে এবং তৎপূর্ব্বে শ্যামপুকুরে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের যে সেবা হইতেছিল তাহা মানুষ কর্ত্তৃক মানুষের সেবা নহে, তাহা ভক্ত কর্ত্তৃক শ্রীভগবানের পূজা!

শ্যামপুকুর হইতে কাশীপুর আগমনের বিশেষ কারণ ঠাকুর ভালরূপেই জানিতেন! মনে হয়, শ্যামপুকুরে পীড়ার বৃদ্ধির ব্যাপারটিও ছিল ঠাকুরের নিজের ইচ্ছা! দক্ষিণেশ্বরে দর্শনার্থিদিগের যেরূপ ভিড় জমিত, শ্যামপুকুরেও জমিত প্রায় তদ্রূপ—অথবা কোন কোন সময়ে বেশী। কিন্তু ঠাকুর জানিতেন, তিনি সত্বরই চলিয়া যাইবেন, সুতরাং তৎপূর্ব্বে



কাশীপুর উদ্যান-বাটিকা

ত্যাগী ও গৃহী ভক্তদিগকে পৃথক করিয়া ত্যাগী সেবকদিগকে ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল। আর প্রয়োজন হইয়াছিল ত্যাগী ভক্তদিগকে সেবকসমাগমের বাহিরে নিরালায় এবং আরও নিকট করিয়া পাইয়া আধ্যাত্মিক জগতের চরম উপলব্ধিগুলির সন্ধান শিক্ষা দেওয়া। (১) হাটের মধ্যে বারোয়ারি পূজা চলিতে পারে, কিন্তু সত্যকার দেবীপূজা করিবার স্থান নির্জ্জনে ও নিরালায়। চিকিৎসকদিগের আদেশে কাশীপুরে বেশী সেবক সমাগম হইতে পারিত না এবং ঠাকুরও সেখানে নানাভাবে ভক্তদিগকে সাধন-ভজন করাইয়া লইতেন। কেন যে ভক্তগণ কি করিতেছেন তাঁহারা নিজেরাও তাহা ঠিক বুঝিতে পারিতেন না। শুধু এইটুকুই বুঝিতেন যে, এক এক সময়ে মনে এমন একটা তীব্র প্রবর্ত্তনা আসিত যে, উহাকে কোন ক্রমেই উপেক্ষা করা চলিত না।

প্রতিদিন স্নানের কালে কালীমহারাজ যখন ঠাকুরের সেবায় নিযুক্ত থাকিতেন তখন ঠাকুর মহারাজকে যে কত অপূর্ব্ব তত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন তাহার ইয়ত্তা নাই। ঠাকুর কিসে একটু আরামে থাকিবেন, কিসে তাঁহার একটু শান্তি

---

(১) He treated them with special affection and particularly initiated them into the higher stages of realisation and spiritual awareness.—The Life of the Swami Vivekananda. (Mayaboti—1912), Vol I, P. 386.

আসিবে সেবক ভক্তদিগের তাহাই ছিল একমাত্র চিন্তা। ঠাকুরকে রোগমুক্ত করিতেই হইবে ইহাই ছিল তাঁহাদিগের দৃঢ় সংকল্প! কলিকাতা রাজনগরী ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইয়া যাউক কিংবা পরিপূর্ণ কলেবরা ভাগীরথী শুকাইয়া মরুভূমি হইয়া যাউক—সে দিকে মন দিবার তিলার্দ্ধ অবসরও তাঁহাদিগের ছিল না। মন হইয়াছিল তখন শ্রীশ্রীঠাকুরময়। ইহারই নাম অনন্যচিত্তে উপাসনা এবং ইহাই স্মরণ করাইয়া দেয় ভগবানের বাক্য—

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥
—(গীতা—৯।২২)

উপাসনা তো অনেকেই করে, কিন্তু ফললাভ করে কয়জন? ভগবান তাই উপদেশ দিয়াছেন, অনন্যচিন্ত হইয়া আমাকে চিন্তা করিতে করিতে আমার উপাসনা করিবে। আমাতে সেইরূপ নিত্যযুক্ত যাহারা তাহাদেরই প্রয়োজনীয় অথচ অলব্ধ বস্তুর সংস্থান আমিই করিয়া দিব—শুধু তাহাই নহে, তাহাদিগের লব্ধ বস্তুর রক্ষাও আমি করিব।

এইরূপ অনন্যচিত্ত উপাসনার কারণেই শ্রীশ্রীঠাকুর চির-দিনই অন্তরঙ্গ ভক্তদিগের "যোগ" ও "ক্ষেম" বহন করিতেন। নির্জ্জন গিরি-গুহায়, দুর্গম অরণ্যে, দুস্তর সাগর বক্ষে, দুর্জ্জয় মরু-প্রান্তে—কিংবা দুরভিসন্ধিজাত বিরুদ্ধাচারী জনচক্র-

ব্যূহের মধ্যে—অথবা রোগে, তাপে কিংবা যে-কোন অবস্থা-বিপর্য্যয়ের ঘূর্ণীপাকের মধ্যে ঠাকুর সর্ব্বদা তাঁহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়াছেন, পথ দেখাইয়াছেন, আলোক দিয়াছেন, যেখানে পরাজয় সুনিশ্চিত বোধ হইয়াছে, সেখানেও তাঁহারই বরে জয়ের শঙ্খ বাজিয়া উঠিয়াছে—এই কয়েকটি অন্তরঙ্গ ভক্তের ভিতর দিয়াই তাঁহার লীলা জগতে প্রচারিত হইয়াছে। সে উপাসনার মুখ্য রূপ ছিল আজীবন তাঁহারই অনুচিন্তন এবং কি ক্ষুদ্র, কি বৃহৎ সকল কর্ম্ম তাঁহারই কর্ম্ম জ্ঞানে তৎ-সাধন। সে উপাসনায় 'দেহি-দেহি'র ভাব ছিল না; ফল-দাতা যিনি, কর্ম্মফল তিনিই বহন করিয়া আনিতেন।

মহারাজ যখন মার্কিন দেশে প্রচারক ছিলেন তখন ইহার পরিচয় নিত্য নিত্যই বিশেষরূপে পাইতেন। তাই তিনি বলিতেন যে, ভগবানের কাছে এটা-ওটা ভিক্ষা করিবে কেন? তুমি যাহা চাও, তোমার মধ্যেই তো সে সব আছে—তোমার আকাঙ্ক্ষার বস্তু তোমার ভিতর হইতেই বাহিরে আসিয়া রূপ লইয়া প্রকাশিত হইতেছে। কলিকা চাহে ফুল হইতে, বীজ চাহে বৃক্ষ হইতে। পুষ্পত্ব বৃক্ষত্ব তো তাহাদেরই ভিতরকার বস্তু—কলিকা ফুটিয়া পুষ্প হয়, বীজ ফুটিয়া বৃক্ষ হয়। তোমরাও নিজেকে ফুটাইয়া তোল, যাহা চাহিতেছ তাহাই পাইবে। পাইবেই—ইহা বিশ্বাস কর এবং বিশ্বাস করিয়া অগ্রসর হও। তোমার ভিতর অনন্ত শক্তি অপ্রকাশিত

হইয়া বর্ত্তমান আছে, সেই অপ্রকাশিত শক্তি বা Energyকে প্রকাশিত কর—অব্যক্তকে ব্যক্ত কর।

মহারাজ বলিয়াছেন, অব্যক্তকে ব্যক্ত কর, অপ্রকাশিতকে প্রকাশ কর তাহা হইলেই কোন কামনা আর অপূর্ণ থাকিবে না। কথাটি বট বীজের মত ক্ষুদ্র, কিন্তু ইহার অর্থ বট বৃক্ষের ন্যায় বিশাল! উপনিষদের 'ইন্দ্র বিরোচন সংবাদে' এবং অন্যত্র এই বিষয়টি বর্ণিত হইয়াছে।

সংক্ষেপে বলিলে বলিতে হয়—মূর্ত্ত এবং অমূর্ত্ত, ব্রহ্মের এই দুইটি রূপ। অমূর্ত্তরূপ মূর্ত্তরূপকে অবলম্বন করিয়াই প্রকাশিত হয়। আমরা যত পদার্থই দেখি, সে সমস্তই শক্তির অমূর্ত্ত অবস্থা হইতে মূর্ত্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। মূর্ত্ত অবস্থার ধ্বংস সাধন করিলে অর্থাৎ ঘনীভূত স্থূল অবস্থার বিনাশ করিলে, শক্তি আবার তাহার অমূর্ত্ত অবস্থায় অর্থাৎ ব্যাপক সূক্ষ্ম অবস্থায় ফিরিয়া যায়।

বিষয়-বর্গের মূল উপাদান প্রাণ-শক্তি। এই প্রাণ-শক্তিই নানা পদার্থের আকারে সর্ব্বদা প্রকাশিত হইতেছে। পদার্থের দর্শন-যোগ্য সেই আকার—ক্রিয়াত্মক (Motion) এবং জড়াত্মক (Matter) এই উভয় ভাবের সম্মিলিত রূপ। হার্ব্বার্ট স্পেনসারও এইরূপ কথাই বলিয়াছেন। হিন্দু-শাস্ত্র বলেন, এই প্রাণশক্তিই ব্রহ্মের ঐশ্বর্য্য ও মহিমা প্রকাশের জন্য জগদাকার ধারণ করিয়াছে। ইহাকেই বলা হয়—

'যস্য নাম মহৎ যশঃ ?' যশঃ অর্থে মহিমা বুঝায়। মহৎ যশের কোন প্রতিমা নাই, অর্থাৎ তাহা অমূর্ত্ত শক্তি। সুতরাং এই জগৎকেই অর্থাৎ ব্রহ্মের এই ঐশ্বর্য্য ও মহিমাকেই ব্রহ্ম দর্শনের উপায় করিয়া তুলিবার জন্য সাধনা করিতে হইবে। স্তম্ব হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত সমস্তই ক্রমোন্নত ভাবে ব্রহ্মের জ্ঞান ও তাহার অভিব্যক্তি মাত্র। যাঁহারা সর্ব্বদা এই রূপ দর্শন করেন, তাঁহারাই প্রকৃত তত্ত্বদর্শী। কিন্তু শুধু মনুষ্য-লোকেই প্রাণ-শক্তির চরম প্রকাশ হয় নাই। উন্নততর লোকে উন্নততর ভাবে প্রাণ-শক্তির বিকাশ হইতেছে।

এইরূপ ব্রহ্মদর্শনের জন্যই, এইরূপ অব্যক্তকে ব্যক্ত করার জন্যই মহারাজ ইঙ্গিত করিয়াছেন। বাহিরের আকাশের মত হৃদয়েরও আকাশ আছে এবং সেই আকাশেও বাহিরের আকাশের চন্দ্র সূর্য্যাদির ন্যায় চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, অগ্নি প্রভৃতি আছে। হৃদয়-আকাশে আছে অন্তঃকরণ-শক্তি। সেই অন্তঃকরণ-শক্তিকে রজঃ ও তমোর মলিনতা হইতে মুক্ত করিতে পারিলেই আত্মজ্যোতি ফুটিয়া উঠে। তখন অন্তঃকরণের কোন কামনাই আর অপূর্ণ থাকে না। উহাকেই মহারাজ বলিয়াছেন অন্তঃকরণের অপ্রমেয় শক্তি। রথ-চক্রের নাভিতে যেমন চক্রের অরগুলি গ্রথিত থাকে, সেইরূপ সমগ্র কামনার বস্তু অন্তঃকরণে নিহিত আছে। দৃষ্টি অন্তর্মুখী হইলেই আত্মদর্শন হয়, নচেৎ নহে। ইন্দ্রিয়গুলি

ও অন্তঃকরণ আত্মারই জ্ঞান-প্রকাশক ও ক্রিয়ানির্ব্বাহক যন্ত্রমাত্র।

ঠাকুরের অভিনব শিক্ষার গুণে ভক্তগণ এই সকল মহৎ জ্ঞান আপন আপন শক্তি অনুযায়ী লাভ করিয়াছিলেন। কাশীপুরে শ্রীপ্রভুকে ঘিরিয়া সে সময়ে ভক্তদিগের মেলা বসিত বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে চিহ্নিত কয়েকজনই ছিলেন তাঁহার প্রাণ প্রিয়। আধ্যাত্মিক উন্নতি বিধানের জন্য তাঁহারা সর্ব্বদাই ঠাকুরকে ঘিরিয়া রহিতেন এবং তাঁহার অমৃতবর্ষিণী প্রাণ-শক্তি-দায়িনী বাণী নিয়ত তাঁহাদিগের কর্ণে বর্ষিত হইত, তাঁহার ভাবধারা ও চিন্তাপ্রবাহ সকলের অলক্ষিতে সর্ব্বদা তাঁহাদিগের মধ্যে প্রবিষ্ট হইত।

এই অন্তরঙ্গ ভক্তদিগের মধ্যেও ছিল আবার দুইটি শ্রেণী —গৃহী এবং সন্ন্যাসী। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথিতে দেখিতে পাই—

অন্তরঙ্গদের মধ্যে দ্বিবিধ-প্রকৃতি।
কেহ কেহ ত্যাগী, কেহ গৃহস্থের জাতি ॥ (২)

মহারাজ, স্বামীজি প্রভৃতি কয়েকজন ছিলেন "ত্যাগী'র প্রকৃতি"—তাঁহাদিগের গৃহ থাকিলেও তাঁহারা গৃহী ছিলেন না।

---

(২) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি—অক্ষয় কুমার সেন। (দ্বিতীয় সংস্করণ—উদ্বোধন), ৬১৩ পৃষ্ঠা।

ঠাকুর যেদিন ভক্তদিগের সম্মুখে বলিলেন যে, তাঁহার নিরাকারে ঝোঁক হইয়াছে, সে বুঝি লয় হইবার জন্য—সেদিন কালীমহারাজ প্রভৃতি অন্তরঙ্গ ভক্তদিগের হৃদয়ে বজ্রাঘাত হইল! কাহারও কাহারও মনে পড়িয়া গেল, ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে একদিন ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে বলিয়াছিলেন—"যারা অন্তরঙ্গ তাদের মুক্তি হবে না। বায়ু কোণে আর একবার (আমার) দেহ হবে।" এই উক্তিরও অনেকদিন পূর্ব্বে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ঠাকুর আর একবার বলিয়াছিলেন—"নরলীলায় অবতার। নরলীলা কিরূপ জানো? যেমন বড় ছাদের জল নল দিয়ে হুড় হুড় ক'রে পড়ছে। সেই সচ্চিদানন্দ, তাঁরই শক্তি একটি প্রণালী দিয়ে, নলের ভিতর দিয়ে আসছে। অবতারকে সকলে চিনতে পারে না।......আর একবার আসতে হবে। (৩)

ঠাকুরের জীবিতকালে এবারেও ত অনেকে তাঁহাকে চিনিতে পারে নাই। যাহারা চিনিয়াছিল তাহারা ত্রাণ পাইয়াছিল।

সেই নরদেবতাকে, সেই সচ্চিদানন্দের স্রোতোধারটিকে নিকট হইতে নিকটতম করিয়া পাইয়া—তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া, দণ্ডের পর দণ্ড তাঁহাকে আস্বাদন করিয়া, তাঁহারই

(৩) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত—শ্রীম।

বিরচিত স্নিগ্ধোজ্জ্বল চন্দ্র-শোভার মধ্যে নিরন্তর বাস করিতে পারিয়া, তাঁহার সিংহাসনতলের ধূলির উপর লুটাইয়া লুটাইয়া দেহ-মনকে শুদ্ধ করিয়া, নানা সাধনার সিদ্ধিরূপ অমৃত ফল করধৃত আমলকীবৎ প্রাপ্ত হইয়া শেষে যাঁহারা হঠাৎ একদিন বুঝিতে পারেন যে, সৌভাগ্য-শৈলের সেই উচ্চ চূড়া হইতে নিম্নের অতল গহ্বরে পতিত হইবার সময় তাঁহাদিগের আসন্ন হইয়াছে—সেই সুখ, সেই সম্পদ্, সেই তাঁহাদের সর্ব্বস্ব নিশিশেষে স্বপ্নের মত মিলাইয়া যাইতে আর বিলম্ব নাই, তখন তাঁহাদিগের হৃদয় মধ্যে বেদনার যে কি তীব্র অগ্নিমুখ লৌহ-সূচী বিদ্ধ হয় তাহা শুধু তাঁহারাই জানেন, যাঁহারা রাজপুত্র থাকিয়াও সহসা একদিন কাঙ্গাল হইবার সম্ভাবনাকে একান্ত আসন্ন বলিয়াই বুঝিতে পারেন।

ঠাকুরের রোগমুক্তির জন্য তাই একদিন নরেন্দ্রনাথ নিশাকালে উদ্যানবাটিকা ঘিরিয়া ঘিরিয়া উচ্চকণ্ঠে রাম নাম করিতে লাগিলেন। যদি কোন ঐশীশক্তি ধরাতলে উপস্থিত হইয়া অপ্রত্যাশিত ভাবে ঠাকুরকে রক্ষা করেন—এমন অঘটন ত কখন-কখনও ঘটিয়া থাকে! এই আশায় নরেন্দ্র-নাথ সমস্ত রজনী রামনাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ঠাকুর শুনিতে পাইয়া তাঁহাকে নিকটে ডাকিয়া স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে কহিলেন—'বৎস, এই বৃথা চেষ্টা ত্যাগ করো!'

নরেন্দ্রনাথ ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। কালীমহারাজ ও অন্যান্য

ত্যাগী ভক্তগণ দৃঢ়পণে বদ্ধ হইয়া ঠাকুরকে আরোগ্য করিবার কামনায় যেমন অসম্ভব নিষ্ঠার সহিত তাঁহার সেবা করিতেছিলেন, তেমনি করিতে লাগিলেন।

ঠাকুর ১১ই ডিসেম্বর কাশীপুরে আগমন করিয়াছিলেন। কয়েকদিনের মধ্যেই তাঁহার শরীর পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকটা সুস্থ বোধ হইতে লাগিল। সে দিন ছিল ১লা জানুয়ারি, একাদশী তিথি (১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ)। বেলা তখন তৃতীয় প্রহর। সকলে দেখিল ঠাকুর দ্বিতল হইতে নিম্নে উদ্যানে নামিয়াছেন। তাঁহার পরিধানে তখন ছিল একখানি সূক্ষ্ম লাল পেড়ে ধুতি, গায়ে সবুজ বর্ণের বনাতের কোট ; কর্ণমূল পর্য্যন্ত ঢাকে এমন একটি টুপী মাথায় দিয়া, পায়ে মোজা এবং লতা পাতা কাটা চটি জুতা পরিয়া ঠাকুর সেদিন কাহারও বিনা সাহায্যে নিম্নতলে নামিলেন। উদ্যানের পথের উপর আসিলেন! প্রভু ভ্রমণ করিতেছেন শুনিয়া সেবকগণ অত্যন্ত পুলকিত হইয়া উঠিলেন, ভাবিলেন ঠাকুরের রোগ নিশ্চয়ই অনেক ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে নতুবা তিনি উদ্যানে ভ্রমণ করিবেন কিরূপে? দিবা-রাত্রি প্রাণপণে যে সেবা চলিতেছিল তাহা সার্থক হইয়াছে দেখিয়া স্বভাবতঃই সেবকদিগের আনন্দের সীমা ছিল না! উহা যে নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের শেষ হাসি, সে কথা তখন অপরে বুঝিবে কিরূপে?

তখন "সেবাপর ভক্তগণ পাছু পাছু" সঙ্গে সঙ্গে রহিলেন।

প্রভু ভ্রমণ করিতেছেন শুনিয়া "নিকটে ছুটিল সব- যেবা ছিল যেথা।" সেদিন ইংরাজি নববর্ষের প্রথম দিবস বলিয়া আফিসাদি বন্ধ ছিল। গৃহস্থ ভক্তগণ অনেকেই সেইজন্য অপরাহ্নে উদ্যানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা ঠাকুরের চরণ-স্পর্শ করিয়া মহানন্দে পদধূলি লইতে লাগিলেন। দেখিলেন —ঠাকুর ভাবাবিষ্ট ও বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়াছেন—চিত্রার্পিতের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিয়াছেন! কিছুক্ষণ পর বাহ্য চৈতন্য ফিরিলে তিনি সকলকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন— "তোমাদের চৈতন্য হোক।" কেহবা সমাধি প্রার্থনা করিলে ঠাকুর প্রসন্ন মুখে বর দিলেন—তথাস্তু।" কল্পতরু ঠাকুরের নিকট সে-দিন যিনি যাহা চাহিলেন, তিনি তাহাই পাইলেন। গিরিশচন্দ্র চীৎকার করিয়া সকলকে ডাকিতে লাগিলেন— 'ওরে তোরা কে কোথায় আছিস আয়। ঠাকুর আজ কল্প-তরু হয়েছেন।' অনেকেই ঠাকুরের নিকটে আসিলেন এবং পদধূলি গ্রহণ করিয়া বর প্রার্থনা করিলেন। 'যুবক ভক্তগণ' ঠাকুরের পরিচর্য্যার ব্যবস্থা করিবার জন্য অন্যত্র ছিলেন, কাজ ফেলিয়া তাঁহারাই শুধু আসিতে পারিলেন না। তাঁহারা হয়ত মনে মনে ভাবিয়া থাকিবেন—আমরা তো তাঁহার সন্তান। সন্তানের জন্য যাহা-কিছু করিবার প্রয়োজন, তিনিই ত তাহা জানেন এবং সে সব নিজেই করিবেন, সেজন্য বর প্রার্থনা করিবার প্রয়োজন কি?

বরদানের কিছুক্ষণ পর পরিশ্রান্ত দেহে ঠাকুর উপরে আসিলেন। অনুভব করিতে লাগিলেন যেন তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া যাইতেছে!

সন্নিকটে রামলালে কন প্রভু রায়।
শালাদের পাপ লয়ে অঙ্গ জ্বলে যায়। (৪)

রামলাল দাদা গঙ্গাজলে ঠাকুরের দেহ মার্জ্জন করিয়া দিলে তিনি কথঞ্চিত সুস্থ হইলেন, কিন্তু তাঁহার গলরোগ সেই দিন হইতে আবার বাড়িতে লাগিল। চিকিৎসক তখন ঠাকুরের জন্য গুগ্‌লির ঝোলের ব্যবস্থা করিলেন। জীবন্ত গুগ্‌লির ঝোল রন্ধন করিতে শ্রীমা একটু ইতস্ততঃ করিতেছেন দেখিয়া ঠাকুর বলিলেন—'আমি খাবো, আমার জন্য রাঁধবে তাতে দোষ হবে না। ছেলেরা পুকুর থেকে গুগ্‌লি এনে তৈয়ার ক'রে দেবে।' গুগ্‌লি সংগ্রহের ভার মহারাজের উপর পড়ায় তিনি শ্রদ্ধাযুক্ত হৃদয়ে বাগানের পুষ্করিণী হইতে প্রত্যহ গুগ্‌লি আনিয়া খোলা ভাঙ্গিয়া শ্রীমাকে দিতেন। ঠাকুরের পথ্যই তখন ছিল তরল দ্রব্য। কোন কঠিন দ্রব্য তিনি গলাধঃকরণ করিতে পারিতেন না।

কাশীপুর উদ্যানবাটিকা তখন তপোক্ষেত্র হইয়াছে। অন্তরঙ্গ ভক্তগণ জপ, ধ্যান ও শাস্ত্র পাঠে মত্ত হইয়াছেন।

---

(৪) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি—অক্ষয়কুমার সেন। (দ্বিতীয় সংস্করণ—উদ্বোধন): পৃষ্ঠা ৬০৭।

চতুর্দ্দিকে মুক্ত, গঙ্গাশীকরে সিক্ত কাশীপুরের সেই উদ্যানে মাঘের অন্তে তখন ফাল্গুন আসিয়াছে; উদ্যানবাটিকার বৃক্ষে বৃক্ষে তখন নব বসন্তের প্রথম শিহরণ দেখা দিয়াছে। সেদিন ছিল ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ফাল্গুনী কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী—মহাকালের মহাপূজার বিশেষ তিথি। ব্রত উদ্‌যাপনের সমস্ত আয়োজন উদ্যানবাটিকা হইতে, অর্থাৎ যে গৃহে শ্রীশ্রীঠাকুর থাকিতেন তথা হইতে কিঞ্চিৎ দূরে অন্য একটি ঘরে সেদিন করা হইয়াছিল।

পূজার বিবরণ "কালী তপস্বী" হইতে নিম্নে উদ্ধৃত হইল;—"শিব রাত্রির দিন নরেন, নিরঞ্জন, গোপাল, কালী প্রভৃতি উপবাস ও রাত্রি জাগরণ পূর্ব্বক চারি প্রহরে শিবপূজা ও ধ্যান করিতেছেন। নরেন ও কালী পাশাপাশি বসিয়াই ধ্যান করিতেছিলেন। ধ্যান ভাঙ্গিলে নরেন কালীকে বলিলেন—'আমার শরীরে খুব জোরে একটা current (শক্তি প্রবাহ) চল্‌ছে, পরমহংসদেব যে শক্তি সঞ্চার করেন, তা কি এ-ই শক্তি,—আমার হাতে হাত দিয়ে দেখ্‌ত।' কালী তখন নরেনের দক্ষিণ হস্তের কনুয়ের নিকটে ও দক্ষিণ উরুতে স্বীয় দক্ষিণ হস্ত ন্যস্ত করিয়া অনুভব করিলেন যে, নরেনের সর্ব্ব শরীর কাঁপিতেছে। নরেন জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কিছু feel (অনুভব) কচ্ছ কি?' কালী বলিলেন 'হাঁ strong vibration (জোর কম্পন) feel (অনুভব) কচ্ছি।' (৫)

(৫) কালী তপস্বী—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতি (মঠ)। ১৩৩৩। ৩৫ পৃষ্ঠা।

কাশীপুরের শিবরাত্রিব্রত উদ্‌যাপনের মত একটি সাধারণ ব্যাপার যে ভাবে 'লীলাপ্রসঙ্গে' (সাধক ভাব ৯-১০ পৃষ্ঠা) বর্ণিত হইয়াছে, মহারাজ তাঁহার "জীবন কথায়" সে বর্ণনাকে "অতি রঞ্জিত" বলিয়াছেন। (৬)

মহারাজ যে উত্তরকালে শুধু তাঁহার বিদ্যাবত্তা, বাগ্মীতা, আধ্যাত্মিক শক্তি, সংগঠন-কৌশল, সংঘপরিচালনে দক্ষতা, জ্ঞানগর্ভ সুললিত রচনা ও সুতীব্র দার্শনিক মনীষা, চরিত্র-মাহাত্ম্য প্রভৃতি নানা গুণরাশির জন্যই বিশ্ববিখ্যাত ছিলেন তাহা নহে—শুধু যে তাঁহার শিশুজনসুলভ সারল্য, মনের ঔদার্য্য, চিত্তের গাম্ভীর্য্য, চিন্তার প্রাখর্য্য—তাঁহার ত্যাগ, সেবা, দয়া, ক্ষমাই যে তাঁহাকে মানবসমাজে বরণীয় করিয়াছিল, তাহাও নহে। সর্ব্বদা বিচারশীলতাই তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ পদবীতে আরূঢ় করিয়াছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর একদিন স্বামী যোগানন্দকে বলিয়াছিলেন—"ভক্ত হবি, তা' বলে কি বোকা হবি? লোকে ঠকিয়ে নেবে? পাঁচ দোকান ঘুরে দর যাচাই ক'রে নিবি।" ভক্ত হইলেও সর্ব্বদা বিচারশীল হইতে হইবে, ইহাই ছিল ঠাকুরের উপদেশ। মহারাজের সমগ্র জীবন এই বিচারশীলতার একটি আদর্শ স্বরূপ ছিল। মহারাজ ছিলেন সরল বিশ্বাসী, তাই ঈশ্বর লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু সরল ছিলেন বলিয়াই

---

(৬) বিশ্ববাণী—আষাঢ়, ১৩৪৮। ১৩৩ পৃষ্ঠা।

তিনি—যাহাকে আমরা বলি "বোকা"—তাহা ছিলেন না। চক্ষু কর্ণকে তিনি সর্ব্বদাই মুক্ত রাখিতেন এবং বিচার সহায়ে মুহূর্ত্তে বুঝিয়া লইতেন চারিদিকে কি ঘটিতেছে।

মহারাজ যে-দেশে জীবনের মধ্যাহ্ন অতিবাহিত করিয়াছিলেন, সে দেশ কর্ম্মীর দেশ। সে দেশের কি পুরুষ, কি নারী সকলের জীবনই কর্ম্মময়। তাহারা যেমন ভোগ করিতেও জানে, তেমনি প্রয়োজন হইলেই ত্যাগ করিতেও পারে—তাহারা বিলাস-ব্যসনেও যেমন পটু, কর্ম্ম করিতেও তেমনি আগ্রহশীল। মহারাজকে একজন আসক্তিশূন্য কর্ম্মবীর দেখিয়া তাই তাহারা শ্রদ্ধার্ঘ্য দান করিতে কৃপণতা করে নাই। তাহারা সবিস্ময়ে দেখিয়াছে যে, ভারতের এই ঋষিকল্প সন্ন্যাসী ধর্ম্মসভায় আপনাকে উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠা করিতেও যেমন সমর্থ, আবার আশ্রমসংলগ্ন ভূমিতে হল চালনা করিতেও তেমনি কুশলী। সন্ন্যাসী আদৌ পরমুখাপেক্ষী নহেন—সর্ব্ব বিষয়ে স্বাবলম্বী। ধার্ম্মিকতার মূল্য দিতেও তিনি যেমন মুক্তহস্ত, শ্রমের মর্য্যাদা প্রদান কালেও তিনি তেমনি অকুণ্ঠ। অথচ কোন কর্ম্মেই তাঁহার আসক্তি নাই। এমন কোনও সাংসারিক কার্য্য ছিল না যাহা মহারাজ জানিতেন না। গৃহ মার্জ্জন হইতে আরম্ভ করিয়া সীবন, মোটর-গাড়ী পরিচালন, জুতা-সেলাই, দপ্তরীর কাজ, পশু-পালন, হলকর্ষণ প্রভৃতি সকল কার্য্যই তিনি একজন

বিশেষজ্ঞের মত করিতে পারিতেন। তিনি বলিতেন—ভগবান জ্ঞান বুদ্ধি বিচারশক্তি, দেহের বল প্রভৃতি দিয়াছেন, সে কি কুঁড়েমিতে কাল হরণ করিবার জন্য ? যখন যাহাই কেন না কর, তাহাই ঈশ্বরের অর্চ্চনা বলিয়া মনে করিবে। কর্ম্মের ছোট-বড় নাই।

বিশ্বের দিকে চাহিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, একটি বিরাট কর্ত্তৃত্ব চারিদিকে ওতঃপ্রোত ভাবে বিরাজমান। সেই কর্ত্তৃত্ব বা ক্রিয়াশক্তি আমাদের প্রত্যেকের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইতেছে। সুতরাং সন্ধ্যা-বন্দনাদি বা আহার নিদ্রা অর্থোপার্জ্জন প্রভৃতি সকল কর্ম্মেরই কর্ত্তা সেই ভগবান বা সেই তিনি যিনি সকল শক্তির আধার। আমরা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র এবং শক্তিহীন; কোন-কিছু করিবার শক্তি আমাদের নিজস্ব নহে। সেই কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া মহারাজ বলিতেন— Work is worship—কর্ম্ম মাত্রেই ভগবানের পূজা। প্রভাতে শয্যাত্যাগ হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রিতে শয্যাগ্রহণ পর্য্যন্ত এই কথাই স্মরণে রাখিও—"ভবদাজ্ঞয়ৈব প্রাতরুত্থায় তব প্রিয়ার্থং সংসারযাত্রামনুবর্ত্তয়িষ্যে।" আর মনে রাখিও— "যৎকরোমি জগন্নাথস্তদেব তব পূজনম্।" মহারাজের নির্দ্দেশ-বাণী স্মরণ হইলেই মনে পড়ে শ্রীচণ্ডীর দেবস্তুতি—

ধর্ম্ম্যাণি দেবি সকলানি সদৈব কর্ম্মা-
ণ্যত্যাদৃতঃ প্রতিদিনং সুকৃতী করোতি।

হে দেবি! সুকৃতীশালী জনগণ তোমার প্রসাদে প্রতিদিন অতিশয় শ্রদ্ধার সহিত যাবতীয় কর্ম্মকে ধর্ম্মময় করিয়া অনুষ্ঠান করেন। তাহারই ফলে তাঁহারা—

স্বর্গং প্রয়াতি চ ততো ভবতীপ্রসাদা
ল্লোকত্রয়েঽপি ফলদা ননু দেবি! তেন।

'স্বর্গং প্রয়াতি'—স্বর্গ লাভ করেন। অতএব হে দেবি! তুমি 'লোকত্রয়েঽপি ফলদা'—ইহলোকে জীবকে সুকৃতি কর, পরলোকে তাহাকে স্বর্গ ভোগের অধিকারী কর, আবার তুমিই তাহাদিগকে ইহপরকালের অতীত মোক্ষফল দিয়া থাক। প্রতিদিন প্রত্যেকটি কর্ম্ম এইরূপে ধর্ম্মময় করিয়া পরম শ্রদ্ধার সহিত করিতে পারিলেই তাহা উপাসনায় রূপান্তরিত হইয়া যায়। মহারাজের উপদেশের উদ্দেশ্য এই যে, অহংকর্ত্তৃত্ব পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বর কর্ত্তৃত্ব স্বীকার কর, তবেই work is worship হইবে—তুমি ইহলোকে সুকৃতি হইতে পারিবে এবং পরলোকেও স্বর্গ ও মোক্ষের অধিকারী হইবে।

আমরা আদৌ বুঝিতেই চাহি না যে, প্রত্যেক কর্ম্মের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত সকল অবস্থাতেই ঈশ্বরকর্ত্তৃত্ব পরিদৃশ্যমান, মানবকর্ত্তৃত্ব কিছু মাত্র নাই। আমরা সুখ চাহি, ধর্ম্ম চাহি না! বুঝিতে পারি না যে ধর্ম্ম ব্যতীত সুখ লাভ হয় না। ধর্ম্মই চিত্তপ্রসাদ দান করে। চিত্ত প্রসন্ন হইলেই অভাব বোধ থাকে না—অভাববোধ যত তিরোহিত হয়, দুঃখও

ততই দূরে যায়। মহারাজের বাণী—সকল কর্ম্মই ঈশ্বরের উপাসনা—ইহার অর্থ এত গভীর এবং এত প্রাণদ! ভগবান একদিকে যেমন কর্ম্মফলদাতা, অপরদিকে তিনি তেমনি কর্ম্মফলবিধাতা। 'আমি করিতেছি' বলিলেই কর্ম্মের সুখ দুঃখাদি, সকল ফল তিনি আমাকেই দেন, আর যন্ত্ররূপে তাঁহার কর্ম্মই করিতেছি বলিতে পারিলেই, সকল কর্ম্মফল তিনি খণ্ডিত করেন—আমাদের দুঃখ ও বন্ধন উভয়ই কাটিয়া যায়!

মহারাজ বলিতেন, আমাদের দেশ শ্রমিকের মান্য জানে না, শ্রমের মূল্য বোঝে না বলিয়াই এত শ্রমবিমুখ। কর্ম্মের ছোট-বড়র উপরেই যেন আমাদের মর্য্যাদা নির্ভর করে! খাটিয়া খাইব, বসিয়া বসিয়া খাইব না—কাহারও গলগ্রহ হইব না, এই কথাটির দাম যে কত তাহা পৃথিবীর স্বাধীন জাতিগুলি জানে বলিয়াই আজ তাহারাই বা কোথায় আর আমরাই বা কোথায়! আমরা শুধু গরুড় পক্ষীর স্তবই আবৃত্তি করি, আর তাহারা বৈনতেয় অপেক্ষাও বহু বেশী বেগশালী বিমান প্রস্তুত করে! আমরা মনেও পরাধীন, দেহেও পরাধীন—আমরা চিন্তাতেও পরাধীন, কর্ম্মেও পরাধীন! আমরা স্বাবলম্বী হইব কিরূপে? শুধুই কাঁদিতে জানি, আর ভগবানকে ডাকিয়া বলিতে জানি—রক্ষা কর! রক্ষা কর! এ-কথা বলিতে জানি না, আমায় রক্ষা করিয়া কাজ নাই প্রভু, শুধু বল দাও—বিপদকে জয় করি! স্বাবলম্বন ভিন্ন আত্মার

মুক্তি নাই। ঠাকুর বলিতেন—'কৃপাবাতাস ত বহিতেছেই, তুমি পাল তুলিয়া দাও।' আমরা নোঙ্গর ফেলিয়া নৌকার দাঁড় টানিতেছি! যেখানে ছিলাম, সেইখানেই আছি এবং বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া দেখিতেছি—পূর্ব্বে পশ্চিমে, উত্তরে দক্ষিণে কত নৌকা পাল তুলিয়া তীরের মত ছুটিয়া চলিয়াছে!

মহারাজের নিকট কিছুক্ষণ ধরিয়া বসিবার সৌভাগ্য হইলেই কর্ম্মানুষ্ঠান সম্বন্ধে এইরূপ কত উদ্দীপনাপূর্ণ বাণীই যে শুনা গিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। সত্য সত্য কর্ম্মবীর কাহাকে বলে তখনই তাহা বুঝিতে পারিয়াছি।

কাশীপুরে অবস্থানকালে মহারাজের ছিপে মাছ ধরিবার কৃতিত্বের কথা অনেকেই জানিত। উদ্যানের পুষ্করিণীতে মৎস্য শিকারে দক্ষতার কথা একদিন হঠাৎ শ্রীশ্রীঠাকুরের কর্ণে যাইয়া পৌঁছিল। সন্ধ্যার পর নির্দ্দিষ্ট সময়ে মহারাজ যখন ঠাকুরের সেবা করিতে আসিলেন তখন ঠাকুর কহিলেন—"তুই কি খুবই ছিপে মাছ ধরিস্?"

মহারাজ কহিলেন—আজ্ঞা হাঁ, ধরি।

ঠাকুর বলিলেন—আর ধরিস্ নি, জীবহিংসা করা পাপ।

মহারাজ উত্তর দিলেন—কেন? আত্মা তো মরে না, কাউকে মারেও না—নায়ং হন্তি, ন হন্যতে। তখন মাছ ধরা পাপ কিসে?

মহারাজের কথা শুনিয়া ঠাকুর নানাবিধ যুক্তিদ্বারা বুঝাইতে লাগিলেন। কিন্তু মহারাজ কিছুতেই বুঝিতে চাহিলেন না যে মাছ ধরা পাপ। অনেকক্ষণ ধরিয়া কথা বলায় ঠাকুরের কাসির উপদ্রব উপস্থিত হইল এবং কাসিতে কাসিতে কফের সঙ্গে একটু রক্তও দেখা গেল। বিচলিত হইয়া মহারাজ কহিলেন—এখন থাক্। আর কথা বল্‌বেন না।

ঠাকুর স্নেহমধুর কণ্ঠে বলিলেন—এ কি বল্‌ছিস্? তোদের একটার জন্য আমি এমন বিশ হাজার শরীর দিতে পারি—তাতে যদি তোদের একজনেরও উপকার হয়। আমি যা' বল্‌ছি তার তুই ধ্যান কর্। তা হ'লেই বুঝতে পারবি। ছেলেদের মধ্যে তোকে বুদ্ধিমান্ ব'লে জানি। ধ্যান কর্। বুঝ্‌তে পার্‌বি।

ঠাকুরের নিকট বোধি প্রার্থনা করিয়া মহারাজ এই বিষয়ে দিবসত্রয় গভীর ধ্যান করিয়া যখন বুঝিলেন যে, তাঁহারই অন্যায় হইয়াছে, তখন ঠাকুরের নিকটে করযোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, বলিলেন—এমন পাপ কাজ আর কর্‌বো না।

ঠাকুরের কথাই ছিল—"পাপ পুণ্য আছে, আবার নাই। ঈশ্বর দর্শন যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ ভেদবুদ্ধি, ভাল মন্দ জ্ঞান থাকবেই থাক্‌বে।......মন্দ কাজটি করলেই মন ধুগ্ ধুগ্ কর্‌বে। ......পাপ কর্‌লেই তার ফলটি পেতে হবে। পাপ আর পারা কেউ হজম কর্‌তে পারে না।"

অনুতাপানলে নিজেকে দগ্ধ করাই পাপের একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত। মহারাজকে অনুতপ্ত দেখিয়া ঠাকুর সানন্দে বলিলেন যে, মাছ ধরাতে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়। খাদ্যের লোভ দেখাইয়া বড়শি লুকাইয়া রাখা, আর অতিথি বা বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করিয়া তার খাদ্যের মধ্যে বিষ লুকাইয়া রাখা একই রকম পাপ।

মহারাজ তখন অবনত মস্তকে নিজের অপরাধ স্বীকার করিলেন এবং ঠাকুরের কৃপা ভিক্ষা করিলেন।

এই প্রসঙ্গে ঠাকুর বলিয়াছিলেন যে, আত্মা মরে না এবং মারেও না তাহা ঠিক। কিন্তু লোকে যতক্ষণ আত্মস্বরূপ না হইতেছে ততক্ষণ 'নায়ং হন্তি ন হন্যতে' এই জ্ঞানের প্রকাশ হয় না। যে আত্মস্বরূপ হইয়াছে, হত্যা করিবার প্রবৃত্তিই তাহার হয় না। যতক্ষণ ঐ প্রবৃত্তিটি মনে আছে ততক্ষণ আত্মস্বরূপ হওয়া ঘটে নাই—ইহাই জানিতে হইবে। আত্ম-স্বরূপ না হইতে পারিলে কাহারও আত্মজ্ঞান হয় না, পূর্ণজ্ঞান হইলে মরা মারা এক বোধ হয়। মরিলেও কিছু মরে না—মারিয়া ফেলিলেও কিছু মরে না—ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে। নায়ং হন্তি ন হন্যতে।

ঠাকুরের নিকট উপদেশ লইয়া মহারাজ আত্মজ্ঞান লাভের জন্য ধ্যান করিতে লাগিলেন। এই আত্মজ্ঞান লাভই বৈদান্তিক ব্রহ্মলাভ; সাংখ্য ইহাকেই বলিয়াছেন—বিবেকজ্ঞান

লাভ। বৌদ্ধ মতে ইহাকেই বলে শূন্যতা প্রাপ্তি। "জ্ঞানীরা যাঁকে ব্রহ্ম বলে, যোগীরা তাঁকেই আত্মা বলে, আর ভক্তেরা তাঁকেই ভগবান বলে।" এই অজর অমর অভয় আত্মবস্তুকে অন্যস্থানে সন্ধান করিলে পাওয়া যায় না ; গভীর ধ্যান সহায়ে আত্মহৃদয়েই এই পরম বস্তুর বা হৃদয়নগরীর সম্রাটের সন্ধান করিতে হয়। ইনি নিরবয়ব, এক, অদ্বিতীয় নির্ব্বিকার। অন্তঃকরণকে বিশুদ্ধ করিতে করিতে যখন রজঃ ও তমের মলিনতা একেবারেই দূর হইয়া যায় এবং অন্তঃকরণ সত্ত্ব-প্রধান হইয়া উঠে, কেবল তখনই সেই পরিশুদ্ধ সাত্ত্বিক হৃদয়ে আত্মজ্যোতির স্ফুরণ ঘটে। এই বিশ্বের সকল পদার্থকেই তখন ব্রহ্মের বিভূতি বা ঐশ্বর্য্য বলিয়া মনে হয়। বুঝিতে পারা যায় যে, আত্মা জাগতিক অসংখ্য বস্তুর নামরূপাত্মক "আশ্রয় সেতু" মাত্র। নাম-রূপেরই নিরন্তর ধ্বংস হয়—আত্মা চিরদিন থাকেন।

শব্দ স্পর্শ প্রভৃতি নানা বিজ্ঞানের আকারে এই জগৎ অনুভূত হইতেছে ; ইহা বিষয় এবং বিষয়ীর সংসর্গের ফলে উদ্ভূত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফল। সাধারণ লোকে মনে করে যে ইন্দ্রিয়াদি এই জগৎকে যেরূপ ভাবে দেখাইতেছে, উহা তাহাই এবং প্রত্যেক পদার্থেরই স্বাধীন সত্তা আছে। অবিদ্যা বা অবিবেকের ফলে এইরূপ জ্ঞান জন্মাইতেছে। অবিদ্যার প্রভাবে এই সকল বিষয়ে আসক্ত হইয়া আমরা

তৎপ্রাপ্তির জন্য চেষ্টিত হই। কিন্তু যাঁহারা অনুভব করিতে পারেন যে, 'বাহ্য বিষয় ও আন্তর ইন্দ্রিয়ের' আকারে ব্রহ্মশক্তি প্রকাশিত হইয়া ব্রহ্মের স্বরূপ বিকাশ করিতেছেন তাঁহারাই তত্ত্বদর্শী। বিশ্বের তাবৎ বস্তুকে এবং ব্রহ্মশক্তিকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত তত্ত্বদর্শিগণ নিয়ত অভ্যাস করিয়া থাকেন। তত্ত্বজ্ঞানই আত্মজ্ঞান। জীবাত্মা আর পরমাত্মা এক জ্ঞান হলে তত্ত্বজ্ঞান হয়।

এই সাধনার পথ দুরূহ এবং প্রস্তর-কঙ্করময়। সেই পথের যাত্রী হইয়া মহারাজ যে শেষে সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর সেজন্য তাঁহাকে বহুদিন হইতেই প্রস্তুত করিতেছিলেন। অর্থাৎ "আপন হাতে গড়িতেছিলেন।" সেই গঠন কত দিনে সম্পূর্ণরূপে সমাপ্ত হইয়াছিল তাহা বলা যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর কর্তৃক মহারাজের আত্মশক্তি স্ফুরণ করিয়া দেওয়ার ফলে তিনি যে অতি অল্প আয়াসে তত্ত্বদর্শী হইয়াছিলেন তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়। তবে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সিদ্ধি লাভের জন্য তিনি প্রাণপণ চেষ্টিত হইয়াছিলেন বলিয়াই ভগবানের কৃপালাভ করিয়াছিলেন।

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম্॥

ইহার অর্থ নিশ্চেষ্টতা নহে,—কৃপা বাতাসের সহায়ে আত্ম-চেষ্টায় তরণী সঞ্চালনই এই মহৎ বাক্যের নিগূঢ় অর্থ। Heaven helps those who help themselves—জীবনের কোন ক্ষেত্রেই এ কথাটি বিস্মৃত হইলে চলিবে না—পুরুষকার চাই-ই চাই। পূর্ণাবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের নিজের সিদ্ধিলাভের ইতিহাসই এ বিষয়ের চরম দৃষ্টান্ত।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার ভক্তদিগকে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছিলেন—"শিবাংশসম্ভূত ও বিষ্ণু-অংশসম্ভূত।" এই দুই শ্রেণীর ভক্তদিগের প্রকৃতি, আচার-ব্যবহার, ভজনে অনুরাগ প্রভৃতি বিষয়ে যে স্বাভাবিক পার্থক্য ছিল ঠাকুর 'ভাবমুখে' থাকাকালে তাহা দেখিতে পাইতেন; দেখিতেন যে তাহাদিগের মানসিক প্রকৃতি ঐ দুই বিভিন্ন আদর্শে গঠিত। ভক্তদিগের সহিত ঠাকুরের যে সকল বিশেষ সম্বন্ধ স্থাপিত ছিল তাহাও ভক্তদিগের অন্তঃপ্রকৃতির অনুরূপ—অর্থাৎ 'শিবচরিত্র' বা 'বিষ্ণুচরিত্র' এই দুইটি ছাঁচ বা Type-এর অনুরূপ। ঠাকুর বলিতেন—"মানুষগুলোর ভেতর কি আছে, তা' দেখ্‌তে পাই; যেমন কাঁচের আলমারির ভিতর যা যা জিনিস থাকে সব দেখা যায়, সেই রকম।" স্বামী সারদানন্দ মহারাজ বলিয়াছেন যে, যাহার যেরূপ প্রকৃতি সে তদ্বিপরীতে কখনই আচরণ করিতে পারে না—কাজেই ভক্তদিগের কাহারও ঠাকুরের ঐ সম্বন্ধ

বা ভাবের বিপরীতে গমন বা আচরণ কখন সাধ্যায়ত্ত ছিল না। (৭)

বিভিন্ন ছাঁচের ভক্তের সহিত ঠাকুরের সম্বন্ধও ছিল বিভিন্ন। যেমন নরেন্দ্র নাথের কথায় তিনি বলিতেন—"নরেন্দর যেন আমার শ্বশুর ঘর, (আপনাকে দেখাইয়া) "এর ভিতর যেটা আছে সেটা যেন মাদি, আর (নরেন্দ্রকে দেখাইয়া) ওর ভেতর যেটা আছে, সেটা যেন মদ্দা।" রাখাল মহারাজকে তিনি ঠিক ঠিক নিজ পুত্রস্থানীয় বিবেচনা করিতেন। গিরিশচন্দ্রকে ঠাকুর দেখিতেন যেন 'ভৈরব।' মহারাজকে ঠাকুর একদিন বলিয়াছিলেন—"তোর ভ্রূ দুইটি—চোখ ও কপাল দেখে শ্রীকৃষ্ণের মুখের উদ্দীপনা হয় ও আমার ভেতর রাধার ভাব জেগে ওঠে কেন, বল্ দেখি? তোর ভেতর শ্রীকৃষ্ণের অংশ আছে, তা' না হলে আমার এভাব হল কেন?" সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, মহারাজ যে ছিলেন 'বিষ্ণু-অংশসম্ভূত' অথবা বিষ্ণু চরিত্রের ছাঁচ তাহা ঠাকুর বিশেষরূপেই জানিতেন এবং মহারাজের সহিত মহারাজেরই ভাবানুযায়ী কোন একটি বিশেষ সম্বন্ধও ঠাকুরের রীতি অনুযায়ী স্থাপিত ছিল।

স্বামী সারদানন্দ মহারাজ বলিতেছেন—"ভাবমুখাবস্থিত ঠাকুর ঐরূপ, স্ত্রী বা পুরুষ প্রত্যেক ভক্তের নিজ নিজ

(৭) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ—স্বামী সারদানন্দ। (গুরুভাব—পূর্বার্দ্ধ)। ৮৬ পৃষ্ঠা।

প্রকৃতিগত আধ্যাত্মিক ভাব সম্যক বুঝিয়া তাহাদের সহিত তত্তদ্ভাবানুযায়ী একটা সপ্রেম সম্বন্ধ সর্ব্বকালের জন্য পাতাইয়া রাখিয়াছিলেন। তত্তৎ ভাবসম্বন্ধাশ্রয়ে তাহাদের প্রত্যেককে ভগবদ্দর্শন-লাভের পথে তিনি নানা ভাবে অগ্রসর করাইয়া দিতেন।" (৮)

নরেন্দ্রনাথকে সর্ব্বদা একটি সুতীব্র অগ্নিশিখাবৎ দেখিয়া যুবক ত্যাগীভক্তদিগের অন্তরে তাঁহার প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধার ভাব স্বতঃই জাগ্রত হইয়াছিল। তাই তাঁহারা সকল বিষয়ে তাঁহার কথা মত চলিতেন। সে সময়ে কাশীপুর উদ্যান-বাটিকার হলঘরে সর্ব্বদাই শাস্ত্রাধ্যায়ন করা হইত এবং বেদান্তের বিচার চলিত। নরেন্দ্রনাথের সহিত বিচারে কালী-মহারাজকেই অধিক অংশ গ্রহণ করিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা তর্ক-যুদ্ধ করিতে দেখা যাইত। এই সকল বাদ-প্রতিবাদ শুনিলে ইহাই মনে হইত যে, উভয়েরই পাণ্ডিত্য অপূর্ব্ব, জ্ঞান অপূর্ব্ব, দার্শনিক মনীষাও ছিল উভয়েরই অতীব সমুজ্জ্বল। প্রত্যেক যুবক ভক্তকেই সাধারণতঃ পালাক্রমে দুই ঘণ্টা করিয়া ঠাকুরের সেবা করিতে হইত এবং প্রয়োজন হইলে ইহার অধিক সময়ও সেবার জন্য দিতে হইত। সেবা অন্তে কালী-মহারাজের অবশিষ্ট সময় কাটিত অবিরাম অধ্যয়নে। এই সময়ে তিনি পাশ্চাত্য দর্শন, বিজ্ঞান ও ন্যায়ের

(৮) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ—স্বামী সারদানন্দ। (গুরুভাব—পূর্ব্বার্দ্ধ)। ৮৭ পৃষ্ঠা।

অনেক গ্রন্থ পাঠ করিয়া ফেলিলেন। জ্ঞানোর পদার্থ-বিজ্ঞান, হার্সেলের জ্যোতিষ, জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের ন্যায়-শাস্ত্র ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিশ্ববিখ্যাত তিনটি সুবৃহৎ প্রবন্ধ, লিউস্ কৃত দর্শনের ইতিকথা, হ্যামিল্টনের দর্শন-শাস্ত্র প্রভৃতি এই সময়ে তাঁহার আয়ত্ত হইয়াছিল।

কোন কোন দিন এমন হইত যে রাত্রিকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবা করিতে করিতে যখনই মহারাজ দেখিতেন যে, ঠাকুর একটু নিদ্রামগ্ন হইয়াছেন, অমনি তিনি আলোকটিকে কিঞ্চিৎ আচ্ছাদিত করিয়া ঠাকুরের দিকটা অন্ধকার করিয়া দিতেন এবং নিজে মিলের ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন।

কোন দিনই ত ঠাকুরের গভীর নিদ্রা ছিল না, এখন ত অসুখের জন্য ঘুম আরও কমিয়া গিয়াছিল। একদিন তিনি সহসা জাগ্রত হইয়া মহারাজকে বলিলেন—কি বই পড়ছিস্?

মহারাজ কহিলেন—মিলের ইংরাজি ন্যায়শাস্ত্র।

ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন—ওই পুস্তক কি শিখায়?

মহারাজ বলিলেন—ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তর্ক, যুক্তি বিচার ও প্রমাণাদি এই গ্রন্থে বলা আছে।

ঠাকুর শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। বলিলেন—তুই-ই ত ছেলেদের মধ্যে বই পড়া ঢোকালি।

মহারাজের ভবিষ্যৎকাল যে কোন পথে পরিচালিত হইবে,

মহারাজ হয়ত তাহা জানিতেন না, কিন্তু ঠাকুর দিব্য-চক্ষে তাহা দেখিতে পাইতেন। তিনি জানিতেন যে, তাহার আপন হস্তে নিজের ছাঁচে গঠিত এই সন্তানটিকে পৃথিবীর নানা দেশের জ্ঞানবীরাগ্রগণ্যদিগের সহিত অক্লান্ত রণক্রীড়া করিয়া অবশেষে জয়ী হইতে হইবে, নতুবা ঠাকুরের আলোকধারা পাশ্চাত্য গগনে ভাস্বর সৌরমণ্ডলের মত প্রজ্জ্বলিত থাকিবে না! ঠাকুর অনেক সময় বলিতেন, নিজেকে বধ করিতে হইলে একটা নরুণই যথেষ্ট, কিন্তু অপরকে হত্যা করিতে হইলে ঢাল-তলোয়ার চাই। তাই তিনি কখনও তাঁহার এই সন্তানকে সেই ঢাল-তলোয়ার সংগ্রহ করিতে অনুৎসাহিত করেন নাই।

মহারাজ যেমন করিতেন শ্রীগুরুর সেবা, তেমনি করিতেন তীব্র অধ্যয়নের দ্বারা জ্ঞানসঞ্চয়, তেমনি আবার রাত্রির পর রাত্রি নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে উদ্যানের বৃক্ষতলে বসিয়া করিতেন ধ্যান, ধারণা প্রভৃতি যোগাঙ্গাদির নানারূপ সাধনা। প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে মুষ্টি মুষ্টি ইন্ধন নিক্ষেপ করিতে করিতে নবীন তাপসগুলি তখন নিত্য নিত্য অন্তরের বাসনা-কামনাসমূহ আহুতি দিয়া ব্রহ্মলাভের পথে অগ্রসর হইতেন। মোহমুদ্গর, নির্ব্বাণষটক্ বা শ্রীগীতার মন্ত্রগুলি তাঁহারা তখন প্রাণ দিয়া এইরূপ ভাবেই আবৃত্তি করিতেন যে, মন্ত্রও প্রাণময় হইয়া উঠিত এবং বোধি পরিবেশন করিতে করিতে যেন সেই

বিকম্পিত অগ্নিশিখার সঙ্গে সঙ্গে উদ্যান-বৃক্ষের ছায়ায় ছায়ায় ত্রিপুটী করে নৃত্য করিয়া বেড়াইত!

কাশীপুর যে একটি তপোক্ষেত্র হইয়া উঠিয়াছে তখন বাহিরের কেহ তাহা জানিত না এবং জানিতে চাহিতও না! উদ্যানের অভ্যন্তরে তখন বিকশিত হইতেছিল সর্ব্বত্যাগের শতদল, আর উদ্যানের বাহিরেই খরবেগে চলিয়াছিল সম্ভোগের নারকীয় লীলা-প্রবাহ এবং কামকাঞ্চনের নগ্ন-মূর্ত্তির বিলাস-তরঙ্গ!

সাংসারিক দারুণ অস্বচ্ছলতা দূর করিবার জন্য নরেন্দ্রনাথ উকিল হইবার মানসে তখন আইন পড়িতেছিলেন। শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার উকিল হওয়া হইল না বটে কিন্তু বাড়ীর একটা বন্দোবস্ত করিয়া দিবার তাড়না তাঁহার মনকে যে অস্থির করিয়া তুলিতেছিল, কাশীপুরে ঠাকুর তাহা জানিতেন।

তিনি দেখিতেছিলেন যে, নরেন্দ্রের মনে তখনও গৃহরূপ একটু আঁশ লাগিয়া আছে! একটু আঁশ থাকিলেও ত ঠাকুরের মা'র দয়া হইবে না! সেই আঁশটুকু দূর করিয়া দিবার জন্য তিনি একদিন নরেন্দ্রনাথকে বলিলেন—'তুই বাড়ীর একটা ঠিক ক'রে আয় না। সব হবে।' নরেন্দ্রনাথ বাড়ীতে গেলেন। ওকালতি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন না বলিয়া সকলে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। নরেন্দ্রনাথ পড়িতে বসিলেন, কিন্তু বুক আঁটু-পাটু করিতে লাগিল।

পড়িতে গিয়া পড়াতে একটা ভয়ঙ্কর আতঙ্ক আসিল। নরেন্দ্রনাথ পুস্তকাদি ফেলিয়া দিয়া নগ্নপদে কাশীপুরের দিকে দৌড়াইলেন!

ঠাকুর একদিন বলিলেন—"বাড়ীর সব বন্দোবস্ত ক'রে দিব, তারপর সাধনা করবো—তীব্র বৈরাগ্য হ'লে এরূপ মনে হয় না। তীব্র বৈরাগ্য হ'লে সংসার পাতকুয়ো, আত্মীয় কাল সাপের মত বোধ হয়। তখন 'টাকা জমাবো', 'বিষয় ঠিক্-ঠাক্ করবো' এ সব হিসাব আসে না। ঈশ্বরই বস্তু, আর সব অবস্তু—ঈশ্বরকে ছেড়ে বিষয় চিন্তা!"

নরেন্দ্রনাথ বুঝিলেন যে, ঠাকুর এই শাণিত বাণটি তাঁহাকেই লক্ষ্য করিয়া ত্যাগ করিয়াছেন।

শ্রী-ম লিখিয়াছেন যে, নরেন্দ্রনাথ "এই সকল কথা শুনিয়া বাণ-বিদ্ধের ন্যায় একটু কাৎ হইয়া শুইয়া পড়িলেন।"

যাহার কাজ তাহাকেই করিতে হইবে ইহাই ভগবানের নিয়ম। করুণাময় ঠাকুর বোধ হয় এই ভাবেই নরেন্দ্রর মনের আঁশ নরেন্দ্রকে দিয়াই দূর করাইয়া লইয়াছিলেন। কুশলী আচার্য্যের রীতিই এই।

রাখাল মহারাজ, লাটু মহারাজ, কালীমহারাজ প্রভৃতি কয়েকজনের ব্যাপার ছিল অন্যরূপ? ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে থাকা কালেই তাঁহাদের সংসারাসক্তি কাটিয়া গিয়াছিল। দেখা যায় কাশীপুরে আসিবার পর কালী মহারাজের পিতা একদিন

তথায় উপস্থিত হইয়া ঠাকুরকে ধরিয়া বসিলেন যে, পুত্রকে সংসারাশ্রমে ফিরিয়া যাইবার আদেশ দিতেই হইবে! ঠাকুর সুদৃঢ় কণ্ঠে জানাইয়া দিলেন যে তাহা আর হইতে পারে না—"তোমার ছেলে যুগে যুগে আমার সঙ্গে আসিয়াছে ও আসিবে। তাকে আমি খেয়ে ফেলেছি। সে আর তোমার ছেলে নয়। সে আমার অন্তরঙ্গ পার্ষদ।"

এখন মনে পড়ে মহারাজের পূর্ব্বোদ্ধৃত কবিতার কয়েকটি চরণ—

তুমি যে কৃপা করেছ প্রভো
তাহা কি আমি ভুলিতে পারি,
তুমি যেমন খেয়েছ আমায়
আমি তেমনি খেয়েছি তোমায়;
এ রহস্য বুঝিবে কেবা—
তাহা আমি বলিতে নারি।

ঠাকুর মহারাজকে নিজের ছাঁচে গঠন করিয়া একেবারেই আত্মস্থ করিয়াছিলেন, বোধ হয় ইহারই ইঙ্গিতস্বরূপ মহারাজ লিখিয়াছিলেন 'তুমি যেমন খেয়েছ আমায়।' ঠাকুরের কৃপা পাইবার পর হইতেই মহারাজের নিজের বলিতে কিছুই ছিল না—মনও নহে। ঠাকুরের লীলা-বিলাসের জন্য, নিজের যাহা-কিছু সবই তিনি ঠাকুরকে অর্পণ করিয়াছিলেন—নিজের জন্য বিন্দুমাত্রও অবশিষ্ট রাখেন নাই। মহারাজ যেন ঠাকুরের

মধ্যে নিশ্চিহ্ন হইয়াছিলেন। আবার মহারাজও ঠাকুরকে 'খাইয়াছিলেন' অর্থাৎ ঠাকুরের ভাব ভক্তি শিক্ষা প্রভৃতি নিজের করিয়া লইয়া ধর্ম্ম ও কর্ম্মজীবন সেইভাবে গঠন করিয়াছিলেন—নিজের ভাব বলিতে পৃথক কিছু ছিল না, নিজের চিন্তা বলিতে পৃথক কিছু ছিল না, নিজের ইচ্ছা বলিতেও পৃথক কিছু ছিল না! সব ইচ্ছাই ঠাকুরের ইচ্ছার সহিত এক হইয়া গিয়াছিল। নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতির জীবনেও আমরা এইরূপই দেখিতে পাই।

রামকৃষ্ণ-গোষ্ঠীতে নরেন্দ্রনাথ ও কালীপ্রসাদই ছিলেন নানা বিষয়ে সমধর্ম্মী। নরেন্দ্রনাথ জ্যেষ্ঠ, কালীমহারাজ কনিষ্ঠ। কিন্তু উভয়েই ছিলেন তেজস্বী ভাস্কর—সঙ্কল্পে অটল, প্রতিজ্ঞায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী, সাধনক্ষেত্রে সহোদর, কর্ম্মে সব্যসাচী এবং রামকৃষ্ণার্পণমস্ত-জীবন। পরে সঙ্ঘনেতারূপে একজন হইয়াছিলেন অনির্ব্বচনীয় এবং নেতৃসেবক রূপে আর একজনকে দেখিতে পাই যে, তিনি যখনই যাহা কিছু করিয়াছেন সে সমস্তই নিজেকে বিলুপ্ত করিয়া ঠাকুর ও সঙ্ঘনেতার কাজ বলিয়া প্রকাশ করিতে সর্ব্বদা অকুণ্ঠ।

মহারাজের মনের এই ভাবটিকে ঠিক ঠিক ধরিতে না পারিয়া রামকৃষ্ণ-গোষ্ঠীর কেহ কেহ এক সময়ে বলিয়াছিলেন যে, মহারাজ স্বামী বিবেকানন্দকে তেমন ভক্তি শ্রদ্ধা করেন না। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে লিখিত এক খানি

পত্রে এই প্রসঙ্গে মহারাজকে জানাইয়াছিলেন—"স্বামিজীর শিষ্যদের মধ্যে কেউ কেউ হয়ত মনে করেন যে, তুমি তাদের মত তাঁকে ভক্তি শ্রদ্ধা কর না। ছোঁড়াগুলো এ-ও বোঝেনা যে, যাঁরা তাঁর সঙ্গে একত্র খেয়ে, বোসে, শুয়ে এলেন, যাদের সঙ্গে তিনি অভিন্ন ভাবে থেকে যাবতীয় কথা প্রকাশ করতেন, তারা যে তাঁকে কখনও অভক্তি করতে পারে না, চেষ্টা করলেও পারে না! যাহা হউক তুমি নিজ গুণে হ-কে ক্ষমা ক'রে যাহাতে উহার মঙ্গল হয় সেই বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রেখো। ………শ্রীশ্রীগুরু মহারাজ তোমায় বড় বুদ্ধিমান বল্‌তেন। তোমাকে উপদেশ দেওয়া আমার ধৃষ্টতা।"

মৃত্যুহীন ঠাকুর নরেন্দ্রনাথ ও কালীপ্রসাদ এই দুইটি কেশরীকে যেন দুই করে ধরিয়া ইচ্ছামত ক্রীড়া করিতেন এবং উত্তরকালে তাঁহারই ইচ্ছায় এই দুই বিক্রম-কেশরীর বৈদান্তিক গর্জ্জনে ইয়োরোপ-আমেরিকা এবং নানা দিগ্দেশ বিকম্পিত হইয়াছিল। তিনি একজনকে দেখিতেন 'বসানো শিব নয়—পাতাল ফোঁড়া শিব', অপর আর একজনের ভ্রূযুগ, চক্ষু ও কপাল দেখিয়া তাঁহার চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের মুখের উদ্দীপন হইত, তাঁহাতে শ্রীরাধার ভাব জাগ্রত হইয়া উঠিত। তিনি উভয়কেই ব্রহ্ম-জ্ঞান দিলেন, উভয়কেই নির্ব্বিকল্প সমাধিতে অবস্থান করাইলেন এবং উভয়কেই নগ্নপদে ভারতের দিগ্-দিগন্তে, তীর্থে তীর্থে দীর্ঘকাল ভ্রমণ করাইয়া অপমানক্লিষ্ট

পদদলিত লাঞ্ছিত ভারতকে চিনাইয়া ও বুঝাইয়া দিলেন। তিনি একজনকে দেখিতেন বিশ্ববিজয়ী বীর—'খাপ্-খোলা তলোয়ার' হাতে এবং আর একজনকে দেখিতেন—ছেলেদের মধ্যে বুদ্ধিমান্—নরেনের নীচেই তাহার বুদ্ধি। নরেন যেমন একটা মত চালাইতে পারে, সে-ও পারে ঠিক সেই রকমই,—তাই তিনি তাঁহাকেও আপন হাতে ও আপনার মনোমত করিয়া গঠন করিয়াছিলেন।

নরেন্দ্রনাথে ও কালী-মহারাজে পরিচয় দক্ষিণেশ্বরে এবং কলিকাতার নানা উৎসবক্ষেত্রে হইয়াছিল—কিন্তু শ্যামপুকুর ও কাশীপুর হইল এই দুই মহাসূর্য্যের মিলন-ভূমি। অন্তরের ঐশ্বর্য্যে বিভূষিত অলোকসামান্য চরিত্রবলে বলীয়ান এই বয়োজ্যেষ্ঠকে তাঁহার প্রাপ্য মর্য্যাদা সর্ব্বদা শ্রদ্ধায় অর্পণ করিয়া কালী মহারাজ কাশীপুর হইতেই নরেন্দ্রনাথের আজ্ঞাবহ গুরুভ্রাতা হইলেন—যেমন ছিলেন শ্রীরামচন্দ্রের আজ্ঞাবহ অমিতশক্তি সুমিত্রানন্দন। চুম্বক চুম্বককে আকর্ষণ করে না বটে, কিন্তু গুণ সর্ব্বদাই সমগুণান্বেষী। নরেন্দ্রনাথ টানিলেন মহারাজকে, মহারাজও টানিলেন নরেন্দ্রনাথকে। গুণ গুণকে অবলম্বন করিল—মহত্ত্ব ও ঔদার্য্য, মহত্ত্ব ও ঔদার্য্যকে আকর্ষণ করিল। নরেন্দ্রনাথ ও কালী মহারাজ ক্রমে হইয়া উঠিলেন হরিহরাত্মা, কিন্তু একে অন্যের ছায়া নহে। তাঁহারা মিলিলেন বটে, কিন্তু যিনি যাঁহার মত

১৭

আপনাকে হারাইলেন না, সর্ব্ব বিষয়ে মৌলিকই রহিলেন। 'সূত্রে মণিগণা ইব,' ঠাকুরের আদর্শটাই সকল বৈশিষ্ট্যকে একত্রে অনুস্যূত করিয়া দিল মাত্র। ঠাকুর ছিলেন দেব-যাদুকর, সেই জন্যই এই দুই দুর্জ্জয় মনীষার অপূর্ব্ব সম্মিলন ঘটাইতে পারিয়াছিলেন। এমন মিলন পৃথিবীতে কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়।

কাশীপুরে দণ্ডে দণ্ডে ভক্তকর্ত্তৃক ভগবানের যে পূজা হইতেছিল তাহার ছিল দুইটি অঙ্গ—একটি ঔষধ পথ্যাদি ও তদানুসঙ্গিক বিষয়ের ব্যবস্থা এবং আর একটি ছিল অতিশয় কঠোর তপশ্চর্য্যা। পরবর্ত্তীকালে মহারাজ বলিতেন: আমাদের মধ্যপথ, কঠোরও নহে—সহজও নহে। সেকালের সেই তপস্যার স্থান যেমন ছিল কাশীপুরে, তেমনি ছিল দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটী মূলে। নরেন্দ্রনাথ, কালী মহারাজ ও তারকনাথও অনেকদিন নিশাকালে পঞ্চবটী মূলে বসিয়া ঈশ্বরারাধনা করিতেন। এক একদিন সমস্ত রজনীই সেখানে অতিবাহিত হইয়া যাইত।

শ্রীশ্রীঠাকুরকে কেন্দ্র করিয়া তখন কাশীপুরে তাঁহারই চারি-দিকে যে জ্ঞানসমুজ্জ্বল আধ্যাত্মিক জ্যোতি বিকীরিত হইতেছিল, কালী মহারাজ প্রভৃতি কয়েকজন যুবকভক্ত সেই আলোকে পাঠ করিতেন যোগবাশিষ্ট, অষ্টাবক্রসংহিতা, গোপী-গীতা প্রভৃতি নানা শাস্ত্রগ্রন্থ। কখন কখনও পাণ্ডিত্যাভি-

মানী কোন কোন ব্যক্তি তথায় আসিয়া ন্যায়দর্শনের বিচার উপস্থিত করিতেন এবং পরাজয়ের টীকা লইয়া প্রস্থান করিতে বাধ্য হইতেন। প্রত্যক্ষদর্শী শ্রীযুত মহেন্দ্রনাথ দত্ত লিখিয়াছেন —"ধুনী জ্বালিয়া বসিয়া জপ-ধ্যান, কখন কখনও বা কীর্ত্তন করা কখনও বা সৎচর্চ্চা, সৎপ্রসঙ্গ করা—কখনও হল্-ঘরটিতে বসিয়া জপ-ধ্যান করা", এই ভাবে কালী মহারাজ প্রভৃতি ভক্ত সেবকগণ তখন সময় অতিবাহিত করিতেন। "দিবা-রাত্রি তাঁহারা ঈশ্বর-চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন, কঠোর দুরূহ তপস্যা অর্থাৎ প্রাণস্পর্শী তপস্যা এই সময় হইতেই চলিতে লাগিল। ...ফাল্গুন মাসের সকালে একদিন আমি কাশীপুরের বাগানে যাই এবং নিজের চক্ষে তাঁহাদিগের এই কঠোর তপস্যা অনেকটা দেখিয়াছি।"

কালী মহারাজ ও নরেন্দ্রনাথ এই সময়ে জ্ঞানমার্গের 'নেতি নেতি' বিচার করিতেন। শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈত-বেদান্ত মত লইয়া এই সময় উভয়ের মধ্যে অনেক আলোচনা হইত। পাশ্চাত্য দর্শন ও বিজ্ঞান এবং ন্যায়শাস্ত্রে নরেন্দ্রনাথের অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। মহারাজের ক্রমবর্দ্ধমান জ্ঞান-পিপাসা নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে নিয়ত বিচার-বিতর্কে আরও বেশী তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিল। সুযোগ পাইলেই তিনি আবার ডাক্তার সরকারের 'সায়েন্স এসোসিয়েসনে' আসিয়া বিজ্ঞানের পাঠ লইতেন।

ব্রহ্মজ্ঞান লাভসম্বন্ধে বিচারকালে একদিন নরেন্দ্রনাথ বলিলেন যে, ব্রহ্মজ্ঞান ঠিক ঠিক হইলে আর জাতি-বিচার থাকে না। যখন সকলের মধ্যে একই আত্মা বিরাজ করিতেছেন তখন কোনও জাতি পূজ্য, কোনও জাতি হেয় এরূপ হইতে পারে না। সকলেই সমান। হিন্দুদিগের আহারাদি সম্বন্ধে ব্রহ্মজ্ঞানের পরিপন্থী যে সকল সংস্কার আছে সেগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলা উচিত। এই সকল সংস্কার যতদিন মনের মধ্যে বর্ত্তমান থাকিবে ততদিন ঠিক ঠিক ব্রহ্মজ্ঞান হইল না বুঝিতে হইবে। এস, আজ আমরা আহারসম্বন্ধে কুসংস্কার ভাঙ্গিয়া দিব—মুসলমানের স্পৃষ্ট খাদ্য আজ আমরা আহার করিব! তৎক্ষণাৎ কালী মহারাজ, শরৎ, যোগেন, তারক ও নিরঞ্জন নরেন্দ্রের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং মুসলমানের দোকানে যাইয়া কুক্কুট-মাংস আস্বাদন করিলেন।

এইরূপে আহারসম্বন্ধে কুসংস্কার ভাঙ্গিয়া কালী মহারাজ যখন নির্দ্দিষ্ট সময়ে ঠাকুরের সেবা করিবার জন্য উপস্থিত হইলেন, তখন ঠাকুর বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে মহারাজ আহারের কুসংস্কার ভঙ্গ করিবার বিবরণ যথাযথ নিবেদন করিলেন। ঠাকুর শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন—"বেশ করেছিস্।"

ঠাকুর বলিলেন—"বেশ করেছিস্", ইহার অর্থ এরূপ নহে যে, তিনি অবাধ উচ্ছৃঙ্খলতাকেই প্রশ্রয় দিলেন। তিনি

জানিতেন, সত্তোজাগ্রত অগ্নিশিখাতুল্য তাঁহার এই যুবক-ভক্তবৃন্দের মন ঈশ্বর লাভের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াছে। "শোর-গরু খেয়ে যদি কেউ ভগবানে মন রাখে, সে লোক ধন্য" ইহাই ছিল যুগগুরুর মহামন্ত্র। লজ্জা, ঘৃণা, ভয় এই তিন থাকিতে যে ভগবান লাভ হয় না তিনিই তো ইহা ভক্তদিগকে শিখাইয়াছিলেন। সুতরাং সব সমান—সবই এক, এই ধারণা হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া যুবক ভক্তেরা যে কুসংস্কার ভঙ্গ করিয়াছে মাত্র—লোভ পরবশ হইয়া কুক্কুট-মাংস ভোজন করে নাই, বোধ হয় এই কথা মনে করিয়াই তিনি মহারাজকে বলিয়াছিলেন—"বেশ করেছিস্।"

দশম পরিচ্ছেদ

গৈরিক-প্রারণ

কাশীপুরে শ্রীশ্রীঠাকুর দ্বিতলের যে কক্ষে থাকিতেন তাহার পশ্চিমদিকে উত্থানের প্রান্তে একটি পুষ্করিণী আছে। ত্যাগী ভক্তগণ সকলে মিলিয়া সেই পুকুরের চাতালে মধ্যে মধ্যে খোল করতাল লইয়া কীর্ত্তন করিতেন। একদিন গান হইতেছে এমন সময় ঠাকুর লাটু মহারাজকে দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন—'একটু হরিনাম করিতে বল।'

চাতালে গান আরম্ভ হইল—'হরি ব'লে আমার গৌর নাচে।' বাবুরাম মহারাজ এবং মাষ্টার মহাশয় তখন ঠাকুরের নিকটে ছিলেন। নির্দ্দেশ পাইয়া তাঁহারাও চাতালে যাইয়া কীর্ত্তনে যোগ দিলেন।

মৃদঙ্গের ধ্বনিতে এবং হরিনামের রোলে গগন পবন কম্পিত হইতে লাগিল। ভক্তগণ গাহিতে লাগিলেন, নৃত্য করিতে লাগিলেন। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য!

ভজনানন্দ, শাস্ত্রপাঠ এবং ঠাকুরের বদননিঃসৃত অমৃত-মদিরা পান করিতে করিতে এইভাবে মহারাজের দিনগুলি কাশীপুরে কাটিতে লাগিল।

দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালে মহারাজের জ্ঞান, প্রতিভা, তীক্ষ্ণবুদ্ধি সমদৃষ্টি ও তেজস্বীতা, সত্যনিষ্ঠা এবং শাস্ত্রানুরাগের প্রবল স্পৃহা শ্রীশ্রীঠাকুরের স্নেহদৃষ্টি আকর্ষণ করায় মহারাজ তাঁহার "পরম প্রিয় শিষ্য" হইতে পারিয়াছিলেন এবং ঠাকুরও তাঁহাকে মনোমত করিয়া স্বহস্তে গঠন করিয়াছিলেন। মহারাজের তেজস্বীতা সেইদিন আরও প্রকাশিত হইয়া পড়িল যেদিন তিনি ঠাকুরকে কহিলেন, 'ঈশ্বর কি, আগে তাহা আমাকে বুঝাইয়া দিন, তবে আমি মানিব।' ঠাকুর যাঁহাকে আপন "হাতে" গড়িতেছিলেন তাঁহাকে এইরূপ অগ্নিগর্ভ শৈলরূপে দেখিবারই তাঁহার ইচ্ছা ছিল বলিয়া তিনি সানন্দে বলিয়াছিলেন—"তুই সব জান্‌বি, তুই সব মান্‌বি।" মহারাজ ঠাকুরের নিকট সবই বুঝিয়া পাইলেন এবং পোষ-মানা সিংহশাবকের মত অবনত শিরে মানিয়াও লইলেন সব।

স্বর্ণকে যেমন পোড়াইয়া পোড়াইয়া শুদ্ধ করিতে হয়—মনকেও শুদ্ধ করিতে হইলে সেইরূপে পোড়ানোর প্রয়োজন। নতুবা একখানি গৈরিক বসন পরিধান করিলেই মন শুদ্ধ হয় না। কাম, ক্রোধ, হিংসা, দম্ভ, দ্বেষ, অহংকার প্রভৃতি দূর হইলেই বুঝিতে হইবে যে মনের পোড়া শেষ হইয়াছে, মন তখন শুদ্ধ হইয়াছে, বুদ্ধিও তখন 'আমি' 'আমার' ছাড়িয়া শুদ্ধতা প্রাপ্ত হইয়াছে। মহারাজের মন ও বুদ্ধির এই বিশুদ্ধি লক্ষ্য করিয়াই ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন তাঁহাকে অলক্ষিত

ইঙ্গিতে নির্ব্বিকল্প সমাধির অবস্থায় উপনীত করিয়াছিলেন। মহারাজ সেদিন উপলব্ধি করিয়াছিলেন—

একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ
সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।
কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ
সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ॥

কিন্তু মনে হয় শুধু ইহাতেই ঠাকুর তুষ্ট হন নাই; তাঁহার নিজের পঞ্জরাস্থিদ্বারা যে সন্তানকে পরম যত্নে গঠন করিয়া তিনি এতদিন ধরিয়া লালন পালন করিতেছিলেন—স্বামী প্রেমানন্দজীর কথায় যাহাকে—"আপন হাতে ও ছাঁচে" গড়িয়াছিলেন—সেই সন্তানকে আরও বীর্য্যবান করিয়া তুলিবার ইচ্ছাই তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়।

একদিন রাত্রে মহারাজ যখন তাঁহার নির্দ্দিষ্ট সময়ে ঠাকুরের সেবা করিতেছিলেন তখন ঠাকুর সহসা বলিয়া উঠিলেন —"তোর ভ্রূ দুইটি, চক্ষু ও কপাল দেখে শ্রীকৃষ্ণের মুখের উদ্দীপনা হয় ও আমার ভিতর রাধার ভাব জেগে ওঠে কেন বল্ দেখি।"

এই উক্তির কোনও গূঢ়ার্থ না থাকিলে, অন্তর্য্যামী প্রভুর মুখে তাহা বহির্গত হইবার সম্ভাবনা দেখা যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা শুনিয়া মহারাজ বলিলেন—"আপনিই জানেন, আমি তা' কি বল্‌বো!"

ঠাকুর কহিলেন—"তোর ভিতর শ্রীকৃষ্ণের অংশ আছে, তা না হ'লে আমার এ ভাব হ'বে কেন ?"

যে গূঢ়ার্থের কথা কহিলাম, ঠাকুরের এই বাক্যেই তাহা পরিস্ফুট হইয়াছে—'তোর ভিতরে শ্রীকৃষ্ণের অংশ আছে!' কথাটি অত্যন্তই ক্ষুদ্র, কিন্তু উহার অর্থ অত্যন্ত বিরাট!

এইরূপ বাক্যালাপের পর পরম দয়াল প্রভু নিজের রোগ-যাতনাকে অগ্রাহ্য করিয়া শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের অপূর্ব্ব প্রেমতত্ত্ব মহারাজকে শিখাইলেন। বলিয়া দিলেন যে, সেই গুহ্যকথা নরেন্দ্রাদি কাহারও নিকট যেন প্রকাশ করা না হয়।

মহারাজ ক্রমেই বুঝিতে লাগিলেন যে, তাঁহার হৃদয় মণি-মণ্ডিত হইতেছে। সেই অদ্ভুত প্রেমানন্দ, যাহা মানুষকে দেবতা করে, দেবতাকেও যাহা সপ্ত স্বর্গের ঊর্দ্ধে কোনও হীরকমণ্ডিত গোলকধামে লইয়া যায়—মহারাজ সেই প্রেমানন্দে মাতোয়ারা হইয়া উঠিলেন। কিন্তু সে কথা তো তাঁহার প্রকাশ করিবার উপায় ছিল না—

"তোমার আদেশে এ রহস্য
প্রকাশ আমি করিতে নারি।
(It will die with me)"

সেই গোপন রহস্য ছিল শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমতত্ত্বের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। সেই নিগূঢ়তত্ত্ব মানুষ মানুষকে বুঝাইতে পারে না। দেবতাও শুধু তখনই পারেন যখন মানব-শিষ্যে দেবত্ব জাগ্রত

হইয়া উঠে। দেব ভূত্বা দেবং যজেৎ—দেবতা না হইলে সে দেবতত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারে কে? সুতরাং শ্রীরাধাকৃষ্ণের অপূর্ব্ব প্রেমতত্ত্ব শিষ্যকে উপলব্ধি করাইবার কালে ঠাকুর যে তাঁহাকে দেবত্ব দান করিয়া তত্ত্বগ্রহণের জন্য যোগ্য করিয়া লইয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। সেই দেবত্ব দানকেই বলা যাইতে পারে অসাধারণ শক্তি প্রদান।

আবাল্য দেখিতে পাই মহারাজের গীতাভক্তি; উত্তর-কালে দেখি—কি স্বদেশে কি বিদেশে গীতাতত্ত্বের বহুল আলোচনা, গীতার টোল খুলিয়া ইউরোপীয় এবং মার্কিনি ছাত্রদিগকে গীতার আস্বাদ প্রদান, গীতাসম্বন্ধে লণ্ডনে, মার্কিনে, এদেশে ভাষণের পর ভাষণ প্রদান, প্রায় প্রত্যেক ভাষণেই গীতাধর্ম্মের অনুধ্যান, গীতার মর্ম্মকেই জীবনের ধ্রুবতারা রূপে গ্রহণ এবং নিজের জীবনকে সর্ব্বদা গীতাময় করিয়া রাখা—দেখিতে পাই—জীবনকে কর্ম্মময় করিয়া কর্ম্মে তীব্র অনুরক্তি আবার সেই সঙ্গেই কর্ম্মফলে ঘোর অনাসক্তি—আদৌ 'কার্পণ্য-দোষোপহতস্বভাব" তো নহেই, বরং সর্ব্বদাই কণ্ঠে এই নাদ—"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"—এবং "সুখ-দুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ; ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব"—এই নীতির আমরণ অনুসরণ। এই সকল একত্র করিয়া দেখিলে এই কথাই বলিতে হয় যে, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পার্থ-সারথীর দুর্জ্জয় শক্তিকেই মহারাজের অন্তরে জাগ্রত-সচেতন

করিয়া দিয়াছিলেন এবং সেই শক্তির বলেই মহারাজ হইয়াছিলেন দিগ্বিজয়ী। কোনও শত্রু তাঁহাকে কখনও হটাইতে পারে নাই, বাধা তাঁহার কর্ম্মশক্তিকে প্রবল হইতে প্রবলতরই করিয়াছিল।

কথাপ্রসঙ্গে মঠে একদিন রাসযাত্রার প্রসঙ্গ উঠিলে মহারাজ বলিয়াছিলেন যে, একবার তিনি শিলং ভ্রমণ করিতে গেলে একজন ধনাঢ্য মাড়োয়ারী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া যখন শুনিলেন যে, মহারাজ বিলাতে সাহেব-মেমদিগের নিকট গীতা প্রচার করিতেন, তখন একান্ত বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'আপনি সেখানে রাসলীলার কি ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন?'

মহারাজ তৎক্ষণাৎ কহিলেন—'আমার কৃষ্ণ রাসলীলা করেন নাই! তিনি মহাভারতের মহামানব শ্রীকৃষ্ণ, যিনি কুরুক্ষেত্র-সমরে পার্থসারথীরূপে রথ চালনা করিতে করিতে অর্জ্জুনকে গীতার মন্ত্র শুনাইয়াছিলেন। মহারাজের মুখে এইরূপ নানা জ্ঞানগর্ভ ও বীর্য্যসমন্বিত বাক্য যাঁহারা সর্ব্বদা শুনিতেন তাঁহাদিগের এক হস্ত পরিসর বক্ষস্থল নিশ্চয়ই তখন দশ হস্ত হইয়া উঠিত! তিনি বলিতেন যে, অসংখ্য সভায় তিনি অসংখ্য বক্তৃতা করিয়াছেন, লোকশিক্ষার জন্য তাঁহার এদেশের ও পাশ্চাত্যের ক্ল্যাসগুলিতে কত উপদেশ দিয়াছেন; সেই সকল ভাষণের বা উপদেশের কোন-কিছুই তাঁহার নিজের

ছিল না—সবই ছিল শ্রীশ্রীঠাকুরের। ঠাকুর যাহা বলাইতেন, তিনি তাহাই বলিতেন এবং ঠাকুর যাহা করাইতেন, তিনি তাহাই করিতেন। তিনি ছিলেন যন্ত্র এবং ঠাকুর ছিলেন যন্ত্রী। তাঁহার দেহ লইয়া ঠাকুরই সর্ব্বদা লীলা করিতেন এবং তিনিই ছিলেন তাঁহার সর্ব্বশক্তিদাতা পার্থসারথী। মহারাজ এক এক সময়ে আবেগপূর্ণ কণ্ঠে আপন মনে গাহিতেন—

'আমি সামান্য তো নই, রাজপুত্র হই—
পিতার ধনে আমার পূর্ণ অধিকার।'

সত্য সত্যই তিনি ছিলেন রাজাধিরাজের পুত্র।

মহারাজের জীবনী আলোচনা কালে সুবিখ্যাত দর্শনাচার্য্য সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়ের সহিত বলিতে ইচ্ছা হয়—"সর্ব্ববিধ দুঃখ ও দারিদ্র্যের পেষণে হতবীর্য্য জাতির মধ্য হইতে কেমন করিয়া এরূপ অকুতোভয় মহামনীষী পুরুষসিংহের আবির্ভাব সম্ভব হইয়াছে তাহা চিন্তার বিষয়।"

মহারাজ একদিন ঠাকুরের সেবা করিতেছেন এবং তাঁহার শ্রীমুখ হইতে নানা ঈশ্বরীয় কথা শুনিতেছেন, এমন সময় শ্রীশ্রীঠাকুর যেন সহসা বালকবৎ হইয়া গেলেন এবং বালকের ন্যায় সরল কণ্ঠে কহিলেন—'তোকে আমি বুদ্ধিমান্ ব'লে জানি। তুই বল্ দেখি নরেন, বড়, কি আমি বড় ?'

বাস্তবিকই তো ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে অন্যান্য ভক্ত অপেক্ষা অনেক বেশী উচ্চ আসনই দিয়াছিলেন। বলিতেন, 'নরেন

যেন সহস্রদল কমল, আর অন্যে কেহ দশ, কেহ পনেরো, কেহ বা বড় জোর বিশ দল বিশিষ্ট।' কিন্তু তবুও শ্রীশ্রীঠাকুর সর্ব্বদা ভক্তদিগকে পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে চাহিতেন যে, তাঁহাকেই তাহারা তাহাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বাগ্রে কাম্য পরিপূর্ণ আদর্শ ও ইষ্টদেব রূপে লইতেছে কি না। ইষ্টনিষ্ঠা হৃদয়ে জাগ্রত না হইলে যে সাধনাই বৃথা, ঠাকুর ইহা ভক্তদিগকে নানাভাবে উপলব্ধি করাইতেন এবং সেই নিষ্ঠা সত্য সত্যই তাহাদিগের অন্তরে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতেছে কি না সর্ব্বদা পরীক্ষার দ্বারা তাহা বুঝিয়া লইতেন! সেইজন্যই তিনি যখন-তখন যে-কোনও ভক্তকে জিজ্ঞাসা করিতেন—'আমাকে তোর কেমন মনে হয়?'

মহারাজ বলিলেন—'নরেন যদি আপনার চেয়েও বড় হয়, তা'হলে আপনার পায়ে মাথা দিয়ে জ্ঞান ভিক্ষা করবে কেন?'

ঠাকুর উত্তর শুনিয়া প্রসন্ন হইলেন। বলিলেন—'তুই ঠিক বলেছিস্।'

এইরূপ কথোপকথনের সমসাময়িক কালে একদিন অপরাহ্ণে ঠাকুর মহারাজকে বলিলেন—'তোর বাবা আজ এসে বল্‌লে, তোর মা কেঁদে কেঁদে সারা হচ্ছে। কালীকে একবার মার কাছে পাঠিয়ে দিন। আমি বলেছি পাঠাবো। তুই বাড়ী যা। বাড়ী গিয়ে মার কাছে থাক্‌বি!' নরেন্দ্র-নাথকে যেমন ঠাকুর কয়েকদিন বাড়ীতে যাইয়া বাড়ীর ব্যবস্থা

করিয়া আসিতে বলিয়া মনের টান পরীক্ষা করিয়াছিলেন, আজ মহারাজেরও সেই পরীক্ষার দিন আসিল!

মহারাজের ব্রহ্মগ্রন্থি ভিন্ন হইয়া তিনি মনে কতদূর 'একা' হইতে পারিয়াছেন, মনে হয় তাহাই পরীক্ষা করিবার জন্য ঠাকুর মহারাজকে বলিলেন—'তুই বাড়ী যা', বাড়ী গিয়ে মার কাছে থাক্‌বি।'

গুরুর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া মহারাজ তৎক্ষণাৎ কাশীপুর হইতে নীমু গোস্বামীর লেনে নিজ পিত্রালয়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু মনে হইতে লাগিল সংসারী-হাওয়ায় তাঁহার শ্বাসরোধ হইতেছে! তিনি অর্দ্ধ ঘণ্টা মাত্র মাতার নিকটে থাকিয়াই নিরুদ্ধ-নিশ্বাসে কাশীপুরের দিকে ছুটিলেন এবং ঠাকুরের সম্মুখে আসিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলেন।

ঠাকুর কহিলেন—'কি রে? তুই বাড়ী যাস্‌নি।' মহারাজ বিনীত কণ্ঠে কহিলেন—'আজ্ঞা হাঁ, গিয়াছিলাম, কিন্তু থাকিতে পারিলাম না! মনে হইল যেন নরকে পড়িয়াছি। তাই ছুটিয়া পলাইয়াছি।'

ঠাকুর প্রফুল্ল-নয়নে মহারাজের মুখের দিকে চাহিয়া সস্নেহ-কণ্ঠে কহিলেন—'আচ্ছা, বেশ করেছিস্‌। ঠাকুর বুঝিলেন যে, মহারাজ মুক্তির প্রথম-সোপান অতিক্রম করিয়াছেন। তাঁহার ব্রহ্মগ্রন্থি ছিন্ন হইয়াছে।

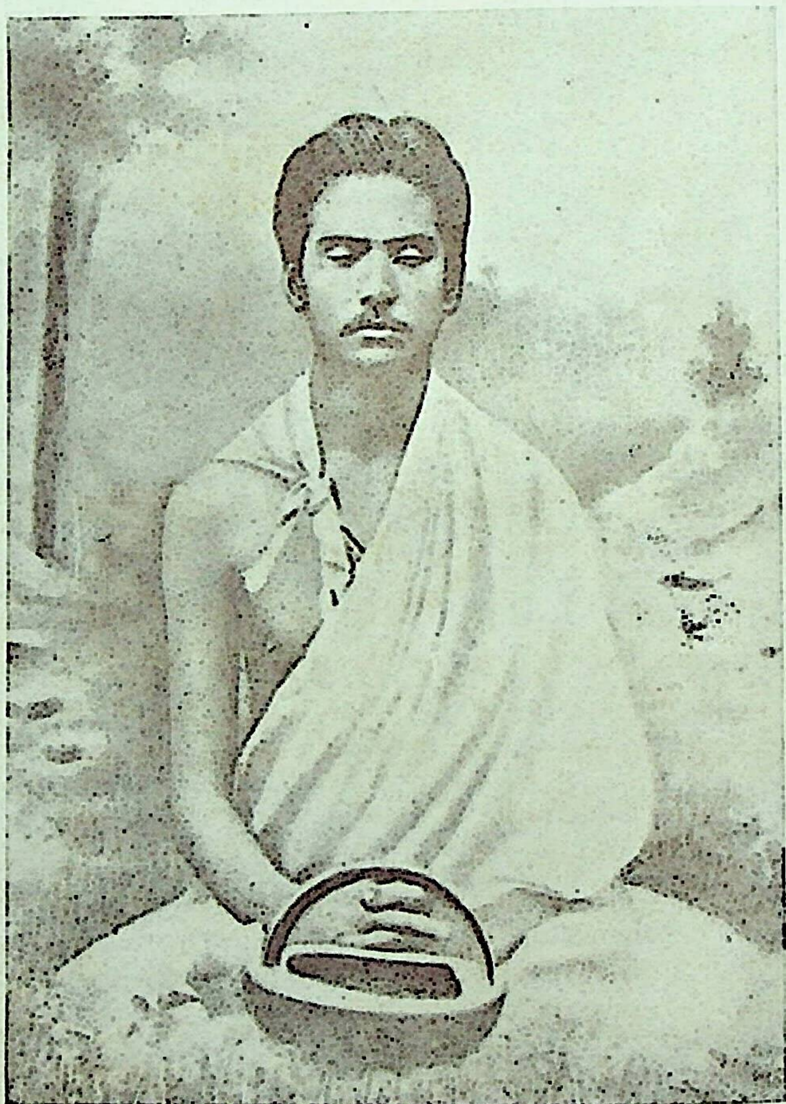
মহারাজ এতক্ষণে স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বাঁচিলেন। বারিহীন স্থানে যেমন মীন থাকিতে পারে না—ভক্তও তেমনি ভগবানকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। গুরুই সেই ভগবান। যখন জ্ঞান হয় যে 'ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব'—তখন সংসার ভাসিয়া যায়, পিতা-মাতার স্নেহ ভালবাসা অন্তরে নিশ্চিহ্ন হয়। যতদিন ঠিক ঠিক সেই অবস্থা না ঘটে, ভগবান লাভ ততদিন সুদূরপরাহতই থাকে। বাহিরে ত্যাগীর লক্ষণ গ্রহণ করিলাম, কিন্তু মনের মধ্যে রহিয়া গেল সংসার ও সম্ভোগ—তাহা ভণ্ডামীরই নামান্তর মাত্র! মহারাজের বৈরাগ্য যে 'মর্কট বৈরাগ্য' নহে, তিনি যে সত্য-সত্যই সর্ব্বত্যাগী' সেদিন তাঁহাকে সেই সুকঠিন পরীক্ষার ভিতর দিয়া যাইতে হইল। তিনি সে পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

মহারাজের গৃহ ছিল, স্নেহময়ী মাতা ছিলেন, পিতার স্নেহ ও ভ্রাতাভগ্নীদিগের ভালবাসা ছিল—কি ছিল না? সবই তো ছিল; কিন্তু তবুও তিনি গৃহে থাকিতে পারিলেন না! ঠাকুরের আদেশে গৃহে গিয়া মাত্র দণ্ডেকের জন্য সকলের সহিত অবস্থান করিতে পারিলেন এবং পরক্ষণেই কাশীপুরে ছুটিয়া আসিলেন! ইহা হইতেই মনে করিতে পারা যায় যে, তিনি তখনই মনে 'একা' হইয়াছিলেন বলিয়াই বিষয়াসক্তি অন্তর হইতে দূরে গিয়াছিল।

মনে এইরূপ 'একা' হইবার জন্যই সাধকের সকল সাধনা।

'মন' যতদিন থাকে ততদিন বনবাসে থাকিলেও একা হইতে পারা যায় না। যতক্ষণ ভগবানকে লাভ করিতে পারা যায় না ততক্ষণ সর্ব্বপ্রকারে একা হইবার উপায় নাই বটে, কিন্তু সকল সময়েই একা হইবার জন্য বিশেষরূপ প্রস্তুতির প্রয়োজন। মহারাজ তখন নিজের অলক্ষিতে সেই প্রস্তুতির পথে অগ্রসর হইয়া সিদ্ধির নিকটবর্ত্তী হইয়াছিলেন বলিয়াই সংসারের প্রতি মমতা একেবারেই কমিয়া গিয়াছিল। সাধকের ভাষায় বলিতে হইলে বলিব যে, মহারাজের যে মন এতদিন বহুত্বের সঙ্কল্প করিয়া সেই বহুর মধ্যেই আনন্দ পাইয়াছিল, মনের সেই গ্রন্থির তখন উচ্ছেদ হইতেছিল। ইহারই নাম ব্রহ্মগ্রন্থিভেদ। সঞ্চিত কর্ম্মের ক্ষয় হইলে সাধকের এই প্রথম সৌভাগ্য ঘটে, মুক্তি পথের একটি প্রধান অন্তরায় দূর হয়। তখনও থাকে আরও দুইটি অত্যন্ত কঠিন অন্তরায়—প্রারব্ধ এবং ভবিষ্যৎ কর্ম্মসংস্কার—উহারাই 'বিষ্ণুগ্রন্থি' এবং 'রুদ্রগ্রন্থি' নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

বিশ্বময় প্রাণসত্ত্বার দর্শন 'বিষ্ণুগ্রন্থিভেদের' লক্ষণ এবং আত্মজ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া বা অপবর্গ লাভ শাস্ত্রে 'রুদ্রগ্রন্থি-ভেদ' বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, বহু কঠোর সাধনা করিলে তবে সাধকের 'বিষ্ণুগ্রন্থি' এবং 'রুদ্রগ্রন্থি' ছিন্ন হয়; তখনই সেই অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হয় যে-অবস্থাকে ভগবান বলিয়াছেন—



কালী তপস্বী (১৮৮৬)

যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥

—(গীতা, ৬৷৩০)

—সর্ব্বভূতেই যিনি আমাকে (ভগবানকে) দেখেন এবং দেখেন যে আমাতেই আবার সর্ব্বভূতই অবস্থিত—আমি কখনও তাঁহার অদৃশ্য হই না, তিনিও কখনই আমার চক্ষের বাহিরে যান না অর্থাৎ, আমিও তাঁহাকে হারাই না, তিনিও আমাকে হারান না।

'চৈতন্যচরিতামৃতে' শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী এই ভাবকেই প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন—"যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে, তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে।" এই কথারই আবার রূপান্তর—"ত্রিভুবন মায়ের মূর্ত্তি।"

ভাগবত শাস্ত্রে দেখিতে পাই জ্ঞান লাভ হইলেই ভক্তি নির্গুণত্ব প্রাপ্ত হয়—অর্থাৎ বিশুদ্ধা ভক্তির উদয় হয়। সাধক তখন আর কেবল 'আত্মারাম' থাকেন না, তিনি ভক্তোত্তম হইয়া উঠেন ও সর্ব্বভূতে বিশ্বেশ্বরকে দর্শন করিয়া তিনি বিশ্ব-প্রেমে পুলকিত হন এবং বিশ্বহিতায় সকল কর্ম্মে নিজেকে নিযুক্ত করেন। তাঁহার সকল কর্ম্মই তখন ভগবৎকর্ম্ম হইয়া উঠে—"work" তখনই সত্য সত্য "worship" হয়। মহারাজের কর্ম্মজীবন আলোচনাকালে দেখিতে পাই যে, এই মহৎ ভাবটিই তাঁহাতে বিশেষরূপে পরিস্ফুট হইয়াছিল। শ্রীভাগবতে

আছে—ভগবান্ কপিলদেব মাতা দেবহুতিকে ভক্তিযোগ কথনকালে বলিয়াছিলেন—

অথ মাং সর্ব্বভূতেষু ভূতাত্মানং কৃতালয়ম্।
অর্হয়েদ্দানমানাভ্যাং মৈত্র্যাভিন্নেন চক্ষুষা॥

—(শ্রীমদ্ভাগবত, ৩।২৯।২৭)

—আমাকে সর্ব্বভূতের (সকলের) 'অন্তর্যামী এবং অভ্যন্তরবর্ত্তী' জানিয়া সেই ভাবেই আমার পূজা করা (মনুষ্যের উচিত)। 'সকলকে সে সমান জ্ঞান করিবে, সকলের সহিত মিত্রতা করিবে এবং পক্ষপাতরহিত হইয়া সাধ্যানুসারে সকলেরই সম্মানরক্ষাপূর্ব্বক অর্চ্চনা করিবে।

ইহাকেই বলা যায় বিশ্বপ্রেম এবং ঈশ্বরের অর্চ্চনা। ভক্তকুলতিলক প্রহ্লাদ দৈত্যদিগকে এইরূপ উপদেশই দিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন—'সমত্বমারাধনমচ্যুতস্য।' অর্থাৎ নিজেকে সকলের সঙ্গে অভেদ দেখাই সমত্বদর্শন এবং সেই সমত্বদর্শনই 'আরাধনমচ্যুতস্য।' এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের একটি কথা মনে পড়িল। তিনি বলিয়াছেন—হিন্দুর ঈশ্বর "সর্ব্বভূতময়। তিনি সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা। কোনও মনুষ্য তাঁহা ছাড়া নাই। মনুষ্যকে না ভালবাসিলে তাঁহাকে ভালবাসা হইল না। যতক্ষণ না বুঝিতে পারিব যে, সকল জগৎই আমি, সর্ব্বলোকে আমাতে অভেদ, ততক্ষণ আমার জ্ঞান হয় নাই, ভক্তি হয় নাই, প্রীতি হয় নাই। অতএব

জাগতিক প্রীতি হিন্দুধর্ম্মের মূলেই আছে। অচ্ছেদ্য, অভিন্ন, জাগতিক প্রীতি ভিন্ন হিন্দুত্ব নাই। মনুষ্য-প্রীতি ভিন্ন ঈশ্বর-প্রীতি নাই।" মহারাজ গুরুকৃপায় এবং নিজের কঠোর সাধনশক্তিবলে কিরূপে হিন্দুত্বের এই বিরাট আদর্শটিকে, নিজের সকল কর্ম্ম ও চিন্তায় জীবন্ত করিতে পারিয়াছিলেন তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পূর্ব্বেও পাইয়াছি এবং পরে আরও পাইব।

আমরা বলিয়া থাকি, ভগবান্ অত্যন্ত দুর্ল্লভ। কিন্তু তিনি তো সত্যই তাহা নহেন। তিনি অতিশয় সুলভ; শুধু তাঁহার নিকটেই তিনি সুলভ, যিনি মহারাজের ন্যায় প্রাণ দিয়া তাঁহাকে চাহেন—আমাদের মত শুধু মুখের কথায় চাহেন না। মহারাজকে সর্ব্বদাই বলিতে শুনা গিয়াছে যে, ভগবান্ লাভ অত্যন্তই সহজসাধ্য ব্যাপার। তাঁহাকে ডাকিবার জন্য পুষ্প বিল্বপত্রের প্রয়োজন নাই, পঞ্চ আবাহন মুদ্রারও প্রয়োজন নাই, দেব ভাষায় বিরচিত আবাহন-মন্ত্র বা স্তব-স্তুতিরও প্রয়োজন নাই। প্রাণের চন্দনে সিক্ত আপন আপন মাতৃভাষায় আহ্বান করিলেই, সে ডাক তাঁহার রত্নবেদীর মূলে যাইয়া পৌঁছে। মহারাজ নিজে ছিলেন সেইরূপ একজন সাধক যাঁহার প্রাণ নিরন্তর ভগবানকে চাহিত।

উপনিষদে একটি বাক্য আছে—'মনোব্রহ্ম ইত্যুপাসীত'

—মনকেই ব্রহ্মরূপে উপাসনা কর। তেত্রিশকোটী দেব-দেবীর পূজামণ্ডপে মনকে আর একটি দেবতারূপে স্থাপন করা এই মন্ত্রের উদ্দেশ্য নহে, কারণ দেবতা একটিই—তেত্রিশ কোটী তাঁহার লীলার দেহ মাত্র। মনস্তত্ত্বের আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, এই জগৎই মন অর্থাৎ মনের ভাব। সুতরাং জগতের প্রত্যেক পদার্থে ব্রহ্মদর্শন করিতে অভ্যস্ত হইলেই মনকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করা হয়। মহারাজও সাধনবলে এই ভাবেই ব্রহ্মদর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অধ্যবসায় সহকারে অভ্যাসযোগে সুসিদ্ধ হইতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই মহারাজ ব্রহ্মদর্শনে নিজেকে নিত্য প্রতিষ্ঠিত রাখিতে পারিয়াছিলেন।

একদিন বৈকালে মহারাজ ঠাকুরকে ব্যজন করিতেছেন, এমন সময় কে-যেন-একজন নীচের বাগানের তৃণময় চত্বরের উপর দিয়া নবীন তৃণগুলিকে দলিয়া দলিয়া চলিয়া বেড়াইতেছিল। ঠাকুর অত্যন্ত কাতর হইয়া উঠিলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল লোকটি যেন তাঁহারই বুকের উপর দিয়া হাটিতেছে। তিনি এমনি করিয়াই জগতের চেতন অচেতন স্থাবর জঙ্গম—কীটপতঙ্গ প্রভৃতি সকলের মধ্যে নিজেকে ঢালিয়া দিয়াছিলেন। তিনি কাতরকণ্ঠে মহারাজকে বলিলেন—'বারণ কর্' ওকে—ওখানে চল্‌তে বারণ কর্। আমার বুকে বড় লাগ্‌ছে।'

মহারাজ বিমুগ্ধ-বিস্ময়ে জানালার নিকট গিয়া নিম্নের পাদচারীকে ঘাসের উপর দিয়া চলিতে নিষেধ করিলেন। তিনি সেদিন এই দৃশ্য দেখিয়া সম্যক্ বুঝিতে পারিলেন, প্রকৃত অদ্বৈতজ্ঞানটি কি! পরিদৃশ্যমান এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সেই এক সৎ বস্তুরই বিবিধ আকার মাত্র—আমরা পৃথক্ করিয়া দেখি বলিয়াই সেগুলিকে ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া মনে হয়—'পৃথকত্বেন বিশেষদর্শনম্'—কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সবই এক; মহারাজ এতদিন ধ্যানে উহা জানিয়াছিলেন, আজ স্বচক্ষে তাহা দেখিলেন। জ্ঞাননেত্র সম্পূর্ণরূপে উন্মিলিত হইয়া গেল—'সমত্বমারাধনমচ্যুতস্য' যে কি, তাহা প্রাণে প্রাণে বুঝিয়া তিনি জীবনের নিরন্তর অবলম্বনরূপে গ্রহণ করিলেন।

ঠাকুর যখন দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন তখন একদিন প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সহিত এক পাগলিনী তথায় আসিয়াছিল। সে মধ্যে মধ্যেই আসিত এবং অতিশয় করুণ-কণ্ঠে এমন করিয়া গান গাহিত যে ঠাকুর যেন শুনিতে পান। সে শুধু ঠাকুরকেই দেখিতে আসিত—কিছুতেই অন্যত্র যাইতে চাহিত না। তাহার কণ্ঠে মধুমাখা মাতৃনাম শুনিতে শুনিতে ঠাকুর এক একদিন ভাবে বিভোর হইয়া যাইতেন। ঠাকুর যখন কাশীপুরে আসিলেন, পাগলিনী সন্ধান করিয়া সেইখানেও আসিতে লাগিল। ঠাকুরের সহিত সে মধুরভাবের সম্পর্ক পাতিয়াছিল। বাগানে আসিলেই পাগলিনী একদৌড়ে

ঠাকুরের ঘরে যাইতে চেষ্টা করিত এবং বাধা পাইলেই কাঁদিতে আরম্ভ করিত—প্রহার করিলেও সে নড়িত না।

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে' দেখিতে পাই—সেদিন ছিল ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১লা বৈশাখ। ঠাকুর ভক্তদিগের সঙ্গে উপরের কক্ষে বসিয়া আছেন। পাগলিনীর সম্বন্ধে কথা উঠিলে শশী মহারাজ বলিলেন—

"পাগ্‌লী এবার এলে ধাক্কা মেরে তাড়াবো।"

ঠাকুর করুণাপূর্ণ কণ্ঠে কহিলেন—"না না—আস্‌বে, চ'লে যাবে।"

রাখাল। আগে আগে অপর পাঁচজন ওঁর কাছে এলে আমার হিংসা হ'ত। তারপর উনি কৃপা ক'রে আমায় জানিয়ে দিয়েছেন—মদ্‌গুরু শ্রীজগদ্‌গুরু। উনি কি কেবল আমাদের জন্যেই এসেছেন?

শশী। তা' নয় বটে,—কিন্তু অসুখের সময় কেন? আর ও-রকম উপদ্রব!

রাখাল। উপদ্রব সব্বাই করে। সকলেই কি খাঁটি হ'য়ে ওঁর কাছে এসেছে? ওঁকে আমরা কষ্ট দি-ই নাই? নরেন্দ্র-টরেন্দ্র আগে কি রকম ছিল, কত তর্ক করত!

শশী। নরেন্দ্র যা' মুখে বল্‌তো, কাজেও তা' করত।

রাখাল। ডাক্তার সরকার কত কি ওঁকে বলেছে। ধরতে গেলে কেউ-ই নির্দ্দোষ নয়!

একদিন উদ্যান-বাটিকার দিকে দিকে একটি বেদনা-মাখা সুর কাঁদিয়া উঠিল—

একবার এসো মা এসো মা
ও হৃদয়রমা।
পরাণ পুতলী গো।
আছি জন্মাবধি তোর মুখ চেয়ে
জানগো জননী
যে যাতনা সয়ে,—
(আমার) হৃদয়কমল বিকাশ করিয়ে
প্রকাশো তাহে
আনন্দময়ী গো।

কাশীপুরের উদ্যান-বাটিকা এই গানের সুরে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল। কি সে গান, আর কিইবা সেই সুর। নিষ্পেষিত দ্রাক্ষা হইতে যেমন রসের বিন্দু ঝরিয়া ঝরিয়া পড়ে,—প্রাণের পেষণী-মধ্যে নিষ্পিষ্ট মর্ম্মন্তুদ্ বেদনায় কাতর মানব হৃদয়ের ইহা কি সেইরূপ একটি রুধিরধারা—দিগ্‌দিগন্ত কাঁদাইয়া সেদিন কাশীপুরে নির্ঝরের মত ঝরিয়া পড়িতেছিল !

ঠাকুর ভাবে মুগ্ধ হইলেন, বাহ্য হারাইলেন। গান কাঁদিয়া কাঁদিয়া ক্রমেই উর্দ্ধে উঠিয়া হল্‌ঘরের দিকে আসিতে লাগিল—

আছি জন্মাবধি তোর মুখ চেয়ে
এসো মা এসো মা—

গান শুনিয়া সমাধি হইলে পাছে ঠাকুরের পীড়া বৃদ্ধি পায় এই আশঙ্কায় ভক্তদিগের মধ্যে কেহ পাগলিনীকে উপরে উঠিতে দিল না, তাড়াইয়া লইয়া ফটকের বাহিরে রাখিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। কিন্তু পাগলিনী দ্বারপ্রান্ত ছাড়িল না। পথের উপর বসিয়া রহিল। বসিয়া বসিয়া হৃদয়ের শোণিত ঢালিয়া তাহার প্রাণের গানে সুর লাগাইতে লাগিল—

একবার এসো মা এসো মা
ও হৃদয় রমা—

ওই গানের তরঙ্গ গঙ্গার তরঙ্গের মত লহরে লহরে ভাসিয়া আসিয়া ঠাকুরের কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল। ঠাকুরের আদেশ লইয়া মহারাজ পাগলিনীর হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে উহাকে কাশীপুর থানায় লইয়া গেলেন। পুলিশ পাগলিনীকে ধম্‌কাইয়া ও ভয় দেখাইয়া বিদায় করিল।

কিছুক্ষণ পর পাগলিনী আবার বাগানে প্রবেশ করিয়া গাহিতে লাগিল—

মা মা ব'লে আর ডাকিব না—
(তারা) দিয়েছ দিতেছ কতই যাতনা,
ছিলাম গৃহবাসী।
করিলি সন্ন্যাসী।
আর কি ক্ষমতা রাখিস্ এলোকেশী।

(না হয়) দ্বারে দ্বারে যাবো,
ভিক্ষা মেগে খাবো,—
মা বলে ত আর কোলে যাব না।

আবার—আবার সেই সুর! পাগলিনী এমন সুর কোথায় পাইল? কে এই সুরটিকে যুগ যুগ ধরিয়া নয়নজলে ধুইয়া পঙ্কহীন অমলিন করিয়া দিল? গান শুনিয়া ঠাকুর আবার ভাবাবিষ্ট হইলেন, ভক্তদিগের চক্ষুও জলে ভরিয়া উঠিল। পাগলিনী গাহিতেছিল—পূর্ণ অকম্পিত এবং গ্রামের পর গ্রাম উচ্চে কণ্ঠ তুলিয়া পাগলিনী গাহিতেছিল—

মা মা ব'লে আর ডাকিব না—
(তারা) দিয়েছ দিতেছ কতই যাতনা—

তখন ভক্ত নিরঞ্জন—

তাড়া করে লাঠি হাতে নিত্য নিরঞ্জন।
... ...
চরণ ছুঁাদিয়া তাঁর কালো-পাগলিনী,
কাকুতি মিনতি করে—লুটায় অবনী।
কোন মতে নিরঞ্জন নাহি দেন যেতে।
বরঞ্চ প্রহার করে ধরিয়া ঝুঁটিতে॥ (১)

পাগলিনী যখন প্রহারের পরও নড়িল না তখন নিরঞ্জন তাঁহাকে একটি ঘরে কিছুক্ষণের জন্য বদ্ধ করিয়া রাখিলেন।

(১) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি—শ্রীঅক্ষয় কুমার সেন। (দ্বিতীয় সংস্করণ—৩০৯ পৃষ্ঠা)

ঘরের দ্বার খুলিতেই সে আবার চকিত হরিণীর মত হল্‌-ঘরের দিকে ছুটিল। নিরঞ্জন তখন একখানি কাঁচি আনিয়া পাগলিনীর দীর্ঘ কেশগুচ্ছ কাটিয়া দিলেন। পাগলিনী সেই যে চলিয়া গেল, আর আসে নাই।

পাগলিনী চলিয়া গেল বটে, কিন্তু তাহার গান

মা মা বলে আর ডাকিব না,
(তারা) দিয়েছ দিতেছ কতই যাতনা—

মহারাজের হৃদয়ে এমন ভাবেই মুদ্রিত করিয়া দিয়া গেল যে বহু বর্ষ অতীত হইলে পরও মহারাজকে নির্জ্জনে বসিয়া এই গানটি গুন্‌ গুন্‌ করিয়া গাহিতে শুনা গিয়াছে। শুনিতে পাওয়া যায়, এই পাগলিনীকে লক্ষ্য করিয়াই নাট্য সম্রাট্‌ গিরিশচন্দ্র তাঁহার "বিল্বমঙ্গল" নাটকে পাগলিনীর চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন।

ক্রমে পৌষ-সংক্রান্তি নিকটবর্ত্তী হইল, গঙ্গাসাগরে পুণ্যস্নানের দিন সমাগত দেখিয়া সিঁতির গোপাল দাদা, যিনি পরে স্বামী অদ্বৈতানন্দ নামে প্রখ্যাত হইয়াছিলেন, গঙ্গাসাগরযাত্রী কয়েকজন সাধুকে নববস্ত্র দান করিবার জন্য দ্বাদশখানি বস্ত্র আনিয়া গিরিমাটি দিয়া রঞ্জিত করিলেন। প্রতিবৎসরই সাধুদিগকে তিনি এই উপলক্ষ্যে বস্ত্র দান করিতেন।

গেরুয়া কাপড়ের কথা শুনিয়া ঠাকুর গোপাল দাদাকে

বলিলেন যে ত্যাগী ভক্তদিগকে বস্ত্র দান করিলেই বেশী ফল হইবে।

ভক্ত গোপাল দাদা দ্বাদশখানি বস্ত্র ও দ্বাদশটী রুদ্রাক্ষের মালা ঠাকুরের পদতলে রাখিয়া প্রণাম করিলেন।

বস্ত্র ও মালাগুলি স্পর্শ করিয়া ঠাকুর মন্ত্রপুতঃ করিলেন এবং গোপাল-দাদাকে দিয়া বলিলেন—'ছেলেদের প্রত্যেককে দাও—আর তুমি নাও।'

গৈরিক বস্ত্র পরিধান করিয়া এবং রুদ্রাক্ষের মালা কণ্ঠে ধারণ করিয়া ভক্তগণ যখন আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন তখন মনে হইল যেন কয়েকটি বালসূর্য্য আসিয়া উদিত হইলেন। ঠাকুর পরম পুলকিত হইয়া তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। অবশিষ্ট বস্ত্রখানি বীর ভক্ত গিরিশ চন্দ্রের জন্য রহিল। গিরিশচন্দ্র পরে উহা পাইয়া শ্রদ্ধাবনত হৃদয়ে মস্তকে বাঁধিয়াছিলেন। যাহা হউক অন্তরঙ্গ ভক্ত-গণের মনের সন্ন্যাস পূর্ব্বেই হইয়াছিল, সেদিন হইল বাহিরের সন্ন্যাস। উত্তরকালে মহারাজ বলিতেন যে, গৈরিক বস্ত্র জ্ঞানাগ্নির প্রতীক মাত্র। সুতরাং সেদিন গৈরিক বসন পরিয়া তাঁহারা জ্ঞানাগ্নির দ্বারা সমাচ্ছাদিত হইয়াছিলেন। ত্যাগী সন্তানগণ যেদিন গৈরিক বস্ত্র পরিধান করিয়া ঠাকুরের আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছিলেন, সে দিনটি ছিল শুধু বাঙ্গালার নহে, শুধু ভারতেরও নহে, বৃহত্তর ভারতের এবং তাহারও

পারে নানা দেশ মহাদেশের একটি শুভ দিন। সেই শুভ-দিনে জ্ঞানাগ্নির প্রতীক গৈরিকে মণ্ডিত এই তাপসবৃন্দের হৃদয়ে সকলের অলক্ষ্যে ঠাকুর যে পবিত্র হোমকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত করিয়াছিলেন, কিছুকাল পরই তাহার দক্ষিণাবর্ত্ত শিখাগুলির স্পর্শে ধর্ম্মের নামে বিদ্যমান দ্বন্দ্ব ও বিদ্বেষের আবর্জ্জনাগুলি ভস্মসাৎ হইতে আরম্ভ হয় এবং বৈদান্তিক পাঞ্চজন্যের মঙ্গল-নিনাদে সংবর্দ্ধিত হইয়া ভারতের সংস্কৃতির বিজয়-বৈজয়ন্তী দিকে দিকে প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে। লোকে তখন বিস্ময়-বিমুগ্ধ চিত্তে শুনিয়াছিল এবং অনেকে সুতীব্র উপলব্ধির দ্বারা প্রবুদ্ধ হইয়া আপন আপন জীবনের দীক্ষামন্ত্ররূপে গ্রহণ করিতেও আরম্ভ করে—যত মত তত পথ।

অন্ধকার ভেদ করিয়া মহাসাম্যের এই প্রাণময় মন্ত্রের দ্যুতি এখন দিকে দিকে প্রসৃত হইতেছে। এমন এক দিন আসিবে যেদিন বিবদমান মানব সর্ব্বসমন্বয়কেই একমাত্র সত্য তত্ত্বরূপে গ্রহণ করিয়া পরম শান্তি লাভ করিবে। ঝটিকাতাড়িত তমিস্র রজনীর শেষে তাহাকে একদিন চোখের জলে বুঝিতেই হইবে যে ঐহিক ও পারত্রিক সকল প্রকার সুখ ও সম্পদ আছে শুধু সমন্বয় সাধনে। বিমানচারী মৃত্যুবর্ষী পোতের গর্ভে সে সুখের সন্ধান মিলিবে না, মিলিবে না তাহা সাগরতল-চারী গুপ্ত দৈত্যের মারণাস্ত্রপূর্ণ কুক্ষির মধ্যে,—মিলিবে না তাহা পরস্বাপহরণে বা দুর্ব্বল পরজাতি

নিপীড়নে—মিলিবে না তাহা স্বৈরাচারী হিংস্র দৈত্যের মত মুক্ত হস্তে ধ্বংস ও মৃত্যুর বিতরণে। মানুষ যেদিন স্বার্থশূন্য শ্রদ্ধা পরিসিঞ্চিত পবিত্র হৃদয়ে বহুকে মিলাইয়া এককেই দেখিতে পাইবে, সেই শুভদিনের আবাহন-সঙ্গীত সেদিন কাশীপুরে উদ্গীত হইয়াছিল, বাঙ্গালার এই নবীন সন্ন্যাসি-দিগের কণ্ঠে কণ্ঠে। তাঁহারা কেহই আর এখন নশ্বরদেহে পৃথিবীতে নাই বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের গানের সুর ঐ এখনও ভাসিয়া ভাসিয়া বাসন্তীকুসুমের সৌরভের মতই দিক্‌দিগন্তে বিস্তৃত হইতেছে। মৃত্যুঞ্জয়ী তাঁহারাও সেই গানের সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য করিয়া ফিরিতেছেন, যেমন তাঁহারা ঠাকুরকে বেড়িয়া বেড়িয়া সঙ্কীর্ত্তনের অঙ্গনে অঙ্গনে ফিরিতেন।

গৈরিকবস্ত্র দানের কয়েকদিন পর ঠাকুর একদিন এই সকল যুবক-সন্ন্যাসীদিগকে বলিলেন—তোরা আমাকে অন্যত্র নিয়ে চল্। যেখানে নিয়ে যাবি আমি সেখানেই যাবো।'

এইরূপ বলিবার কারণ ছিল। ঠাকুর শ্যামপুকুরে এবং পরে কাশীপুরে আসিলে কয়েকজন গৃহীভক্ত (বলরাম বসু, সুরেশ মিত্র প্রভৃতি) তাঁহার চিকিৎসার এবং তদানুসঙ্গিক সমুদয় ব্যয় ভার বহন করিতেন। সেবকদিগের আহারাদির ব্যয়ও তাঁহারাই দিতেন। ক্রমেই সেবক সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে

লাগিল এবং ব্যয়ও বাড়িয়া চলিল। রাম, কালীপদ এবং সুরেন্দ্র বলিলেন—

"করিতেছ অপব্যয় শোভা নাহি পায়
হিসাব রাখিতে হবে তুলিয়া খাতায়। (২)

তাঁহারা আরও বলিলেন যে সেবকসংখ্যা হ্রাস না করিলে ব্যয় কমিবে না। ঠাকুরের সেবার জন্য এত লোকের প্রয়োজন নাই। যে যাহার মত বাড়ী যাউক,—শুধু দুই জন থাকিলেই সেবা চলিবে। ছুট্‌কো-গোপাল হিসাব রাখিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু একদিন হিসাব পরীক্ষার সময় ভুল পাওয়া গেল! তাহা লইয়া তখন গৃহী ও ত্যাগী ভক্তদিগের মধ্যে তুমুল গণ্ডগোল বাঁধিয়া উঠিল। সে দ্বন্দ্ব-কোলাহল উপর হইতে ঠাকুর শুনিতে পাইলেন। ত্যাগী-ভক্তগণ কহিলেন, গৃহীদিগকে আর ঠাকুরের নিকটে যাইতে দেওয়া হইবে না!

যুক্তিমত পরদিন নিত্যনিরঞ্জন।
বসিলেন দ্বারদেশ রক্ষার কারণ॥ (৩)

ইহার ফলে রাম, সুরেন্দ্র, গিরিশচন্দ্রের ভ্রাতা অতুল প্রভৃতি অনেকেই কয়েকদিন আর ঠাকুরের নিকট যাইতে

---

(২) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি—শ্রীঅক্ষয় কুমার সেন। (দ্বিতীয় সংস্করণ—উদ্বোধন,) ৬১১ পৃষ্ঠা।

(৩) ঐ

পারিলেন না। ত্যাগী এবং গৃহী-ভক্তদিগের মধ্যে বিবাদ বাঁধিয়া গেল। ঠাকুর বিরক্ত হইলেন এবং ত্যাগী ভক্তদিগকে বলিলেন যে মাধুকরী করিয়া তাঁহার জন্য অন্নসংস্থান করিতে হইবে। গৃহস্থের অন্ন—চাঁদার অন্ন আর খাইবার তাঁহার ইচ্ছা নাই। ভিক্ষার অন্ন শুদ্ধ, তিনি তাহাই আহার করিতে ইচ্ছা করিলেন।

আপাতদৃষ্টিতে দেখিলে মনে হয় যে, ত্যাগী ও গৃহী-ভক্তদিগের মধ্যে বিবাদের কারণেই ঠাকুর ত্যাগীদিগকে মাধুকরী করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, ঠাকুর নিজের অন্নসংস্থানের জন্য এরূপ আদেশ দেন নাই। উহা দেওয়া হইয়াছিল যুবক ভক্তদিগেরই কল্যাণ সাধনের জন্য। অন্তরঙ্গ ভক্তদিগকে মাধুকরী করিতে অভ্যস্ত করাইবার একটি উপলক্ষ্যস্বরূপ ত্যাগী ও গৃহী-ভক্তদিগের মধ্যে সাময়িক একটি বিবাদের সৃষ্টি হয়ত লীলাময় ঠাকুরের ইচ্ছায় সংঘটিত হইয়াছিল। আত্মাভিমান দূর করিয়া দিয়া ভক্তের কল্যাণ সাধনের জন্যই ভগবান্ শ্রীচৈতন্য একদিন তাঁহার লক্ষপতি ভক্ত শিষ্য গোস্বামী রঘুনাথকে দিয়া নীলাচলে ভিক্ষা করাইয়াছিলেন! শুধু ভিক্ষা নহে—শেষে তাহাও ছাড়িয়া দিয়া পর্য্যুসিত বলিয়া পরিত্যক্ত গাভিকুলেরও অখাদ্য অন্ন সিংহদ্বারের পার্শ্ব হইতে কুড়াইয়া আনিয়া ধুইয়া ভোজনের ব্যবস্থা করাইয়াছিলেন।

এবং পরমান্ন জ্ঞানে ভক্তের পাত্র হইতে সেই অন্ন তুলিয়া লইয়া নিজেও মুখে দিয়াছিলেন।

মাগ্‌নেসে ছোটা হো যাতা হ্যায়—এই কথাই সর্ব্বত্র প্রচলিত। ইহাই আত্মাভিমান। কিন্তু দীন না হইলে, ছোট না হইলে ত দীননাথকে পাওয়া যায় না। কবি রজনীকান্ত গাহিয়াছেন—

আমায় সকল রকমে কাঙ্গাল করেছে গর্ব্ব করিতে চূর।
যশঃ ও অর্থ, মান ও স্বাস্থ্য সকলি কবেছে দূর॥

মানের অহঙ্কার, ধনের অহঙ্কার, বিদ্যার অহঙ্কার—যশ, প্রতিপত্তি, প্রতিষ্ঠা, আভিজাত্য প্রভৃতির অহঙ্কার জীর্ণ করিয়া ফেলিতে বহু শক্তির প্রয়োজন। যে-শক্তি থাকিলে এই অহঙ্কাররূপ একান্ত দুষ্পাচ্য বস্তুটিকে একেবারে জীর্ণ করিতে পারা যায়, পরের দ্বারে ভিক্ষার ঝুলি লইয়া দণ্ডায়মান হওয়া সেই শক্তিলাভের একটি প্রধান উপায়। ঠাকুরের ত্যাগী-ভক্তগণ ছিলেন সকলেই উচ্চশিক্ষিত এবং উচ্চবংশের সন্তান। তাঁহাদিগের আভিজাত্য গৌরব ছিল কম নয়। আঢ্যবংশের বংশধর ছিলেন তাঁহারা, সুতরাং কিরূপে ভিক্ষা করিতে হয় তাহা তাঁহাদিগের কল্পনাতেই কখন আসে নাই! বরং তাঁহারা ইহাই জানিতেন যে, 'মাগ্‌নেসে ছোটা হো যাতা হ্যায়!' ঠাকুর তাই উপলক্ষ্য করিলেন যে গৃহীর অন্ন আর খাইবেন না, ভিক্ষান্ন গ্রহণ করিবেন। তিনি প্রিয় ভক্তদিগকে

ভিক্ষায় বাহির করিয়া দিলেন। ঠাকুরই তো ছিলেন এই ভক্ত-দিগের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—তিনিই তো ছিলেন ইঁহাদের মাতা, পিতা, বন্ধু ও সখা—তিনিই তো ছিলেন সকলের বিদ্যা, বিত্ত এবং গৌরব। সুতরাং সেই ঠাকুর যখন বলিলেন যে ভিক্ষান্নেই তাঁহার তৃপ্তি, গৃহীর অন্নে অতৃপ্তি—ত্যাগীভক্তগণ তৎক্ষণাৎ ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে তুলিলেন। মনে কোনরূপ সংশয় রহিল না—কারণ তাঁহাদিগের জীবন ছিল গুরুময়।

তাঁহারা পণ করিলেন, দূর হউক মান, সম্ভ্রম, আভিজাত্য-গৌরব—দূর হউক কলেজি-শিক্ষা, বিশ্ববিদ্যালয়ের মুদ্রা—দূর হউক জন্মজন্মার্জ্জিত মর্যাদার ভাতি—দূর হউক সব! ঠাকুরের যাহাতে তৃপ্তি হয় তাহাই করিতে হইবে। কালীমহারাজ ও নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি চারিজন ভক্ত প্রথম দিন ভিক্ষায় বাহির হইলেন এবং সর্ব্বপ্রথমেই শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর নিকটে যাইয়া ভিক্ষা চাহিলেন। তাঁহার নিকট প্রথম ভিক্ষা লইয়া যখন তাঁহারা রাজপথের পার্শ্ববর্ত্তী গৃহীদিগের দ্বারে যাইয়া দাঁড়াইলেন তখন তাঁহাদিগের সবল ও সমর্থ দেহ এবং অল্প বয়স দেখিয়া অনেকেই গালি দিয়া তাড়াইয়া দিল! তাহারা রূঢ় কণ্ঠে কহিল—'খেটে খেতে পার না, ভিক্ষা করতে এসেছ!' কেহবা বলিল, 'ইহারা চোর—ডাকাতের গোয়েন্দা ইহারা, সন্ধান লইতে আসিয়াছে। কেহ বা বলিল—'ইহারা নিশ্চয় গুণ্ডার দল, দে, তাড়াইয়া দে।'

১৯

নবীন ভিখারীর দল নীরবে সকলই সহিলেন, কারণ ঠাকুর যে তখন সেই ভিক্ষান্নের জন্যই অপেক্ষা করিয়া পথ চাহিয়া বসিয়া ছিলেন !

সেদিনের ভিক্ষায় যাহা পাওয়া গেল—সেই তণ্ডুল, আলু, কাঁচকলা প্রভৃতি, তাহাই আনিয়া যখন তাঁহারা ঠাকুরের পদপ্রান্তে রাখিলেন, তখন ঠাকুরের আনন্দ আর ধরে না। মহারাজ বলিয়াছেন যে, মাতাঠাকুরাণী সেই অন্নের মণ্ড প্রস্তুত করিয়া ঠাকুরের সম্মুখে আনিলে পর তিনি কিঞ্চিৎ ভোজন করিলেন এবং পরমানন্দে প্রসাদ পাইলেন ঠাকুরের ত্যাগী ভক্তগণ।

———

একাদশ পরিচ্ছেদ

হঠযোগী ও বুদ্ধগয়া

কৈশোরে কালী মহারাজ ভূকৈলাশের এক হঠ-যোগীর কাহিনী শুনিয়া যোগশিক্ষা করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন, সে কথা পূর্ব্বে একবার বলা হইয়াছে। শেষে যোগীগুরুর সন্ধান করিতে করিতে দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া তিনি যোগী-সম্রাটের দর্শনলাভ করিয়া কৃতার্থ হইলেন। সাধু সঙ্গে তিনি 'সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী' হইতে শিখিলেন, 'অনিকেত' হইলেন এবং শেষে রাজর্ষি জনকের ন্যায়ই বলিতে পারিতেন—'মিথিলায়াং প্রদীপ্তায়াং ন মে দহ্যতি কিঞ্চন' শ্রীগীতায় যাহাকে 'ধর্ম্মামৃত' বলা হইয়াছে, ঠাকুরের কৃপায় তিনি ক্রমে ক্রমে তাহাই লাভ করিয়া নিজেই অমৃত হইয়াছিলেন। তাঁহার আত্মশক্তি ক্রমে নানা ভাবে স্ফুরিত হইতে লাগিল। ইহারই নাম ভগবৎ কৃপালাভ। সেই কৃপা নিজের চেষ্টা দ্বারাই লাভ করিতে হয়। সে চেষ্টার জন্য যে পুরুষকার চাই, ভগবৎসঙ্গ তাঁহাকে তাহাই প্রচুর পরিমাণে আনিয়া দিয়াছিল। তিনি মনেপ্রাণে উপলব্ধি করিলেন যে—

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥
—(গীতা, ৬।৫)

শ্রীশ্রীঠাকুরের কথায় বলিতে হয়, আমাদের মধ্যে দুইটি 'আমি আছে'—একটি 'আমি' কাঁচা, বদ্ধ, অহংকারী—প্রকৃতির দাস। আর একটি 'আমি' পাকা, শুদ্ধ, বুদ্ধ, স্বতন্ত্র। এই পাকা 'আমির' দ্বারায় 'কাঁচা' আমিকে উদ্ধার করিতে হইবে। ইহা জ্ঞানমার্গের কথা। ভক্তিমার্গের কথা—

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥
—(গীতা, ১৮।৬১)

ভগবান অন্তর্যামি। তিনি সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকিয়া, যন্ত্র যেরূপ পুত্তলিকাকে চালিত করে, তেমনি মায়ার দ্বারা সকলকে পরিচালিত করিতেছেন। সুতরাং তাঁহার শরণ লইলেই মুক্তিলাভ ঘটে। ইহাকেই বলে কৃপাবাদ। কৃপাবাদ বলিলে নিশ্চেষ্টতা বুঝা যায় না—কারণ সাধক সাধনা করিয়া শ্রান্ত না হওয়া পর্য্যন্ত দেবতার কৃপা পাইতে পারে না—'ন ঋতে শ্রান্তস্য সখ্যায় দেবাঃ।' তবে অহেতুক কৃপা বলিয়াও একটা বস্তু আছে—সে অন্য কথা।

চারিটি সাধন পথের কথা শ্রীগীতায় পাওয়া যায়, তন্মধ্যে জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগ দুইটি। অপর দুইটি—ধ্যানযোগ

এবং কর্ম্মযোগ। ইহা কাহারও অবিদিত নাই। এই চতুরঙ্গ যোগ গীতা সমন্বিত করিয়াছেন। ঠাকুরের ত্যাগী ভক্তগণ নানাভাবে এই চতুরঙ্গযোগেরই সাধনা করিয়াছিলেন। ভগবান শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—'অচিন্তৈব পরং ধ্যানং'—শ্রেষ্ঠ ধ্যান চিন্তাশূন্যতা। মন যখন নির্ম্মল হয়, নির্ব্বিষয় হয়, শুধু তখনই স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম বা আত্মার স্বরূপ জানা যায়। যখন আত্মচিন্তা এবং বিষয়চিন্তা এতদুভয় হইতেই মন মুক্ত হয়—নিরবলম্ব হয়, তখনই ব্রহ্মভাব লাভ হইতে পারে, তৎপূর্ব্বে নহে।

চিত্তবৃত্তি সম্পূর্ণরূপে নিরুদ্ধ না হইলে ব্রহ্মভাব লাভ করিবার আশা দুরাশা মাত্র। এই বিষয়ে আর একটু বিস্তার করিয়া বলিতে হইলে বলিব যে, মানবের চিত্ত অবস্থাভেদে পঞ্চ প্রকার—ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র এবং নিরুদ্ধ। সাধনার যখন প্রথম অবস্থা, মন তখন বিক্ষিপ্ত থাকে, কখনও বা অন্তর্মুখী হইতেও চেষ্টা করে। ক্ষিপ্ত মন কামনাকুলিত এবং মূঢ় মন মোহগ্রস্ত। সে মন সাধনার পন্থা হইতে বহুদূরে অবস্থিত। আমরা দেখিতে পাই ঠাকুরের ত্যাগী ভক্তগণ ক্ষিপ্ত, মূঢ় এবং বিক্ষিপ্ত মন লইয়া দক্ষিণেশ্বরে আসেন নাই। তাঁহারা আসিয়াছিলেন অনেকাংশে একাগ্র মনের অধিকারী হইয়া এবং ক্রমে ক্রমে সেই মনটিকে তাঁহারা নিরুদ্ধ করিয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়াই ঠাকুরের কৃপায় সমাধির অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

কালীপ্রসাদ ছিলেন জন্ম-যোগী—একজন সাধারণ মুমুক্ষু সাধক নহেন। কিন্তু নিজের মধ্যে যে কি প্রবল শক্তি লুক্কায়িত ছিল প্রথমে তাহা তিনি জানিতেন না। তাই সাধারণ একজন সাধকের ন্যায় তিনি যোগের গ্রন্থ মাত্র পাঠ করিয়াই যোগের অষ্টাঙ্গসাধনায় নিযুক্ত হইতে চাহিয়া অকৃতকার্য্য হইয়াছিলেন এবং সেই কারণেই গুরুর সন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। গুরুলাভ করিয়া যেমন রাজযোগের সাধনায় তিনি সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, তেমনি করিয়াছিলেন তাঁহার অন্যান্য গুরুভ্রাতাগণ—অধিকারের তারতম্যানুসারে কেহ আগে, কেহ পরে। গুরুর কৃপায় গুপ্ত আত্মশক্তি প্রকাশিত হওয়া মাত্রই মহারাজ কি ভাবে কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন সেকথা পরে বলিব। মৃগ যেমন তাহার কস্তুরীর গন্ধে উন্মত্ত হইয়া কস্তুরী লাভের জন্যই ছুটিয়া বেড়ায়, মহারাজকেও দেখিতে পাই প্রথমে কস্তুরীগন্ধে লুব্ধ মৃগের মতই উন্মত্ত। সব মত্ততাই তাঁহার দূর হইয়া গেল যেদিন তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপা লাভ করিলেন। ঠাকুর যেন তাঁহাকে কহিলেন—'ওরে ছ্যাখ্ না, তোর ভেতরেই তো সব! বাহিরে ছুটিলে কি পাইবি ?' মহারাজ তখন হইতেই নিজের ভিতরে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। মহারাজের জীবনকথা, সেই ভিতরে দেখার কথা।

মহারাজের মনের কোনও নিভৃত স্থানে ভূকৈলাশের

হঠযোগীর স্মৃতি বর্ত্তমান ছিল। তিনি হয়ত এইরূপই মনে করিতেন যে, হঠযোগ শিক্ষা করিলেই দীর্ঘজীবী ও সবল থাকিয়া রাজযোগে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবেন। একদিন সেই সুপ্ত স্মৃতির জাগরণ এমনি প্রবল হইয়াছিল যে তিনি কাশীপুরে কাহাকেও কিছু জানিতে না দিয়া, গয়ার নিকটবর্ত্তী বরাবর পর্ব্বতাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। কিরূপে সুপ্ত স্মৃতি জাগ্রত হইয়াছিল তাহাই বলিতেছি।

প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ব্রাহ্মসমাজের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্পর্কিত থাকা কালেই সুযোগ পাইবামাত্র ঠাকুরের সঙ্গ করিতেন। এইরূপ সঙ্গের ফলে ক্রমে তাঁহার মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল এবং তিনি সদ্‌গুরু লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তিনি ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্ম ছাড়িয়া তীর্থ পর্য্যটনে বাহির হইলেন।

একদিন হঠাৎ প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ কাশীপুরে আসিলেন। তাঁহার তখন নগ্নপদ, পরিধানে গৈরিক বসন, হস্তে কমণ্ডলু, চক্ষু দুইটি অশেষ ভাবব্যঞ্জক। ঠাকুরের প্রতি অসীম ভক্তি দেখিয়া ভক্তগণ গোস্বামী প্রভুকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন; তিনি যে নানা স্থান পরিভ্রমণ করিতে করিতে মহাপুরুষদিগের কৃপা লাভ করিয়াছেন, তাঁহার মুখে একথাও তাঁহারা শুনিয়াছিলেন। মহাপুরুষদিগের কথা প্রসঙ্গে তিনি বরাবর পর্ব্বতবাসী একজন সিদ্ধ হঠযোগীর বর্ণনা করিলেন। কহিলেন,

সেই হঠযোগীকে দর্শন করিয়া তিনি খুবই আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন।

কালী মহারাজের মনের মধ্যে ভূকৈলাশের যে সিদ্ধ হঠযোগী এতদিন সুপ্তিমগ্ন ছিলেন, গোস্বামী মহাশয় যেন সেদিন তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ করিলেন! গোস্বামী মহাশয়ের মত সাধু সজ্জন যাঁহাকে একজন সিদ্ধ তাপস বলিয়া এত প্রশংসা করিতেছেন, সেই মহাপুরুষের নিকট হঠ-যোগ শিক্ষা করিতে পারিলে নিশ্চয়ই দেহকে সবল করিয়া আয়ুষ্কালকে বৃদ্ধি করিয়া মহারাজ সাধনপথে দ্রুততর গতিতে অগ্রসর হইতে পারিবেন, এই আশায় তিনি হঠযোগ শিক্ষা করিবার মানসে গোপনে গয়া যাত্রা করিলেন। তিনি জানিতেন যে, কাশীপুরে হঠযোগ শিক্ষা করিবার সুযোগ ছিল না, কারণ শ্রীশ্রীঠাকুর উহার বিরোধী ছিলেন।

বরাবর পর্ব্বত গয়া রেল ষ্টেশন হইতে কয়েক ক্রোশ দূরে অবস্থিত এবং দুর্গম বলিয়া পরিচিত ছিল। পার্ব্বত্য পথ অতিক্রম করিতে করিতে মহারাজ সন্ধ্যাকালে সম্মুখে দেখিলেন একটি শিবমন্দির ও তৎসংলগ্ন ধর্ম্মশালা এবং অদূরে একখানি গ্রাম।

ধর্ম্মশালায় একজন সন্ন্যাসীর সহিত মহারাজের নানা বিষয়ে আলাপ হইতে লাগিল। তেজঃপুঞ্জ কান্তি গৈরিক-ধারী যুবক বাঙ্গালী-সন্ন্যাসীর মূর্ত্তি সেই জটাধারী সন্ন্যাসীর মন আকর্ষণ করিল এবং যুবকের মুখে নানা শাস্ত্রকথা

শুনিয়া সন্ন্যাসী পুলকিত হইয়া উঠিলেন। বুঝিলেন, এই তরুণ বয়স্ক যুবকের জ্ঞানপিপাসা অতিশয় তীব্র। সন্ন্যাসীর নিকটে সন্ন্যাসগ্রহণের রীতি পদ্ধতি ও মন্ত্রাদি সম্বলিত একখানি পুঁথি দেখিয়া কৌতূহলী কালী মহারাজ উহা পাঠ করিলেন এবং লিখিয়াও লইলেন। বরাবর পর্ব্বতের পাদমূলে তিনি সেদিন যাহা সংগ্রহ করিলেন, কোন দিনও যে তাহা কোনও কাজে আসিবে এরূপ ধারণা তাঁহার ছিল না। শিক্ষণীয় নূতন কিছু পাইলেই সাগ্রহে তাহা শিখিয়া লইতে হইবে ইহাই ছিল তাঁহার চিরদিনের সঙ্কল্প। এখন যাহাকে ভস্মস্তূপ মনে হইতেছে তাহার গর্ভেও যে মণি লুক্কায়িত থাকিতে পারে ইহাই তাঁহার জানা ছিল।

যাহা হউক, বিধির বিধানে অল্পদিন পরই যখন বিরজা হোম করিয়া তিনি ও তাঁহার গুরুভ্রাতাগণ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন সেই যজ্ঞে ঐ সকল বিধি ব্যবস্থা হয় তো কাজে লাগিয়া থাকিতে পারে।

পরদিন গ্রামবাসিরা মহারাজকে নানারূপ ভয় দেখাইয়া পর্ব্বতারোহণ করিতে নিষেধ করিল। তাহারা কহিল যে হঠযোগীর একটি শিষ্য আছেন, তিনি কাহাকেও যোগীর গুহার নিকটে আসিতে দেন না। কেহ নিকটে গেলেই প্রস্তর ছুঁড়িয়া মারিতে আরম্ভ করেন।

ভয় কাহাকে বলে কালী মহারাজ কোন দিনও তাহা

জানিতেন না। তাঁহার সমস্ত জীবনই বিগতভীঃ হইয়া অতিবাহিত হইয়াছে—মৃত্যুকেও তিনিই ভয় দেখাইয়াছেন, মৃত্যু তাঁহাকে ভীত করিতে পারে নাই। সেই শ্রীকালী মহারাজ কি কখনও লোষ্ট্রাঘাতের ভয়ে ভীত হইয়া সঙ্কল্প-চ্যুত হইতে পারেন? "জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য" এই ছিল যাঁহার জ্ঞান, তিনি মানবসমাজের বহু উচ্চে তাঁহার আসন স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। একবার মার্কিন দেশের একজন খৃষ্টান্-সায়েন্টিষ্ট তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—আপনি ইচ্ছা-শক্তি বলে যেভাবে আপনার ভগ্নপদ আরোগ্য করিয়াছেন তাহা প্রচার করিলে অনায়াসেই মানব-মনে চিরঞ্জীবী হইয়া থাকিবেন। উত্তরে মহারাজ বলিয়াছিলেন—'অত তে আমার কাজ নাই, আমি নিজেই নিজেকে চিরঞ্জীবী করিতে পারিব।' প্রত্যুত তিনি করিয়াও গিয়াছেন তাহাই; কাহারও কাছে কিছু প্রত্যাশা করেন নাই—কাহারও অপেক্ষা রাখেন নাই! শুধু ঠাকুরকেই আমরণ অবলম্বন করিয়াছিলেন।

এইরূপ ধাতুতে আবাল্য গঠিত হইয়াছিলেন কালী মহারাজ। তাই তিনি গ্রামবাসিদিগের সতর্কবাণী গ্রাহ্য না করিয়া বরাবর পর্ব্বতের চড়াই-উৎরাই করিতে করিতে ক্ষত বিক্ষত নগ্ন পদে হঠ-যোগীর গুহার দিকে অগ্রসর হইলেন। ভূকৈলাশের হঠ-যোগী যেন তাঁহার সম্মুখে তখন জীবন্ত হইয়া দেখা দিলেন! হঠযোগ শিক্ষা করিয়া বহুদিন ধরিয়া একাসনে

সমাধিমগ্ন থাকিবেন ইহাই তো ছিল তাঁহার কৈশোরের স্বপ্ন। সে সুযোগ আজ অপ্রত্যাশিতভাবে মিলিয়া গিয়াছে। আঘাতের ভয়ে কি তিনি সেই সৌভাগ্য হইতে নিজেকে বঞ্চিত করিবেন ? কখনই নহে। মহারাজ যেমন শৈলারোহণ করিতেছিলেন তেমনি করিতে লাগিলেন। অল্পক্ষণ পরেই বুঝিতে পারিলেন চড়াই শেষ হইয়াছে—সম্মুখেই দেখিলেন, যোগীর গুহা।

একজন অপরিচিত ব্যক্তিকে আসিতে দেখিয়া হঠ-যোগীর শিষ্য একখানি প্রস্তর হস্তে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তখনই নিক্ষেপ করিবেন! মহারাজ মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া উচ্চ কণ্ঠে কহিলেন—'ওঁ নমো নারায়ণায়।' সন্ন্যাসী সন্ন্যাসীকে এই-ভাবেই অভিবাদন করিয়া থাকেন। 'ওঁ নমো নারায়ণায়' বলিতেই শিষ্যটির অগ্নিমূর্ত্তি শান্ত হইল। মহারাজ অগ্রসর হইয়া সন্ন্যাসীর নিকটবর্ত্তী হইলেন। নানা কথাবার্ত্তার পর তাঁহারা গুহার ভিতর প্রবেশ করিলেন ও প্রজ্বলিত ধুনিটি বেষ্টন করিয়া উপবেশন করিলেন।

মহারাজকে দেখিয়া ও তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া হঠযোগী এতই তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, মহারাজকে হঠযোগ শিক্ষা দিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসীর সহিত কথায় বার্ত্তায় মহারাজ বুঝিতে পারিলেন যে, হঠযোগী একজন অঘোরপন্থী সাধু বটে, কিন্তু যোগশাস্ত্রে

বিশেষ অভিজ্ঞ নহেন। শিষ্যটিকে হাঁপানি রোগে পীড়িত দেখিয়া হঠযোগ শিক্ষা করিবার ইচ্ছা তাঁহার মুহূর্ত্তে তিরোহিত হইয়া গেল! তিনি সুযোগমত জল আনিবার উপলক্ষ্য করিয়া গুহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং ক্ষিপ্রপদে উৎরাই করিয়া পর্ব্বতের নিম্নে গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

উত্তরকালে হঠযোগ সম্বন্ধে মহারাজ বলিয়াছিলেন যে, যাহারা সেই পরম সত্যটিকেই জানিতে চায়, হঠ-যোগ তাহাদিগের বড় বেশী কাজে আসে না। হঠ-যোগের প্রভাবে একজন লোক যদি পাঁচ শত বৎসরও জীবিত থাকে এবং সেই সুদীর্ঘকালের মধ্যে তাহার ঈশ্বরোপলব্ধি না হয় তাহা হইলে তাহাতে এবং অতিশয় বয়োবৃদ্ধ একটা অশ্বত্থবৃক্ষে (মহারাজ 'ওক' বৃক্ষের তুলনা দিয়াছিলেন) প্রভেদ কোথায়? পাঁচশত বৎসরই বাঁচিয়া থাকুক কিন্তু অশ্বত্থবৃক্ষ অশ্বত্থবৃক্ষই, তাহার অধিক আর কিছু নহে। আর ঐ একজন (হঠযোগ যে জানে না) সে ত্রিংশৎবর্ষ বয়সেই দেহ ত্যাগ করিল; সে যদি তৎপূর্ব্বেই ঠিক ঠিক উপলব্ধি করিয়া থাকে যে, সে আর ভগবান একই—ভিন্ন নহে, তাহা হইলে বলিব, যে ব্যক্তি শুধু সুদীর্ঘ আয়ুষ্কালই পাইয়াছে, আর না-হয় পাইয়াছে কিছু কিছু মানসিক বল এবং হঠযোগলব্ধ অটুট স্বাস্থ্য—মনোবলে রোগারোগ্য করিবার ক্ষমতাও যদি তাহার হইয়া থাকে, তবুও

তাহার তুলনায় ত্রিংশৎবর্ষ মাত্র জীবন লাভ করিয়া ভগবানকে জানিয়া যে মরিয়া গেল সে-ই অনেক বেশী লাভবান। কারণ পৃথিবীতে থাকা কালে ভগবানের সহিত সে নিজের একত্ব অনুভব করিয়াছিল এবং সেই জন্যই সে তাহার স্বল্প-পরিসর জীবনকালে জীবন্ত পরমেশ্বর রূপেই পৃথিবীতে বর্ত্তমান ছিল; নরসমাজের জন্যও মুক্তির একটা পন্থা সে দেখাইয়া দিয়া গেল।

হঠযোগীর নিকট হইতে পলায়ন করিয়া আসিয়া মহারাজের এখন এই কথাই বার বার মনে হইতে লাগিল—"কর্ম্মের দ্বারাই যোগ হোক, আর মনের দ্বারাই যোগ হোক, ভক্তি হ'লেই সব জানতে পারা যায়। একাগ্র মন হলেই বায়ু স্থির হ'য়ে যায়; আর বায়ু স্থির হলেই মন একাগ্র হয়, বুদ্ধি স্থির হয়।"

কেন যে তাঁহার একাগ্র মন হঠাৎ এমন অস্থির হইয়াছিল এই দুঃখেই মহারাজের চিত্ত তখন অত্যন্ত ভারি হইয়া উঠিল। তিনি মনে করিলেন, না-জানি ঠাকুর কত বিরক্ত হইবেন! হায় হায়, কেন আমি সোনা ফেলিয়া শূন্য অঞ্চলে গেরো বাঁধিতেছিলাম! একি দুর্ব্বুদ্ধি আমার!

তিনি যখন অনুতপ্ত হৃদয়ে ঠাকুরের নিকটে আসিলেন তখন ঠাকুর প্রসন্ন হাস্যে সকল সন্তাপ দূর করিয়া দিয়া কহিলেন—'আমাকে না বলিয়া কোথায় গিয়েছিলি?'

মহারাজ নিতান্ত অপরাধীর মত হঠযোগী দর্শনের ব্যাপার বর্ণনা করিলেন। ঠাকুর মৃদু হাস্য করিতে করিতে কহিলেন—'চার খুঁট্ ঘুরে আয়। কিন্তু এখানে (নিজের বুক দেখাইয়া) যা' দেখছিস্ এমনটি আর কোথাও পাবিনি।'

মহারাজের সকল সন্তাপ দূর হইয়া গেল। ঠাকুর বলিতে লাগিলেন—জাহাজের মাস্তুলের উপর একটা পাখী বসেছিল। জাহাজ যখন কালা-পানিতে এসে পড়েছে, পাখীটার তখন হুঁস্ হলো—তাই তো! কোনো দিকেই যে ডাঙ্গা নাই! সে তখন উত্তর দিকে উড়ে গেল, কিন্তু কোনো কুল-কিনারা না পেয়ে উড়ে এসে মাস্তুলে বস্‌লো। একটু বিশ্রাম ক'রে, দক্ষিণ-দিকে গেল। সে দিকেও কুল-কিনারা নাই। তখন হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এসে আবার সেই মাস্তুলটায় বস্‌লো; এবার গেলো পূর্ব্বের দিকে—তারপর আবার পশ্চিমে। যখন দেখলে কোনও-দিকেই কুল-কিনারা নাই, তখন মাস্তুলের উপর চুপ করে ব'সে রইল।

গল্পটি বলিয়া ঠাকুর কহিলেন—তুলনা না করলে, ছোট-বড় ভালো-মন্দ বুঝা যায় না।

মহারাজ সাহস পাইয়া কহিলেন—তবে তো সেখানে গিয়ে ভালই করেছি। আপনার মাহাত্ম্য এখন আমার কাছে আরও বেশী প্রকাশ হলো।

কাশীপুরে আসিয়া মহারাজ আবার পূর্ব্ববৎ ঠাকুরের সেবা

করিতে লাগিলেন। পূর্ব্ববৎ পাঠ ও শাস্ত্রালোচনা এবং ধ্যানাদি চলিতে লাগিল। নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে আবার পূর্ব্ববৎ ভগবান তথাগতের অতুলনীয় জীবনকাহিনীর আলোচনা হইতে লাগিল। সে কাহিনীর প্রধান বক্তা ও ভাষ্যকার ছিলেন বাঙ্গালার তথাগত নরেন্দ্রনাথ—বহুজন হিতায় তেমনি একজন ত্যাগী, তেমনি একজন সংযমী, তেমনি একজন কঠোর তপস্বী, পরের বেদনায় সর্ব্বদা তেমনি আত্মহারা। ললিত বিস্তরের শ্লোকাবলী তখন মহারাজের কণ্ঠে নিত্য নিত্য ধ্বনিত হইতে লাগিল। গুরুভ্রাতাগণ শুনিয়া মুগ্ধ হইলেন।

ত্যাগী ভক্তগণ সকলেই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট হইতে সিদ্ধির মন্ত্র পাইয়াছিলেন—মনও তাঁহাদিগের সকলেরই ছিল। সুতরাং তাঁহারা সাধনপথে দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পণ করিলেন, একদিকে জীবন—অন্যদিকে সিদ্ধি। জীবন যায় যাউক—সিদ্ধি লাভ করিতেই হইবে। পাছে এই কঠিন পণ দণ্ডেকের জন্যও মনের অগোচর হইয়া যায় এই জন্য, উদ্যান-বাটিকার নিম্নতলে যে হল-ঘরে ধ্যান, ধারণা, স্বাধ্যায় ইত্যাদি চলিতেছিল তাঁহারই একটি দেওয়ালের গায়ে তাঁহারা বড় বড় অক্ষরে লিখিয়া রাখিলেন—

ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং
ত্বগস্থি মাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু ;

অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পদুর্ল্লভাং
নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে।

কি ভীষণ এই পণ! দেহ ক্ষয় হয়—হউক—ত্বক্‌, অস্থি, মাংস সবই ধ্বংস হইয়া যাউক—যতদিন না সেই দুর্ল্লভ বোধি লাভ করিতেছি, ততদিন এই আসন ছাড়িব না—ছাড়িব না!

পৃথিবী বহু মহাজনের কাহিনী রক্ষা করিয়াছে। তাঁহাদিগের মধ্যে কয়জন এমন ভাবে পণবদ্ধ হইতে পারিয়াছিলেন, এবং কয়জনই বা শেষ পর্য্যন্ত সেই পণ রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন তাহা বলিতে পারি না; কিন্তু ইহা বলিতে পারি যে, কাশীপুরের তপোক্ষেত্রে তখন নরেন্দ্রনাথ, রাখাল, তারকনাথ, কালী মহারাজ প্রভৃতি ত্যাগী ভক্তগণ দৃঢ়চিত্তে এই যে আদর্শ পণটি গ্রহণ করিয়াছিলেন, কোনো-কিছুই তাঁহাদিগকে সেই পণ হইতে বিচ্যুত করিতে পারে নাই। কর্ম্মক্ষেত্রে অভাবের নিগ্রহ, পীড়ার পীড়ন, কখনও বা স্বদেশীয়ের তিক্ততা, বিদেশীর শত্রুতা, পাণ্ডিত্যাভিমানীর ঈর্ষ্যামূলক গঞ্জনা, বিধর্ম্মীর বিদ্বেষ প্রভৃতি কত-কিই তো তাঁহাদিগের পথে দুরতিক্রম্য বাধারূপে শির উত্তোলন করিয়াছিল—কিন্তু কেহই, কিছুই তাঁহাদিগকে প্রভুনির্দ্দিষ্ট পথ হইতে তিলমাত্রও সরাইয়া লইতে পারে নাই!

দক্ষিণেশ্বর, শ্যামপুকুর ও কাশীপুর তাঁহাদের হৃদয়ে যে শক্তির সূচনা করিয়াছিল,—স্বর্ণময় পাত্রটিকেও যেমন উজ্জ্বল

রাখিতে হইলে নিত্য নিত্য মার্জ্জন করিতে হয়, তাঁহারাও তেমনি আমরণ আপন আপন স্বর্ণপাত্রটিকে সেইরূপ যথারীতি মার্জ্জন করিয়া প্রভুদত্ত সেই শক্তিকে হীনবীর্য্য হইতে দেন নাই। গ্রহণ করিবার জন্য পতাকা দিয়াছিলেন যিনি, উহা বহন করিবার শক্তিও তিনিই দিয়াছিলেন। সেই শক্তি নিত্য সাধনার ফলে দিনে দিনে বর্দ্ধিতই হইয়াছিল, বায়ুর স্পর্শে দাবানল যেরূপ বর্দ্ধিত হয় সেইরূপ এবং তাঁহাদিগকে এক বীর-সন্ন্যাসিদলরূপে একদিন আপন আপন নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। ঠাকুর যে বীজ উপ্ত করিয়াছিলেন, উত্তরকালে তাহাই মহামহীরূহে পরিণত হইয়া কত শত জনকে ছায়াশীতল আশ্রয় দান করিয়াছে, বিভ্রান্তকে পথের সন্ধান দিয়াছে—আর্ত্তকে সুস্থ করিয়াছে।

ঠাকুরের চরণমূলে বসিয়া তাঁহারা শিখিয়াছিলেন—ধর্ম্ম একটা মতবাদ নহে, উহা প্রাত্যহিক জীবনের নিত্য সঙ্গী; উহা অনুষ্ঠানের শৃঙ্খল নহে, আচারের প্রাচীর নহে—উহা আকাশের মতই মুক্ত, সাগরের মতই উদার—উহা প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে বাঁধে না, উহা মুক্তির মন্দিরে বন্ধন-শৃঙ্খলের চিরতরে বিনাশ সাধন। ধর্ম্মমণ্ডলে সাধারণতই দেখিতে পাওয়া যায়—ভেদবাদ। সত্যকার সাধনার প্রারম্ভে এই ভেদজ্ঞানের মূলোচ্ছেদ করিতে হয়; কিন্তু সংস্কার এমনই একটি বস্তু যে বহু চেষ্টাতেও তাহার মূলোৎপাটন করা সুকঠিন। যে গুরু

শিষ্য-হৃদয় হইতে সেই সংস্কারের মূল উৎপাটিত করিয়া দেন, তিনিই যথার্থ গুরু। শ্রুতি বলেন—যে ব্যক্তি এই জগতে শুধু বহু ভাবই দর্শন করে, সে মৃত্যু হইতে মৃত্যুর মুখে পতিত হয়—'মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি।'

ধন্য ধন্য সেই ধর্ম্মরূপী ঐন্দ্রজালিক, যিনি এক লৌকিক রোগশয্যায় শায়িত থাকিয়া ভক্তদিগকে দেখাইয়াছিলেন—কেমন করিয়া নিজেকে গলাইয়া সমুদয় বিশ্বে বন্যার বারির মত প্রবাহিত করিতে হয়। বলিয়াছিলেন—জীবে দয়া নহে, শিবের সেবা; বলিয়াছিলেন—তাহাই ধর্ম্ম, তাহাই মুক্তির পন্থা, তাহারই ফল চতুর্ব্বর্গ লাভ—ইহকালে অপরিমেয় তৃপ্তি, পরকালে অপরিম্লান শান্তি!

বুদ্ধদেবে ধর্ম্মের সেই সেবা-মূর্ত্তি দর্শন করিয়া যেমন নরেন্দ্রনাথ বিহ্বল হইলেন, উন্মত্তপ্রায় হইলেন, তেমনি হইলেন কালী মহারাজ ও তারকনাথ প্রমুখ তাঁহার অপর গুরুভ্রাতাগণ। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের এক সন্ধ্যায় তাই যখন নরেন্দ্রনাথ বলিলেন—'চল্ আমরা বুদ্ধগয়া দর্শন করতে যাই' —কালী মহারাজ ও তারকনাথ অমনি সম্মত হইলেন। গৈরিক কৌপীন, বহির্ব্বাস ও কম্বল লইয়া একদিন রাত্রে তাঁহারা সকলের অলক্ষ্যে কাশীপুর উদ্যান-বাটিকা হইতে বহির্গত হইলেন এবং পরদিন প্রত্যুষে বালি রেল ষ্টেশনে গয়া গামী একখানি ট্রেনে উঠিয়া গয়ায় যাইয়া পৌঁছিলেন।

গয়াধামে যাহা কিছু দর্শনীয় ছিল সে সমুদয় দেখিয়া বাঙ্গালার এই তিন সন্ন্যাসী ৮ই বা ৯ই এপ্রিল তারিখে পদব্রজে বুদ্ধগয়ায় উপস্থিত হইলেন এবং বিপুল আবেগে মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেবতার সেই অপূর্ব্ব স্বর্ণপ্রতিমার পাদমূলে লুটাইয়া পড়িলেন।

নরেন্দ্রনাথ নাই, কালীপ্রসাদ নাই, সঙ্গে সঙ্গে তারকনাথও কাশীপুরে নাই। অন্যান্য ভক্তগণ চিন্তিত হইয়া উঠিলেন। ইহাদিগের তীব্র বৈরাগ্যের ভাব তো তাঁহারা পূর্ব্বাপর লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিলেন। কেহ বলিলেন—উহারা তীর্থ পর্য্যটনে গিয়াছে, কেহ বলিলেন—না না, নির্জ্জনে তপস্যা করিবার জন্য উহারা হিমালয় পর্ব্বতে গিয়াছে!' কেহ বা বলিলেন—মনে হয় আর উহারা ফিরিবে না। কথাটি শেষে শ্রীরামকৃষ্ণের কর্ণগোচর হইল। ঠাকুর শুনিয়া ধীর স্থির শান্ত ভাবে বসিয়া রহিলেন, যেন কিছুই ঘটে নাই! তিনি শুধু মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। যাঁহারা সংবাদ দিতে আসিয়াছিলেন তাঁহারা দেখিয়া শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। ভাবিতে লাগিলেন ঠাকুর কি পূর্ব্ব হইতেই সব জানিতেন না কি?

ঠাকুর শেষে বলিলেন—'নরেন, কালী, তারক নাই, তা'তে কি হয়েছে! ওরা ফিরে এলো বলে।' নরেন্দ্রাদির প্রত্যাগমন সত্য সত্যই তাঁহার ইচ্ছার উপরই নির্ভর করিত।

তিনি যখন আকর্ষণ করিতেছেন তখন উহারা অবিলম্বে কাশীপুরে আসিবে।

বর্ত্তমান বুদ্ধগয়ার মন্দিরের পশ্চাৎভাগে যে স্থানে বজ্রাসনে বসিয়া ভগবান বুদ্ধ ধ্যান করিয়াছিলেন, সম্রাট অশোকের আদেশে তথায় একটি প্রস্তরবেদী নির্ম্মিত হইয়াছিল। বুদ্ধগয়ায় পৌঁছিয়া নিশাকালে তিন সন্ন্যাসী তথায় ধ্যান করিতে বসিলেন। নরেন্দ্রনাথ বসিলেন বেদীর উপর এবং মহারাজ ও তারকনাথ বোধিদ্রুমের পাদদেশে বসিয়া ধ্যানে মগ্ন হইলেন। সমস্ত রাত্রি ধ্যানে কাটিয়া গেল।

পরদিন প্রত্যুষে তিন জনে মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিয়া আবার ধ্যানে বসিলেন। নরেন্দ্রনাথের বামে বসিলেন মহারাজ এবং দক্ষিণে বসিলেন তারকনাথ। ধ্যানান্তে নরেন্দ্রনাথ মহারাজকে কহিলেন যে, শ্রীমূর্ত্তি হইতে একটি আলোক ধারা বহির্গত হইয়া মহারাজের পার্শ্ব দিয়া তারকনাথের দিকে যেন চলিয়া গেল এইরূপ দেখিলেন।

সেদিন বুদ্ধগয়ার অন্যান্য তীর্থস্থানগুলি দর্শন করিয়া নরেন্দ্রনাথ, তারকনাথ ও মহারাজ মাধুকরী করিলেন। সে দেশের রুটি আহার করায় নরেন্দ্রনাথের পেটের পীড়া উপস্থিত হইল। মহারাজ এবং তারকনাথ সমস্ত রাত্রি তাঁহার সেবা করিয়া কাটাইলেন। প্রভাত হইলে নরেন্দ্রনাথকে লইয়া তাঁহারা বুদ্ধগয়ার দশনামী হিন্দু সন্ন্যাসীর মঠে যাইয়া উপস্থিত

হইলেন। এই মঠটি ফল্গু নদীর অপর পারে অবস্থিত। ফল্গুর বালুকাময় সিকতাভূমি নগ্নপদে কষ্টে অতিক্রম করিয়া তাঁহারা যখন মঠে উপস্থিত হইলেন তখন মঠের মোহন্ত মহারাজ ও সাধুগণ তাঁহাদিগকে পঙ্গতভোজনের জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন।

ক্রমে ভোজনের বেলা উপস্থিত হইলে একজন সাধু তার-স্বরে তিনবার চীৎকার করিয়া ডাকিলেন—"পঙ্গৎ কি হরি হর মহাপুরুখো"—মহাপুরুষগণ আসুন ভোজনের পাতা পড়িয়াছে। এই ভাবে আহ্বান করাই সে মঠের রীতি ছিল। যে সকল সাধু মঠের ক্ষেত্রে কৃষিকার্য্যে রত ছিলেন, আহ্বান শুনিয়া তাঁহারা পঙ্গতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাঙ্গালার নবীন সন্ন্যাসীত্রয়ও সেই সঙ্গে যাইয়া পঙ্গতে বসিলেন। পলাশ পত্রের উপর রুটি, ডাল এবং মিষ্টান্ন পরিবেশন করা হইলে সকলে ভোজন আরম্ভ করিলেন।

নরেন্দ্রনাথ ছিলেন সঙ্গীতে দেবকণ্ঠ এবং মঠের মোহন্ত-মহারাজও ছিলেন সঙ্গীতপ্রিয়। মধ্যাহ্নভোজনের পর নরেন্দ্রনাথ তানপুরা লইয়া গান গাহিতে আরম্ভ করিলেন। সেই মধুর সঙ্গীতে মোহন্ত-মহারাজ এতই মুগ্ধ হইলেন যে, তাঁহাদিগের তিন জনের পাথেয় বলিয়া কিছু অর্থ দিলেন। ঠাকুরের নিকটে আসিবার জন্য তাঁহাদিগের প্রাণ তখন অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। মঠে আর বিলম্ব না করিয়া তাঁহারা অবিলম্বে গয়ায় ফিরিয়া আসিলেন। নরেন্দ্রনাথ তখনও ছিলেন

খুবই দুর্ব্বল। সে রাত্রিতে আর কলিকাতায় ফিরিয়া আসা ঘটিল না। তাঁহারা তখন উমেশবাবু নামক জনৈক গয়াপ্রবাসী বাঙ্গালীর গৃহে অতিথি হইলেন। সেখানেও নরেন্দ্রনাথের পিক-কণ্ঠের গীত শুনিয়া সকলে মুগ্ধ হইয়া গেল এবং উমেশ-বাবু যখন শুনিলেন যে, তাঁহাদের তিন জনের পাথেয় কিছু কম পড়িয়াছে, তখন প্রফুল্ল চিত্তে উহা পূর্ণ করিয়া দিলেন।

দিবসত্রয় অনুপস্থিতির পর নরেন্দ্রনাথ, তারকনাথ ও মহারাজ ঠাকুরের চরণ দর্শন করিয়া ব্যথিত চিত্তকে শান্ত করিলেন। ক্রমে ক্রমে নরেন্দ্রনাথ ও কালী মহারাজ তাঁহাদিগের ভ্রমণবৃত্তান্ত ঠাকুরের নিকট নিবেদন করিলে ঠাকুর উৎসুক হইয়া বুদ্ধদেব সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

সকল কথা শুনিয়া ঠাকুর কহিলেন—"আচ্ছা, এখানে সব আছে; না? নাগাদ মুসুর ডাল, ছোলার ডাল; তেঁতুল পর্য্যন্ত। ...এই পাখা যেমন দেখ্‌ছি সাম্‌নে—প্রত্যক্ষ—ঠিক অম্‌নি আমি ঈশ্বরকে দেখ্‌ছি। দেখ্‌লাম তিনি আর হৃদয় মধ্যে যিনি আছেন—এক ব্যক্তি।" (১)

---

(১) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত। শ্রীম। তৃতীয় ভাগ (ষষ্ঠ সংস্করণ—১৩৪৮)। ২৮৬—২৮৭ পৃষ্ঠা।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

অন্তর্দ্ধান

"ব্রাহ্মসমাজের প্রণালীতে দ্বৈতভাবে ঈশ্বরোপাসনায় অভ্যস্ত স্বামীজির নিকট বেদান্তের সোঽহংভাবের উপাসনাটা তখন (দক্ষিণেশ্বরে) পাপ বলিয়া পরিগণিত হইলেও ঠাকুর তাঁহাকে তদনুশীলন করাইতে নানাভাবে চেষ্টা করিতেন।...... স্বামীজিকে ঐ ভাবে গঠিত করিতে থাকিলেও ঠাকুর তাঁহার অন্যান্য বালকদিগকে—কাহাকেও সাকারোপাসনা, কাহাকেও নিরাকার সগুণ ঈশ্বরোপাসনা, কাহাকেও শুদ্ধা ভক্তির ভিতর দিয়া—অন্য নানা ভাবে ধর্ম্মজীবনে অগ্রসর করাইয়া দিতেছিলেন; এইরূপে স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ বালক ভক্তগণ দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট একত্র শয়ন, উপবেশন, আহার, বিহার ও ধর্ম্ম চর্চ্চা প্রভৃতি করিলেও ঠাকুর অধিকারি-ভেদে তাহাদিগকে নানা ভাবে গঠিত করিতেছিলেন।" (১) ঠাকুরের এই শিক্ষাপদ্ধতি কেবল যে দক্ষিণেশ্বরেই অবলম্বিত হইয়াছিল তাহা নহে; শ্যামপুকুরে এবং কাশীপুরেও তিনি

---

(১) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ—স্বামী সারদানন্দ। (সাধক ভাব—১৩৩৯)। ৫—৬ পৃষ্ঠা।

এই ভাবেই শিক্ষা দিতেন। সেই জন্যই বরাহনগর মঠে দেখিতে পাই ত্যাগী ভক্তদিগের মধ্যে প্রধানতঃ তিনটি ভাগ। নরেন্দ্রনাথ, কালীমহারাজ প্রভৃতি কয়েকজন অধ্যয়নের দিকেই বেশী মন দিয়াছিলেন এবং সাধনভজনও করিতেন, আর এক ভাগের মত ছিল যে সাধন, ভজন, তপস্যাই প্রধান বস্তু—অধ্যয়নাদির আর প্রয়োজন নাই ; আর কয়েকটি ছিলেন "ভক্তির লোক। তাঁহারা ভক্তি করিবেন এবং ভক্তিমার্গের সাধন-ভজন করিবেন।" (২)

একালের শিক্ষাবিধাতৃগণ জানিয়াও জানেন না যে, সকলের শিক্ষা বিধানের জন্য একটি নির্দ্দিষ্ট বাঁধা পথ নির্ম্মাণ করিলে শিক্ষার উদ্দেশ্যই বিফল হইয়া যায়। ঠাকুর যদিও কোনও বিদ্যায়তনের উপাধিধারী ছিলেন না, কিন্তু ইহা তিনি বিশেষরূপেই জানিতেন যে অধিকারী ভেদে পথ বিভিন্ন। তাই তাঁহার ব্যবস্থা ছিল—

তাঁরে দেন সেই রস লীলার ঈশ্বর।
যে রস যাহার পক্ষে পরিপুষ্টিকর॥ (৩)

বাঙ্গালা ভাষায় একটি সাধারণ প্রবচন আছে—বানরের

---

(২) মহাপুরুষ শ্রীমৎশিবানন্দ মহারাজের অনুধ্যান—মহেন্দ্র নাথ দত্ত। ১৯—২৩ পৃষ্ঠা।

(৩) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি—অক্ষয় কুমার সেন। (দ্বিতীয় সংস্করণ—উদ্বোধন) ৬১৩ পৃষ্ঠা।

গলায় মুক্তার মালা—ইহার অর্থ এই যে, যে বিষয়ে যাহার অধিকার নাই, তাহাকে উহা দান করিলে দানের অপব্যবহারই করা হয়। ইহাকেই অধিকারিভেদের বিচার বলা যাইতে পারে। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ সর্ব্বদাই তাহা করিতেন। তিনি একদিন কেশবচন্দ্র সেনকে বলিয়াছিলেন—"তুমি না দেখে শিষ্য কর কেন? আমি লোক চিন্‌তে পারি।" প্রত্যেক মানুষই কতকগুলি শক্তি লইয়া জন্ম গ্রহণ করে। সেই শক্তি বলে যাহা করিতে পারা যায় তাহার অধিক সে ব্যক্তির নিকট আশা করিলে শুধু ব্যর্থতাকেই আহ্বান করিতে হয়। মানব-জীবনের এই স্থূল নীতিটি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের এত বেশী জানা ছিল যে, তাঁহার অন্তরঙ্গ শিষ্যদিগের কাহারও কোন কর্ম্মের জন্যই তাঁহাকে কখনও ব্যথিত হইতে হয় নাই।

সকল শিক্ষাই যে সকলে সমানভাবে গ্রহণ ও পালন করিতে পারে, তাহা নহে। সেই জন্য "যে রস যাঁহার পক্ষে পরিপুষ্টিকর" প্রভু তাঁহাকে শুধু তাহাই দিয়াছিলেন, এবং সেই রসে পরিপুষ্ট হইয়া শিষ্য যে পর্য্যন্ত যাইতে পারে, তিনি তাহার নিকট মাত্র সেইটুকুই আশা করিতেন। অধিকারিভেদে শিক্ষার ব্যবস্থা তাই বিভিন্ন ছিল। উদাহরণ লইলে বিষয়টি আরও পরিস্ফুট হইবে। প্রভু ছিলেন কাম-কাঞ্চন-বিরোধী, কিন্তু গৃহীভক্ত মাষ্টার মহাশয় বা রামচন্দ্র বা গিরিশকে সেজন্য তিনি স্ত্রী-পুত্র-ধন-জন পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইবার

আদেশ দেন নাই। আবার রাখাল মহারাজ বা যোগেন মহারাজ ছিলেন কৃতদার শিষ্য। তাঁহাদিগের প্রতি সন্ন্যাস গ্রহণের আদেশ হইয়াছিল! নরেন্দ্রনাথ বা কালী মহারাজ যে ধাতুতে গঠিত ছিলেন, তাহারই উপযোগী উপদেশ তাঁহাদিগের প্রতি বিহিত হইয়াছিল। অন্যান্যের জন্য উপদেশ ছিল বিভিন্ন রকম।

কাহাকেও তিনি বলিয়াছেন,—তুমি সংসারে থাকো ক্ষতি নাই, কিন্তু সংসার যেন তোমার মধ্যে না থাকে; আবার আর একজনকে বলিয়াছেন—সংসার হইতে শত যোজন দূরে চলিয়া যাও তবেই ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে পারিবে। সেই জন্যই দেখা যায় যে, উত্তরকালে অন্তরঙ্গ ভক্তদিগের কর্ম্ম-প্রচেষ্টা ও ধর্ম্মজীবন বিভিন্ন পথে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। প্রত্যেকেই অসাধারণ সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু আপন আপন পথে এবং নিজ নিজ শক্তির গণ্ডীর মধ্যে। কোথাও জ্ঞান কর্ম্ম ও ভক্তির সম্মিলিত বীর্য্য, কোথাও সেবা, কোথাও শুধুই ভক্তি এইরূপ নানা ভাবের প্রাধান্য তাই ইঁহাদিগের মধ্যে দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই ভাবেই লোকগুরুগণ আপন আপন মহৎ উপলব্ধিগুলি মানবসমাজের কল্যাণের জন্য প্রচার করিয়া থাকেন। একই গুরুর শিষ্য হইলেও শিষ্যদিগকে "প্রবর্ত্তিতো দীপ ইব প্রদীপাৎ" বলা যায় না! শিষ্যগণ গুরুর উপদেশ পালন করিয়া ক্রমে ক্রমে যোগ্য হইয়া

উঠিতেছেন কি না, তাঁহাদিগের অলক্ষ্যে ঠাকুর তাহা লক্ষ্য করিতেন। একদিন তিনি বলিয়াছিলেন—"সব দেখলুম—কার কতদূর এগিয়েছে—রাখাল, ইনি (মণি), সুরেন্দ্র, বাবুরাম, অনেককে দেখলুম। ......সব্বায়ের হয়ে যাবে দেখলুম।"(৪)

সমাজের বিভিন্ন স্তর হইতে যুবক ভক্তগণ দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া সম্মিলিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের বয়সে পার্থক্য ছিল, শিক্ষা-দীক্ষার পার্থক্য ছিল, মনের পার্থক্য ছিল এবং যিনি যেরূপ সংস্কারের আওতা হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছিলেন, তিনি তদনুযায়ী সংস্কারগুলি সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন। সুতরাং বলিতে গেলে তাঁহারা ছিলেন বহু। সেই বহুর ভিতরে যে কখন-কখনও মতান্তর ও কলহ ঘটিত না তাহা নহে।

শ্রীশ্রীলাটু-মহারাজের মুখে আমরা শুনিতে পাই যে যুবক ভক্তদিগের মধ্যে কখন-কখনও "কথা কাটাকাটি" হইতে হইতে দুই একদিন "হাত তোলা তুলিও" হইত। তিনি বলিয়াছেন—"কাশীপুরে একদিন ঠাকুর সকলকে ডেকে বল্লেন—দ্যাখ্ দলাদলি করিস্ নি। মিলে মিশে থাক্‌লে সকলেই আনন্দ পাবি, আর দলাদলি করলে দুঃখে-কষ্টে পড়বি। সেদিন সব নিজেদের মধ্যে তর্ক করেছিল, তর্কের পর হাত তোলা-তুলি করেছিল। তর্ক করতে ঠাকুর কাউকে মানা

(৪) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত—শ্রী-ম। দ্বিতীয় ভাগ। ২০৪ পৃষ্ঠা।

করেন নি, বা-কী তর্ক ক'রে দল পাকাতে খুব নিষেধ করতেন।"(৫)

এইরূপ দ্বন্দ্ব-কলহ হওয়ার কথা শুনিয়া বিস্মিত হইবার কিছু নাই। বরং ইহাই ছিল স্বাভাবিক। বয়স এবং প্রকৃতি ইহার অনুকূলে ছিল। একটি জীবনকে গঠন করিতে হইলে তাহাকে আপন খাতে স্বচ্ছন্দগতিতে বহিতে দিতে হয়। বাঁধ বাঁধিয়া গতিবেগ একেবারে রুদ্ধ করিয়া দিলেই উচ্ছ্বসিত জলতরঙ্গ আয়ত্তের বাহিরে যায়। সুসমঞ্জস ও সস্নেহ শিক্ষার ব্যবস্থায় সকলের জীবনেরই কাঁটা-খোঁচা ভাঙ্গিয়া মসৃণ করিতে পারা যায়। ঠাকুরের ত্যাগী ভক্তদিগের সম্বন্ধেও সেই কথা প্রযুক্ত হইতে পারে। কালে তাঁহারা সকলেই হইয়াছিলেন এক একটি মহাপুরুষ এবং মানব সাধারণের আশা ও আশ্রয় স্থল। কিন্তু যে জন্য তাঁহারা এইরূপ হইতে পারিয়াছিলেন, সেই মহৎ বীজটি প্রত্যেকের হৃদয়ে উপ্ত করিয়া ঠাকুর প্রতিদিন স্বহস্তে জল সেচ করিতেন এবং বৃক্ষকে সতেজ করিবার জন্য তাঁহারাও হইয়াছিলেন একান্ত যত্নশীল। তাহারই ফলে বীজ হইতে চারাগাছ উৎপন্ন হইয়াছিল। সেই চারাগুলি ভক্তদিগের আপন চেষ্টায় ও প্রাণান্ত সাধনায় যখন এক একটি বৃহৎ মহীরুহে পরিণত হইল তখনই মানব তাঁহাদিগকে

---

(৫) শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতি কথা—চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়। (উদ্বোধন) ২৭৬ পৃষ্ঠা।

মহাপুরুষ ও দেব-মানব জ্ঞানে পূজা করিল। তৎপূর্ব্বে "কথা কাটা-কাটি" এবং "হাত তোলাতুলি" হইয়া থাকিলেও তাহা কলঙ্কের লেখা বলিয়া কোন ক্রমেই গণিত হইতে পারে না—উহা মনুষ্যস্বভাবের অতি সাধারণ নিয়মানুবর্ত্তিতা মাত্র।

যাহা হউক, এইরূপ বহু মনকে মিলাইয়া এক মন করা, বহু তন্ত্রীকে বাঁধিয়া এক সুরের একটি বীণা প্রস্তুত করা—ইহাই ছিল সমন্বয়াচার্য্য ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য সাধনের একটি উপলক্ষ্য হইয়াছিল তাঁহার গলরোগ, এ-কথা তিনিই বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মহান উদ্দেশ্য যে সফল হইয়াছিল তাহা কে না জানে?

এ-কালের যুবকদিগের মধ্যে একতার ও এক-প্রাণতার অভাব লক্ষ্য করিয়া মহারাজ অনেক দুঃখ প্রকাশ করিতেন। বলিতেন, ইহারা এতই স্বস্বপ্রধান যে ইহাদিগকে লইয়া কোন প্রতিষ্ঠান গঠন করিলে তাহা অল্পায়ুঃ হয়। জাতিকে প্রাণবন্ত করিতে হইলে আজ্ঞানুবর্ত্তিতার বিশেষ প্রয়োজন। কি ব্যক্তিগত পরিবারে, কি জাতির মধ্যে—যেখানেই এই মহৎগুণের অভাব দেখা যায়, বুঝিতে হইবে সেখানে ভাঙ্গন লাগিয়াছে! সকলেই সেনাপতি হইতে চাহিলে সৈনিক হইবে কে? স্বাতন্ত্র্য এবং স্বাধীনতা লাভের প্রধান উপায় আজ্ঞানুবর্ত্তিতা।

মহারাজ তাঁহার দ্বিসপ্ততিতম জন্মতিথি উপলক্ষ্যে বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ১২ই আশ্বিন তারিখে তাঁহার "স্বদেশবাসী ভ্রাতা-

ভগ্নিগণকে” সম্বোধন করিয়া যে অগ্নিময়ী বাণী প্রচার করিয়াছিলেন, এই প্রসঙ্গে আজ সেই কথা মনে পড়িতেছে। তিনি বলিয়াছিলেন—

“তোমরা জাগ্রত হও। তোমরা অমৃতের পুত্র—এই সত্যজ্ঞান লাভ করিয়া বলীয়ান হও। একবার মোহনিদ্রা ত্যাগ করিয়া দেশের বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত কর। আত্মপ্রত্যয় যাহাতে তোমাদের আইসে তজ্জন্য যত্নবান হও। তোমাদের জাতীয়তা লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। তোমরা স্বাধীনতা হারাইয়া দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়াছ এবং সকলের নিকট ঘৃণিত, লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইতেছ। জাতীয় শিক্ষার অভাবে তোমাদের সন্তানসন্ততিগণ তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের গৌরব ও মহিমা ভুলিয়া যাইতেছে। সিংহশাবক মেষরূপে পরিণত হইতেছ। জাতীয় ধর্ম্মের উচ্চ আদর্শগুলি বক্ষে ধারণ করিয়া নির্ভিক চিত্তে অগ্রসর হও এবং নিজ জীবন গঠিত কর। জগন্মাতা তোমাদিগকে ডাকিতেছেন—‘উত্তিষ্ঠত জাগ্রত।’ তাঁহার বিশ্ববাণী শ্রবণ কর, হৃদয়ঙ্গম কর, ধ্যান কর। একতাবদ্ধ হইয়া আপন পায়ে দাঁড়াইতে শিক্ষা কর। জগন্মাতা তোমাদের ভিতর অসীম শক্তি ও শুভাশিস্ দান করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে চালাইবেন। এ বিষয়ে সমস্ত সন্দেহ দূর করিয়া সাহসের উপর ভর করিয়া ‘মাভৈঃ’ রবে জগৎকে মাতাইয়া তোল। ধর্ম্মই ভারতের মেরুদণ্ড। ধর্ম্মই

আমাদের রাজনীতি। ধর্ম্মপথে চলিয়া তোমরা নিজ নিজ চরিত্র গঠন কর এবং জগতের মঙ্গল সাধনে প্রবৃত্ত হও। গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে গমন করিয়া জরা ব্যাধি এবং অন্নকষ্ট দূর করিয়া জাতির জীবনে নব শক্তি সঞ্চার কর।

"ব্রহ্মচর্য্য চাই। ব্রহ্মচর্য্য চাই-ই-চাই। ব্রহ্মচর্য্যে মহা-শক্তির বিকাশ হয়। উপনিষদের ঋষিদিগের মত আমাদিগকেও ঈশ্বরের নিকট সর্ব্বদা প্রার্থনা করিতে হইবে,—ওজো দেহি মে, বীর্য্যং দেহি মে, তেজো দেহি মে। যে নির্ব্বীর্য্য, সে পৃথিবীর ভার স্বরূপ—তাহার দ্বারা জগতের কোন কল্যাণ সাধনই হইবে না।

"হাজার হাজার বৎসর পূর্ব্বে ঋগ্বেদ প্রচার করিয়াছিল —'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি।' তাহার পর গীতায় পার্থসারথি তারস্বরে ঘোষণা করিলেন—'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।' পুনরায় পাঁচ হাজার বৎসর পরে এই সত্যকে শ্রীশ্রীঠাকুর নিজের জীবনে বিভিন্ন দিক দিয়া উপলব্ধি করিয়া সরল ভাষায় শিক্ষা দিলেন, 'যত মত তত পথ।' এই মহাদর্শ নিয়ে এগিয়ে যাও —জাতি আবার উঠিবে, আবার আমরা জগতে শ্রেষ্ঠ হইব। স্বাধীনতার অধিকারী হইব। হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টান সকলের মধ্যে ভ্রাতৃভাব ও ভালবাসা আসিবে, একতা হইবে।

"আমার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই—আমি শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত—এইটুকু ভাবো দেখি, তাহা হইলে ঈশ্বর লাভ হইবে। আগে জ্ঞান লাভ কর। তাহার পর সংসার কর। শ্রীশ্রীঠাকুর বলিয়াছেন—'অদ্বৈত জ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা' ইচ্ছা তা-ই কর।' যে প্রাণ হইতে বলিতে পারে—'আমি পরমাত্মার অংশ'—সে তৎক্ষণাৎ মুক্ত হইয়া যায়।

মনুষ্যরূপেতে হরি করেন বিহার।
জানি এই সত্য, সবে কর সেবা তাঁর॥"

বাঙ্গালার মুক্তিমন্ত্র প্রচারক এই একাদশটি আত্মভোলা বিশ্বসেবক সন্ন্যাসী-সন্তানের প্রাণে ঠাকুর যে সুতীব্র অনল প্রজ্জ্বলিত করিয়া দিয়াছিলেন, মহারাজের উদ্ধৃত বাণী সেই অনলের সামান্য একটি শিখা মাত্র। ঠাকুরের ব্যবস্থাই ছিল এইরূপ যে, বাঙ্গালার এই কয়েকটি সন্ন্যাসী যখন আপন আপন জীবন সম্যক্‌রূপে গঠন করিয়া তুলিলেন তখন প্রত্যেককেই আপন আপন কর্ম্মক্ষেত্রে স্বতন্ত্র হইতে হইয়াছিল, স্বাধীন হইতে হইয়াছিল, স্বমতাবলম্বী হইতে হইয়াছিল—আপন আপন কর্ম্ম ও চিন্তার বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া জগতের বুকে দাগ কাটিয়া অগ্রসর হইতে হইয়াছিল। ঠাকুর কাহারও 'এক ঘেয়ে' হওয়া ভালবাসিতেন না। এই স্বাতন্ত্র্য, এই স্বাধীনতা, এই স্বমতাবলম্বন, সর্ব্ব বিষয়ে এই অননুকরণীয় বৈশিষ্ট্য, কাহারও নকল বা ছায়া না হইয়া প্রত্যেকেরই

আসল হওয়া ও মৌলিক হওয়া—এ সকলেরই মূল আদর্শ ছিল একটি—তাহা ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ—দেহেও যেমন দেহান্তেও তেমনি। এই তত্ত্বটি ঠিক ঠিক বুঝিতে না পারিয়া কেহ কেহ এক সময়ে মহারাজের বিরুদ্ধবাদী হইয়া বলিয়াছিলেন যে, মহারাজ মার্কিনে "নিজের মত চালাইয়া" নূতন কিছু একটা করিতেছেন! (৬) কি দুর্জ্জয়ই ছিল ঠাকুরের শক্তি যাহা—

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্॥

সেই লীলাময় মাধব কৃপা করিয়াছিলেন বলিয়াই শ্রীরামকৃষ্ণের সন্তান কয়েকটি চিরদিন ভারত-গৌরব রূপেই লোকের হৃদয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিবেন।

অনন্ত শক্তির আধার না হইলে কেহ কি এমন অঘটন ঘটাইতে পারে? কথায় বলে দুই সিংহ এক বনে থাকে না, কিন্তু তিনি একাদশটি সিংহকে একই বনে রাখিয়া গিয়াছিলেন। মধ্যে মধ্যে মতান্তর যে হইত না তাহা নহে। সে মতান্তর স্বাস্থ্যের লক্ষণ ছিল। তাহা মনান্তর ঘটাইত না। বদ্ধ জলেই পল্বল হয়—তাহাতেই কীট জন্মে, আগাছা জন্মে!

অচিন্তিতপূর্ব্ব ছিল তাঁহার অনন্ত লীলা যাহা এমন করিয়া সমন্বয় সাধন করিয়াছিল—কোথাও ফাঁক বা কাঁটা-

---

(৬) স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ মহারাজের পত্র—বিশ্ববাণী, আষাঢ়—১৩৪৮

খোঁচা ছিল না। ঠাকুর আদেশ করিলেন—নরেন্দ্রনাথ সঙ্ঘ-নেতা হইবেন—তখনকার দিনের ক্ষুদ্রাবয়ব সেই সঙ্ঘ ঠাকুরের দেহান্তের পর অবনতশিরে সেই আদেশ চিরদিনের জন্য মানিয়া লইল, নরেন্দ্রনাথের যোগ্যতার বিচার করিতে বসিল না। সঙ্ঘের কার্য্য ঠাকুরের কার্য্য এবং সঙ্ঘনেতার কার্য্য বলিয়া প্রচার করিতে কাহারও মনে সে সময়ে সংশয় ছিল না, —কাহারও আত্মমর্য্যাদা আহত হয় নাই, এ বিষয়ে কোন দিন কোনরূপ বিতর্ক ঘটে নাই। সঙ্ঘ ঠাকুরের—তাঁহারা ছিলেন ভৃত্য মাত্র। তাঁহারা যাহা কিছু করিতেন, জানিতেন সে সমস্তই ঠাকুরের কাজ, ঠাকুরের সঙ্ঘের কাজ।

জগতের কল্যাণের জন্য এই কয়েকটি প্রাণকে মিলনের ডোরে বাঁধিয়া দিয়া—বিভিন্ন কার্য্যের উপযোগী একাদশখানি বিভিন্ন প্রকারের ও বিভিন্ন তীক্ষ্ণতার অস্ত্র একটিমাত্র কোষে আবদ্ধ করিয়া দয়াল ঠাকুর যেদিন বুঝিলেন যে তাঁহার নর-লীলার কর্ম্ম শেষ হইয়াছে, সেইদিন তিনি অন্তর্ধান করিলেন! তাহা ছিল দেহের অন্তর্ধান মাত্র।

সেদিন ছিল বাঙ্গালা ১২৯৩ সালের ৩১শে শ্রাবণের পূর্ণিমা তিথি। মেঘনির্ম্মুক্ত নীলাকাশে সেদিন কোথাও কালিমা ছিল না, ছিল পূর্ণচন্দ্রের হাসি; সেই হাসির চূর্ণগুলি তখন গগনে পবনে ভাসিয়া ভাসিয়া ধরাতলে ঝরিয়া পড়িতেছিল। বিদেহ ভগবানের শেফালি-শুভ্র হাসিরাশি

সেই চন্দ্রকরচূর্ণের সহিত মিশিয়া এক হইয়া বিশ্বকল্যাণের অমৃতধারারূপে তখন ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। নরেন্দ্রনাথ, কালীমহারাজ, রাখাল প্রভৃতি সন্তানগণ পিতৃহারা, মাতৃহারা, সখাহারা, বন্ধুহারা, বিত্তহারা, বৈভবহারা, শক্তিহারা, সর্ব্বস্ব হারা অভাজনের মত রোদন করিতে লাগিলেন। সেই বৃহৎ কক্ষটির মধ্যে তখন যেন ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফিরিতে লাগিল ঠাকুরের সেই শেষ বাণী—"নরেন, এখনও অবিশ্বাস। যিনি রাম—যিনি কৃষ্ণ—এই দেহে তিনিই রামকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন।"

সেবক ভক্তগণ প্রথমে মনে করিয়াছিলেন ঠাকুর বোধ হয় অত্যন্ত গভীর সমাধিতে মগ্ন হইয়াছেন—আবার এখনই ব্যুত্থিত হইবেন। দণ্ডের পর দণ্ড গেল—প্রহরের পর প্রহর গেল—উষার রক্তরাগে পূর্ব্বাকাশ রঞ্জিত হইয়া উঠিল, কিন্তু সে মহাসমাধি আর ভাঙ্গিল না। ঠাকুরের দৃষ্টি তখন ছিল নাসাগ্রে নিবদ্ধ।

ভক্তদিগের ব্যথিত কণ্ঠে ওঙ্কার নাদ উত্থিত হইয়া দিঙ্মণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

শ্রীশ্রীমা আসিয়াই কাঁদিয়া উঠিলেন—'মা তুই কোথায় গেলি গো!'

তিনি দেখিতে পাইলেন, যে মা-কালী এতদিন ঠাকুরের মূর্ত্তি লইয়া বিরাজিতা ছিলেন, তিনি রত্নবেদী পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিয়াছেন।

যখন শেষ-যাত্রার সময় আসিল, তখন রাশি রাশি পুষ্প আনা হইল, পুষ্পমাল্যে ঠাকুরের ঘর ভরিয়া উঠিল, চন্দনের গন্ধ বাতাসে ভাসিতে লাগিল। খট্টায় পুষ্প বিস্তৃত করিয়া সন্তানগণ ঠাকুরের দেহটি চন্দনে চর্চ্চিত করিলেন; পুষ্পমাল্য এবং কুসুমাঞ্জলীতে তাঁহার রোগক্ষীণ তনু আচ্ছাদিত হইয়া গেল। তখন সকলে ওঙ্কার ধ্বনি করিতে করিতে ধীরে ধীরে বরাহনগরের মহাশ্মশানের দিকে অগ্রসর হইলেন। কাশীপুরে চাঁদের হাট ভাঙ্গিয়া গেল!

মহাশ্মশানে ঠাকুরের পার্থিব চিহ্ন ভস্মীভূত হইলে পর ভস্মরক্ষার অধিকার লইয়া তাঁহার গৃহী ও ত্যাগীভক্তদিগের মধ্যে কাশীপুর উদ্যান-বাটিকায় বিরোধ উপস্থিত হইল। কালীমহারাজ, নিরঞ্জন, তারকাদি কয়েকজন ভক্ত চিতাভস্ম-পূর্ণ কলসটি অধিকার করিয়া লইলেন, কিছুতেই ছাড়িবেন না; এদিকে রামচন্দ্র দত্ত প্রমুখ গৃহীভক্তগণ কাঁকুড়গাছিতে রামচন্দ্রের যোগোদ্যানে উহা লইয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। যাহা হউক, রাত্রিতে ত্যাগীভক্তগণ কলসী হইতে প্রায় সমুদয় ভস্মই বাহির করিয়া একটি কৌটাতে গোপনে রক্ষা করিলেন। কলস মধ্যে রহিল ভস্মের কিঞ্চিৎ অংশ এবং গঙ্গামৃত্তিকা। নরেন্দ্রনাথ বলিলেন—ভস্মরক্ষার জন্য বিরোধে প্রয়োজন নাই, আইস আমরা ঠাকুরের জীবন্ত সমাধি হই। তৎক্ষণাৎ হামান্‌দিস্তায় কিঞ্চিৎ অস্থি চূর্ণ করিয়া তাঁহারা

'জয় গুরু জয় গুরু' বলিতে বলিতে ভক্তিভরে গলাধঃকরণ করিলেন। যে কৌটাটিতে ঠাকুরের চিতাভস্ম রক্ষিত হইয়াছিল তাহা আত্মারামের কৌটা নামে প্রসিদ্ধ। বর্ত্তমানে বেলুড় মঠে উহা স্থাপিত হইয়াছে। কলসে চিতাভস্মের যে অংশ ছিল তাহা উপযুক্ত সময়ে যথারীতি যোগোদ্যানে সমাধিস্থ করা হয়।

ঠাকুর নাই—কাশীপুর উদ্যানবাটিকা শূন্য হইয়া গিয়াছে —পাখী পলাইয়াছে, মধুর স্মৃতিটি লইয়া পিঞ্জরটি শুধু সেখানে পড়িয়া আছে। মহানির্ব্বাণের পরদিন শ্রীমা কাঁদিতে কাঁদিতে সধবার চিহ্ন কপালের সিন্দুরশোভা মুছিয়া ফেলিয়া যখন শ্রীহস্তের স্বর্ণবলয় খুলিতে গেলেন, অমনি বিস্মিত হইয়া দেখিলেন স্বয়ং ঠাকুর তাঁহার সম্মুখে! ঠাকুর কহিলেন— 'ওকি গো! তুমি বালা খুলিতেছ কেন? আমি তো মরি নাই —কেবল এ-ঘর থেকে ও-ঘর!' কয়েকদিন পর শ্রীবৃন্দাবনেও শ্রীমা হাতের বালা খুলিতে চেষ্টা করায় ঠাকুর দেখা দিয়া বারণ করিয়াছিলেন। মা'র আর বালা খোলা হয় নাই। তিনি যতদিন ধরাধামে ছিলেন হাতের বালা হাতেই ছিল।

ঠাকুর নাই—কাশীপুরে উদ্যানবাটিকা শ্মশান হইয়াছে! গৃহীভক্তগণ সে শ্মশান-ভূমি ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন—আছেন কেবল শ্রীমা ও কয়েকজন ত্যাগীভক্ত। যাঁহাকে ঘিরিয়া এতদিন কাশীপুরে সকল উৎসব নিত্য মুখরিত হইয়া উঠিত

তাঁহাকে ছাড়িয়া কে আর সেই শ্মশানপুরীতে থাকিতে চাহে। তখন সুখ নাই—সুখের স্মৃতিমাত্র সার হইয়াছে, কানু নাই—তাঁহার বাঁশরীর সুরটুকু মাত্র আছে। সে স্মৃতি আবার দহন করে—সে সুর মর্ম্মস্থল পর্য্যন্ত খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটে। বৈরাগ্য-পীড়িত তারকনাথ তাই কাশীপুর ত্যাগ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে প্রস্থান করিলেন। কয়েক দিন পর (১৫ই ভাদ্র, ১২৯৩) কালী মহারাজ, যোগেন মহারাজ এবং লাটু মহারাজ—শ্রীমা, গোলাপ-মা ও লক্ষ্মী দিদি এবং মাষ্টার মহাশয়ের (শ্রীম-র) পত্নী নিকুঞ্জ দেবীকে লইয়া শ্রীবৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং পথে বৈদ্যনাথ, অযোধ্যা, কাশীধাম দর্শন করিয়া তাঁহারা বৃন্দাবনে আসিলেন। কাশীধামে শ্রীমা একদিন বলিয়াছিলেন যে, ঠাকুর তাঁহাকে হাত ধরিয়া বিশ্বনাথের মন্দির হইতে আনিয়াছিলেন; তখন তাঁহার ভাবাবস্থা হইয়াছিল।

রামচন্দ্র, সুরেশ মিত্র ও গিরিশচন্দ্র ছিলেন তখন প্রবীণ গৃহীভক্ত এবং কাশীপুরের ব্যয়ভার প্রধানতঃ তাঁহারাই বহন করিতেন। ঠাকুরের অন্তর্ধানের পর তাঁহারা আর সে ভার বহন করিতে প্রস্তুত হইলেন না। যে নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য উদ্যানবাটিকা ভাড়া লওয়া হইয়াছিল তাহাও শেষ হইবার দিন আসন্ন হইয়া উঠিল। নরেন্দ্রনাথ, শশী, শরৎ, খোকা, রাখাল প্রভৃতি ত্যাগী-ভক্তগণ তখন প্রবীণদিগের কথামত আপন

আপন গৃহে প্রস্থান করিয়া পূর্ব্ববৎ স্ব স্ব কার্য্যে মন দিলেন। ভাড়ার মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত বুড়ো গোপাল ও ছোট-গোপাল কাশীপুরের শূন্য পুরীতে ঠাকুরের পুণ্যস্মৃতি সম্বল করিয়া রহিয়া গেলেন।

কয়েকদিন পর সুরেশ মিত্র কহিলেন যে বুড়ো গোপাল, তারক ও লাটু—এই তিন জনের যাইবার স্থান নাই,—উঁহাদের জন্য একটা স্থান করা প্রয়োজন। তিনি তাহার ভার লইলেন এবং বরাহনগরে মুন্সীদের একটি পোড়ো বাড়ী ভাড়া করিলেন। ঠাকুরের ব্যবহৃত শয্যা, পাদুকা ও অন্যান্য দ্রব্যাদি সেই বাড়ীতে লইয়া গিয়া ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের আশ্বিন মাসে—শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্তর্ধানের প্রায় এক মাসের মধ্যেই বরাহনগর মঠ স্থাপিত হইল। ১৮৮৬ হইতে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মঠ সেখানেই ছিল।

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী, লক্ষ্মী-দিদি, গোলাপ-মা ও মাষ্টার মহাশয়ের পত্নীকে লইয়া বৃন্দাবনে পৌঁছিয়া কালী মহারাজ তাঁহাদিগকে এবং যোগেন মহারাজ ও লাটু মহারাজকে বংশীবটে কালা বাবুর কুঞ্জে রাখিয়া শ্রীশ্রীমার পদধূলি গ্রহণ পূর্ব্বক একদিন চৌরাশী-ক্রোশ বন-পরিক্রমায় বাহির হইলেন। পরিধানে গেরুয়া কৌপীন ও বহির্ব্বাস এবং হস্তে একটি কমণ্ডলু মাত্র লইয়া বিংশতি বর্ষ মাত্র বয়স্ক বাঙ্গালী-সন্ন্যাসী নিঃসম্বলে নগ্নপদে পরিক্রমা আরম্ভ করিলেন। পথে কয়েক বাড়ীতে

মাধুকরী করিয়া তিনি যে সামান্য কয়েকখানি রুটি এবং একটু ডাল পাইতেন, দিনান্তে তাহাই আহার করিয়া ঠাকুরের নাম করিতে করিতে তিনি বন-পরিক্রমা করিতে লাগিলেন।

শুধু বৃন্দাবন-পরিক্রমার কালে নহে, তাহার পূর্ব্ব হইতেই মহারাজ নিরামিষাশী ছিলেন এবং পরেও বহু দিন পর্য্যন্ত—এমন কি মার্কিণ-দেশেও তিনি নিরামিষ আহার করিতেন। সে দেশে অনেক সময়ে নিরামিষ আহারের সুবিধা হইত না বলিয়া তাঁহাকে শুধু দুগ্ধ পান করিয়াই দিন যাপন করিতে হইত। ইহাতে তিনি পীড়িত হইয়া পড়েন। সে সময় চিকিৎসক উপদেশ দিলেন যে আমিষ গ্রহণ করিতে হইবে। মহারাজ তখন শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর আদেশ প্রার্থনা করিয়া তাঁহার নিকট পত্র লিখিলেন। পত্রোত্তরে আশীর্ব্বাদ জানাইয়া মাতাঠাকুরাণী লিখিলেন—ঠাকুর 'তোমার······মহৎকার্য্যে সহায় হইবেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আহারাদি সম্বন্ধে তাদৃশ কঠোরতা করিবে না। তুমি সেখানে একদম নিরামিষ-ভোজন না করিয়া উত্তম মৎস্যাদি আহার করিবে। তাহাতে তোমার কোন দোষ হইবে না। আমি তোমাকে অনুমতি দিতেছি, তুমি স্বচ্ছন্দে উহা খাইবে। সর্ব্বদা শরীরের দিকে নজর রাখিবে।" তদবধি মহারাজ প্রয়োজন মত আমিষগ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, নিউইয়র্কে থাকা

কালে 'Vegetarian Society' নামক একটি প্রতিষ্ঠানে নিরামিষ আহার সম্বন্ধে বক্তৃতা দান কালে তিনি বলিয়াছিলেন —হিন্দুরা ইহাই বিশ্বাস করে যে, সেই একই পরমাত্মা যেমন মানুষে বিরাজ করিতেছেন, তেমনি ইতর প্রাণীতেও করিতেছেন। একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কীট পর্য্যন্ত ক্রমবিবর্ত্তনের ফলে একদিন-না-একদিন নরজন্ম লাভ করিবে। মানুষের যেমন আত্মা আছে, সুখ-দুঃখ ইত্যাদির বোধ আছে—ইতর-জীবেরও ঠিক তদ্রূপই আছে। যাহারা আমিষ আহারের পক্ষপাতী তাহারা বড়ই নিষ্ঠুর। সেই নিষ্ঠুরতাই তাহাদিগের ধর্ম্মপথের বিঘ্ন স্বরূপ। যে ব্যক্তি মনে, প্রাণে, কর্ম্মে ও চিন্তায় অহিংস—কোন হিংস্র জীবও তাহাকে হিংসা করে না। আমিষ আহার ভিন্ন যে দেহের পুষ্টি হয় না এ-কথা ভুল। দেখা যায় যে, নিরামিষাশীরাই অধিক বলশালী এবং কষ্টসহিষ্ণু। উদাহরণ স্বরূপ হস্তীর কথা বলা যাইতে পারে। সিংহ বা ব্যাঘ্র খুবই হিংস্র বটে, কিন্তু হস্তীর তুল্য বলবান নহে। রক্তে ও মাংসে শক্তি নাই—শক্তির আধার আছে উদ্ভিজ্জ রাজ্যে।

এইভাবে নানা কথা বলিয়া মহারাজ সেদিন শরীরপালন-বিধি, দেহবিজ্ঞান প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া দেখাইয়াছিলেন যে সৎ চিন্তা, কর্ম্মপ্রবণতা, স্বাস্থ্য প্রভৃতির দিক দিয়া বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে, নিরামিষ আহারের নৈতিক মূল্যও

যেমন খুব বেশী, তেমনি দেহে বল বিধান করিয়া দেহকে নীরোগ করিবার পক্ষেও উহার প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট।

মহারাজের সেই সুদীর্ঘ বক্তৃতাটি পাঠ করিলে শ্রুতির মহাবাক্য মনে পড়ে—"আহার শুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ, সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ।" এখানে স্মৃতি শব্দের অর্থ Memory নহে—উহার অর্থ সর্ব্বদা ভগবানের স্মরণ-মনন।

মহারাজ বলিতেন, যাহা আহার করিলে শরীর এবং মন দুই-ই সুস্থ থাকে, তাহাই শুদ্ধ আহার। তবে আহারে সংযম চাই। বাঁচিবার জন্যই আহার—আহারের জন্য বাঁচা নহে।

যাহা হউক, মহারাজ বহুদিন পর্য্যন্ত নিরামিষভোজী এবং একাহারী ছিলেন। পরিব্রাজক জীবনে তো উহা অপরিহার্য্যই ছিল। তিনি আমরণ ইহাই বিশ্বাস করিতেন যে, ভগবানে নির্ভরশীল হইলে তিনিই নিজে খাদ্যবস্তু বহন করিয়া আনিয়া দেন—কাল কি খাইব, আজ তাহার জন্য চিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই। আজ কি খাইব তাহাও ভাবা নিষ্প্রয়োজন, কারণ ভগবান না দিলে কেহ কিছুই পাইতে পারে না। শ্রীগীতায় ভগবান বলিয়াছেন, তাঁহার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিলে তিনিই যোগ এবং ক্ষেম বহন করেন; ঠাকুর বলিয়াছেন যদি ভার দিতে পারো তবে 'নাবালকের ভার অছিই গ্রহণ করেন', নাবালককে ভাবিতে হয় না। যীশুখৃষ্টও

তাঁহার শিষ্যদিগকে বলিতেন—Seek Ye first the Kingdom of God, and His Righteousness তাহা হইলেই আর সব আপনা-আপনিই আসিবে—"And all these things shall be added unto you"। আমরা কথাপ্রসঙ্গে মুখেই শুধু বলি, 'ভগবান যা' করবেন, তা-ই হবে।' বলি, কিন্তু বিশ্বাস করি না। সেই জন্যই বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যতের চিন্তায় সর্ব্বদা ব্যাকুল থাকি। ঈশ্বরচিন্তা করিবার সময় পাই না।

মহারাজের মন আমাদিগের মন ছিল না। সে মন ছিল সম্পূর্ণরূপে ভগবন্নির্ভরশীল। তাই মাত্র কৌপীন-কমণ্ডলু লইয়া তিনি অকুতোভয়ে বৃন্দাবন-পরিক্রমার জন্য সেই সুদীর্ঘ এবং সুদুর্গম পথে বাহির হইয়াছিলেন। মাধুকরী করিয়া যেদিন যাহা মিলিত সেদিন তাহাই আহার, বৃক্ষতলে শয়ন এবং দিবারাত্রি শ্রীকৃষ্ণের নাম-কীর্ত্তন ও স্মরণ-মনন—ইহাই ছিল সে সময়ের একমাত্র কার্য্য। বন-পরিক্রমণকালে কোন কোন দিন পথিমধ্যে বৈষ্ণব-বাবাজীদিগের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইত বটে, কিন্তু তাঁহারা গৈরিকধারী সন্ন্যাসীকে আদৌ সহ্য করিতে পারিতেন না বলিয়া তাঁহার সহিত মিশিতেন না। মনে করিতেন, গৈরিকধারী সন্ন্যাসী মাত্রই সোঽহংবাদীর দল—সুতরাং নাস্তিক!

কেহ মিশুক বা না মিশুক মহারাজের তখন তাহাতে কিছু

আসিয়া যাইত না। তীব্র বৈরাগ্যের অনলে তখন হৃদয় পুড়িতেছিল—ঠাকুরই যখন নাই, তখন দেহধারণের আর প্রয়োজন কি, ইহাই ছিল তাঁহার মনের ভাব! সুতরাং লোকসঙ্গ অপেক্ষা সঙ্গীহীন অবস্থাই ছিল তাঁহার পক্ষে শান্তিপ্রদ।

একদিন মহারাজ নির্জ্জনে বসিয়া সুমধুর কণ্ঠে আবৃত্তি করিতেছিলেন—

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং
কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং
ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ॥

অদূরবর্ত্তী কয়েকজন বৈষ্ণববাবাজীর কর্ণে এই মধুর আবৃত্তি প্রবেশ করিল। তাঁহারা উৎকর্ণ হইয়া সুকণ্ঠ-নিঃসৃত গোপীগীতার প্রাণদ সেই মন্ত্রগুলি শুনিতে লাগিলেন। মন বলিতে লাগিল—কি সুন্দর! কি সুন্দর! গৈরিকধারী সোঽহংবাদী নাস্তিক সন্ন্যাসীর কণ্ঠে এ কি মধুর শ্রীকৃষ্ণগুণানুকীর্ত্তন! তাঁহারা মুগ্ধ হইলেন—সন্ন্যাসীর হৃদয়নিহিত অসীম ভক্তির পারিজাত-সৌরভ অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁহাদিগকেও সুরভিত করিয়া তুলিল। তাঁহারা মহারাজের নিকটে আসিয়া সবিনয়ে কহিলেন—'আজ হইতে আমরা আপনার সঙ্গী হইলাম। দয়া রাখিবেন। আর আপনাকে মাধুকরী

করিবার জন্য যাইতে দিব না—আমরাই মাধুকরী করিয়া আনিব !'

মহারাজের কণ্ঠ ছিল সুমধুর। সেই মধুর কণ্ঠে তিনি এমন ভাবেই স্তোত্রাদি পাঠ করিতেন এবং কখনও বা আবৃত্তি করিতেন যে, তাহা শুনিলে দেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিত। স্বামীজি একদিন ধ্যানে দেখিয়াছিলেন যে একজন ঋষি অস্তায়মান তপনকিরণে প্রদীপ্ত হইয়া যেন কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক উদাত্তকণ্ঠে সায়ং সরস্বতী দেবীর আবাহন করিয়া কহিতেছেন—

"ওঁ আয়াহি বরদে দেবি ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনি।
গায়ত্রি চ্ছন্দসাং মাতর্ব্রহ্মযোনি নমোঽস্তুতে॥"

স্বামীজিও সেই ধ্যানদৃষ্ট ঋষির মতই উদাত্তকণ্ঠে ঐ মন্ত্রের আবৃত্তি করিলেন। কালী মহারাজ, শরৎ মহারাজ প্রভৃতি তাঁহার সুধাকণ্ঠের সেই আবাহনগীতি শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন। মহারাজ স্বামীজির সেই মন্ত্রগীতি এরূপভাবে আয়ত্ত করিয়াছিলেন যে দূর হইতে শুনিলে মনে হইত যেন স্বামীজিই আবৃত্তি করিতেছেন। (৭)

যাহা হউক, শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে ও গুণানুকীর্ত্তনে বনপরিক্রমার কালটি আনন্দে কাটিতে লাগিল। ঠাকুর বলিতেন—'তোর ভিতরে শ্রীকৃষ্ণের অংশ আছে।' শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে সর্ব্বক্ষণ

---

(৭) The Master as I saw him—by Sister Nivedita (Fifth edition.) Page 270 (foot-note).

তন্ময় হইয়া থাকিতে থাকিতে মহারাজ শ্রীকৃষ্ণের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহাকেই নিজের ভিতরে উপলব্ধি করিতে লাগিলেন এবং সেইভাবে তিন সপ্তাহে চৌরাশী ক্রোশ বন পরিক্রমণপূর্ব্বক কালা বাবুর কুঞ্জে আসিয়া মাতাঠাকুরাণীর চরণ বন্দনা করিলেন।

শ্রীবৃন্দাবনে তারকনাথের সন্ধান করিবার কালে মহারাজ একদিন জানিতে পারিলেন যে, বরাহনগরে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রথম মঠ স্থাপিত হইয়াছে। তারকনাথ সেই মঠে গিয়াছেন। মহারাজের মন অমনি আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল। ঠাকুর—ঠাকুর! মহারাজের সর্ব্বস্ব ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁহারই নামে প্রথম মঠ বরাহনগরে! সে যে তাঁহার গোলকধাম! মহারাজ কালবিলম্ব না করিয়া কলিকাতা যাত্রা করিলেন।

বরাহনগর মঠ ছিল না সাধকসম্প্রদায়ের সাধারণ বাসকেন্দ্র মাত্র—উহা ছিল নিত্য নিত্য প্রাণের অর্ঘ্যে গুরুপূজার শ্রীমন্দির—উহা ছিল কৃতসঙ্কল্প স্বাবলম্বী নবীন সাধুদিগের ধর্ম্ম ও কর্ম্ম জীবন গঠনেরও লীলাক্ষেত্র। শ্রীগুরু এতদিন যে মন্ত্র শুধু মুখে মুখে দিয়াছিলেন, বরাহনগর মঠে তাহা কিরূপে প্রাণবন্ত হইয়া শিষ্যমণ্ডলীকে মানব সমাজের শীর্ষদেশে স্থাপন করিয়াছিল এবং কিরূপে তাহাদিগকে লোকচিকীর্ষায়সমর্পিত জীবন করিয়াছিল, সে কাহিনী এই পুস্তকের "দ্বিতীয় খণ্ডে" সবিস্তরে বলিবার ইচ্ছা রহিল।

জীবনী প্রণয়নে বিশেষভাবে পরিদৃষ্ট প্রধান প্রধান পুস্তকাদির পরিচয়।

—):(—

শ্রীরামকৃষ্ণ সাহিত্য

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ—স্বামী সারদানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত—শ্রীম

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথাসার—কুমারকৃষ্ণ নন্দী

বাণী— ঐ

Life of Swami Vivekananda—His Eastern and Western Disciples (Mayabati Ed.—1912, 1913, 1915)

The Disciples of Ramakrishna—Advait Asram (1943)

Lectures and Addresses in India—Swami Abhedananda

স্বামী অভেদানন্দজীর লিখিত প্রবন্ধাবলী এবং প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে প্রদত্ত বক্তৃতাসম্বলিত পুস্তক ও পুস্তিকা

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি—অক্ষয়কুমার সেন

শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতিকথা—চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়

মহাপুরুষ শ্রীমৎ শিবানন্দ মহারাজের অনুধ্যান—মহেন্দ্রনাথ দত্ত

কালী তপস্বী—রামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতি

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ চন্দ্রিকা—ব্রহ্মচারী প্রজ্ঞাচৈতন্য

মহারাজের কথা—স্বামী চিৎস্বরূপানন্দ

যেমন শুনিয়াছি—ব্রহ্মচারী সম্বুদ্ধচৈতন্য

With the Swamis in America—Western Disciple

নবযুগের মানুষ—হরিদাস মুখোপাধ্যায়

বিশ্ববাণী (নবপর্য্যায় মাসিক পত্রিকা)—স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের ইংরাজী ও বাংলা রচনা, অন্যান্য লেখকদিগের শ্রীরামকৃষ্ণের বা তৎসন্তানদিগের ভাবসমন্বিত প্রবন্ধাবলী ও স্বামী শঙ্করানন্দ সঙ্কলিত "জীবন কথা"

সমসাময়িক ভারতের চোখে অভেদানন্দ—শিক্ষাতীর্থ কার্য্যালয়, কলিকাতা

অন্যান্য পুস্তক

শ্রীশ্রীগীতা, শ্রীশ্রীচণ্ডী, শ্রীমদ্ভাগবত।

Contemporary Indian Philosophy—
Sir S. Radhakrishnan

Bengal under the Lt. Governors—Buckland

রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ—শিবনাথ শাস্ত্রী

বঙ্গদেশে বর্ত্তমান শিক্ষাবিস্তার—গোপাল চন্দ্র সরকার

সংবাদপত্রে সেকালের কথা—ব্রজেন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

যোগসাধনের ভিত্তি—শ্রীঅরবিন্দ

উপনিষদের উপদেশ—মহামহোপাধ্যায় কোকিলেশ্বর শাস্ত্রী

হেমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী

পত্র-পত্রিকা

বঙ্গশ্রী, প্রবর্ত্তক, বসুমতী, Amrita Bazar Patrika, Hindusthan Standard, আনন্দবাজার পত্রিকা।

পরিশিষ্ট

প্রথম পরিচ্ছেদ—৫ম ও ১৮শ পৃষ্ঠা

মহারাজের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা সম্বন্ধে কয়েকজন মনীষীর অভিমত :—

আচার্য্য স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ

......It is our earnest desire to keep you in our midst and to listen to your interpretation of the sublime truths of Vedanta as you have been explaining to us with your inspiring words since you came to this great metropolis. Although there are many teachers amongst us still we have not found another like you who has such a vast treasure of wisdom and such a deep spiritual realization and who has the power to awaken the Divine consciousness in the earnest souls of seekers after truth......—Farewell Address: Vedanta Ashram, Sanfrancisco, California. June, 1921.

......You have been to us an ever wise and ever loving Master and Teacher. Many of us who came to you ill in body and mind are today strong in limb and full of new life. Others who crept into your presence bowed down with grief and despair, now walk with raised heads and joyful eyes. Not one has come to you in vain. Everywhere you have brought hope gladness, strength and spiritual light................—The Vedanta Society, New York: May 14, 1906.

of Carnegie Library (America) and hundreds were turned away.—Mrs. Rose M. Ashby, President of Atlanta Psychological Society.

—His final lecture in Atlanta was on the very interesting subject, "Reincarnation" and the overflow audience that greeted him at Cable Hall, Sunday afternoon, March 9th (1913) showed the interest in his subject,—Ibid.

দার্শনিক স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ

—A noted professor of Columbia University has said that he considers Abhedananda to have the most brilliant philosophical mind to be found anywhere in the world today.—Toronto Saturday Night (America).

মানবিকতায় স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ

He was so gentle so kind, so charming and so noble.—Tan Yan-Shun : Director, China Bhawan, Santiniketan : 22 Sept. 1941.

সংগঠন-কৌশলী স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ

For nine years you have laboured tirelessly among us (at New York), enduring hardship, opposition, even enmity, yet pushing on your course undaunted and unchecked. When you came to New York, out of all those who had gathered so eagerly around Swami Vivekananda, you found scarcely a handful of earnest students. With these you began your labour......asking aid of none, and with the infinite wisdom, patience, courage and tenacity which have characterized your efforts at every step, you began to build, stone by stone, the solid structure of the Vedanta Society as it stands today.........(in New York).

—Farewell Address to Swami Abhedananda : New York, May 14, 1906.

বেশবৈশিষ্ট্যে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ

Swami Abhedananda was clothed in oriental fashion, in the dark red gown, with a yellow turban wound around his head. After his lecture (Religion and Philosophy of the Hindus) many of the Club members (The outlook Club) went forward to express their appreciation for his earnest and instructive talk—Daily Evening Item—Lynn Mass (Tuesday, April 19, 1900)—বিশ্ববাণী, ১৩৪৬-৪৭। আশ্বিন—৬১৯ পৃষ্ঠা।

—His (Swami Abhedananda) dark hued face is finely chiselled, and with unusual intellectual strength shows the singular dignity, gentleness and repose of his people. His hands are no less individual and expressive of high character. He wears a turban of light orange colour and a simple robe of deep terra-cotta colour, the gown of the sanyasins, the ancient order of religious teachers, which has existed in India since pre-historic times—New York Tribune, March 6th, 1898—বিশ্ববাণী, ১৩৪৭। আষাঢ়। ২০৬ পৃষ্ঠা।

—The madder red and the clear golden tints of gown and turban are the colours of the order to which Swami (Abhedananda) belongs, signify Wisdom. Thus enveloped in Wisdom, he stands before his hearers, *modest, perfectly courteous, sweet-tempered under irritating carpers and questioners*, a being who has every faculty and every nerve, every impulse under complete control, a patriot and a saint in one.—Lady Gay. Toronto Saturday Night, 9th Feb, 1905.

ভারত-গৌরব-প্রতিষ্ঠাতা স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ

—And his presentation of our cultural aspirations and religious truth to western audiences elicited great praise from his varried audiences.—Sir S. Radhakrishnan : Madras : The 20th June, 1941.

—His services to India in popularising her culture and religion abroad were undoubtedly of a memorable character.—Sir C. V. Raman : Bangalore, 5th. Aug., 1941.

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম প্রধান শিষ্য পূজ্যপাদ শ্রীমৎ অভেদানন্দ স্বামী তাঁহার স্বরচিত বহু গ্রন্থে এবং বহু অভিভাষণে এই সংস্কৃতির (ভারতের) বিশালতা, গভীরতা এবং অমর বার্তা আমেরিকা, ইউরোপ ও ভারতের নানা স্থানে প্রচার করিয়াছিলেন।—অধ্যাপক শ্রীবেণীমাধব বড়ুয়া এম্,-এ, ডি-লিট্ (লণ্ডন) ; কলিকাতা—৩০শে জুলাই, ১৯৪১।

—He was indeed one of the best representatives of the Hindu Religion and Culture in modern times, of which *every son and daughter of India should be proud and should never forget.*—Prof : Tan Yun-Shun : Director, China Bhawan, Santiniketan : 22nd. Sept., 1941.

ত্যাগসমুজ্জ্বল স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ

—The many branches of the Ramkrishna Mission which have since sprung to life in America are the outer embodiment of that spirit of self-consecration which lay behind Abhedananda's long and arduous work in that country.—B. C. Chatterjee, Bat-at-Law. Calcutta. 25th. January, 1941.

———

মূল্য তিন টাকা

বর্দ্ধিত মূল্য ৩৸৹ টাকা